মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

# ইসলামের অর্থনীতি

# ইসলামী অর্থনীতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)



খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০, দোকান নং – ২০৯
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২,

ইসলামের অর্থনীতি
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৬ ইংরেজি
১০ম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ঃ ২০১২ ইংরেজি
শাওয়াল ঃ ১৪৩৩ হিজরী
ভাদ্র ঃ ১৪১৯ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা রশিদুল হাসান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
মোস্তফা বশীরুল হক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০-ই/এ-১, মধুবাগ
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২/২, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১১৪৫৭৯

**মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা**

**ISLAMER AURTHANITI :** (A complete book of Research in detail Economic Systems of Islam) Written by Maulana Muhammad Abdur Rahim and Published by Mustafa Rashidul Hassan of Khairun Prokashani.

January : 2007

**Price :** TK. 200.00
US. Dollar : 4.00

**ISBN : 984-8455-31-6**

# 'ইসলামের অর্থনীতি' সম্পর্কে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ

**ডক্টর এম. এন. হুদার অভিমত**

---- ইসলাম সম্বন্ধে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবি এই যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মার কল্যাণকামী ধর্মই নয়—ইসলাম গোটা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সুস্পষ্ট ও সর্বাত্মক ইশারা। ইসলামী মোনাজাতের প্রথম কথা দুনিয়ার মঙ্গল, আখিরাতের মঙ্গলের কথা পরে।

মানুষের পার্থিব কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। আজকের জিজ্ঞাসু মানুষ তাই প্রত্যেক সামাজিক বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বিচার করতে চায় এই মাপকাঠি দিয়ে যে, সে ব্যবস্থা কতখানি পার্থিব কল্যাণ আনবে মানুষের জন্যে, মানুষের পার্থিব উন্নতির পথ কতখানি সুগম হবে তাতে, আর সেই উন্নতির সুফল কতখানি আসবে সবারই ভোগে।

আজ তাই চরম পরীক্ষা এসেছে প্রত্যেক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। যে দুটি প্রধান ব্যবস্থা আজ দুনিয়ায় চালু তার কোনটাতে মানুষ সুখী হতে পারছে না। তার মন চাইছে নূতন পথের সন্ধান—যে পথে থাকবে না বর্তমান ব্যবস্থাদ্বয়ের গলদগুলো। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ইসলামে সে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজ শুধু বিশ্বাসকে সম্বল করলেই আমাদের চলবে না। ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সূত্রগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে মেজে ঘষে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে আর দেখাতে হবে, কেমন করে আজকের শিল্প-বাণিজ্য-যন্ত্র-কেন্দ্রিক সভ্যতাতেও শুধুমাত্র ইসলামই মানুষের কল্যাণকামী পথের সন্ধান দিতে পরে।

এ এক বিরাট দায়িত্ব, এ দায়িত্ব পূরণের পথে জনাব মুহাম্মাদ আবদুর রহীম সাহেবের ' ইসলামের অর্থনীতি' এক বিশিষ্ট পদক্ষেপ। আবদুর রহীম সাহেব বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাকে আমাদের মোবারকবাদ।............

**(স্বাঃ) মীর্জা নূরুল হুদা**

অধ্যক্ষ, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬ সন)

উৎসর্গ

**বিদগ্ধ সমাজের হাতে**

## প্রসঙ্গ-কথা

অর্থনীতি মানব জীবনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে উহার সুষম বন্টন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ অর্থনীতির। কিন্তু মানুষের কাংক্ষিত এই অর্থনীতিটি পাওয়া যাবে কোন্ সূত্র হইতে অথবা কে-ইবা উহা রচনা করিয়া দিবে মানব জাতিকে? যুগ যুগ ধরিয়া এই মূল প্রশ্নে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে মানব সমাজে।

অবশ্য মানুষ শুধু বিতর্কে লিপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বরং প্রয়োজনের তাগিদে সে নিজেই নানারূপ অর্থনীতি রচনা করিয়া লইয়াছে। তন্মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুইটি অর্থনীতিই বর্তমানে দুনিয়ায় বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুইটি অর্থনীতির মধ্যেই মানুষ তাহার সকল চাওয়া ও পাওয়ার সন্ধান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হইলঃ এই দুই অর্থনীতির কোনটিই মানুষের প্রকৃত দাবি পূরণ করিতে পারিতেছে না। একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ নির্মাণে এই দুইটি অর্থনীতিই সমান ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।

ধনতন্ত্র সমাজে ব্যক্তিকে অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সমষ্টির স্বার্থকে সে নির্মমভাবে জলাঞ্জলি দিয়াছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র সমষ্টির স্বার্থকেই সর্বক্ষেত্রে বড় করিয়া দেখিয়াছে। সমষ্টির স্বার্থরক্ষার নামে সে ব্যক্তির স্বার্থকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিয়াছে। এই দুই প্রান্তিকধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কোনটিই মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনে এতটুকু সফলকাম হয় নাই; বরং এই দুই অর্থনীতির অধীনেই মানব জাতি নিগৃহীত হইয়াছে সমানতালে। সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী লোককে লুটপাটের সুবিধা প্রদান ছাড়া এই দুই অর্থনীতি সাধারণ মানুষকে কিছুই দিতে পারে নাই। এ কারণেই দুনিয়ার মানুষ তাহাদের আশা-আকাংক্ষা পূরণের উপযোগী একটি তৃতীয় অর্থনীতির জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুণিতেছে সুদীর্ঘকাল হইতে।

ইসলাম আল্লাহ্ মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। অর্থনীতি স্বভাবতই ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই সোনালী যুগে ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অর্থনীতিও গণ-মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ-নির্দেশ করিয়াছে। রাসূলে করীম (স)ও খুলাফায়ে রাশেদীন মানুষের সামনে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব নমুনা তুলিয়া ধরিয়াছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। কিন্তু সোনালী যুগের পর ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ন্যায় ইহার অর্থনীতিও হারাইয়া গিয়াছে বিস্মৃতির অতল গহবরে। রাজতন্ত্রের সর্বনাশা অভিশাপ মানব জাতিকে বঞ্চিত করিয়াছে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির অপরিমেয় কল্যাণকারিতা হইতে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির আবেদন এতটুকু ফুরাইয়া যায় নাই; বরং মানব রচিত মতবাদগুলি, বিশেষত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অনিবার্য ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রচণ্ডভাবে।

বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইসলামী নব জাগৃতির পরিণতিতে মানুষের কাংক্ষিত তৃতীয় অর্থনীতি হিসাবে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে একটা অদম্য কৌতূহল লক্ষ্য করা গিয়াছে বর্তমান শতকের শুরু হইতেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে কৌতূহল নিবারণের জন্য যথোচিত উদ্যম ও প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নাই মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের মধ্যে; বরং তাদের কেহ কেহ প্রচলিত অর্থনীতির দেহে ইসলামের রং চড়াইয়া উহাকেই ইসলামী অর্থনীতি নামে চালানোর একটা ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন নেহায়েত অনাকাংক্ষিতভাবে।

এই প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য বক্তব্য উপস্থাপনের মানসে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত আগাইয়া আসেন এ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। প্রায় অর্ধ যুগব্যাপী নিরন্তর সাধনা ও গবেষণার ফসল হিসাবে ১৯৫৬ সনে তিনি বাংলাভাষী জনগণের কাছে উপস্থাপন করেন 'ইসলামের অর্থনীতি' নামক এই অতুলনীয় গ্রন্থটি। কোন ভাসাভাসা ও গতানুগতিক আলোচনা কিংবা প্রচলিত অর্থনীতির দেহে ইসলামের রং চড়ানো নয়, বরং আধুনিক অর্থনীতির আলোকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ হইতে ইসলামী অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি তিনি পরম যত্নের সহিত তুলিয়া ধরিয়াছেন এই মূল্যবান গ্রন্থে। বিশেষত, সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতির এই যুগে সুদমুক্ত অর্থনীতির প্রবর্তন এবং জন্মনিরোধের ন্যায় আত্মঘাতি কর্মপন্থা ছাড়াই যে জনসংখ্যা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব, তাহা এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন অকাট্যভাবে। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষায় ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় এই গ্রন্থটিই হইতেছে একমাত্র পথিকৃত এবং সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সমৃদ্ধ দলীল। বিগত চার দশক যাবত এই গ্রন্থটিই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে ইসলামের অর্থনীতি সংক্রান্ত শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে।

বিগত একচল্লিশ বৎসরে এই গ্রন্থটির ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রতিটি সংস্করণই আশাতীত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অজস্র শোকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যকে অধিকতর উন্নত করার জন্যে যথাসাধ্য উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদগ্ধ পাঠক মহলে এ সংস্করণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হইবে এবং বাংলার এই জমীনে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি কায়েমের লক্ষ্যে তাহাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে।

মহান আল্লাহ গ্রন্থকারের এই অসামান্য খেদমত কবুল করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চতম মর্যাদা দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

ঢাকাঃ ৫ এপ্রিল, ১৯৯৭

**মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান**
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

# চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থকারের বক্তব্য

আমার লিখিত ' ইসলামের অর্থনীতি' বইটির চতুর্থ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ সুধী পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমি মহান আল্লাহর অশেষ শোকর আদায় করিতেছি। ইহা যে সম্ভব হইল—সত্য বলিতে কি—তাহা আমার জন্যও একটি বিস্ময়ের বিষয়। কেননা গ্রন্থ প্রণয়ন এক কথা, আর উহা প্রকাশনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিরাট ব্যাপার।

এই বইর প্রথম সংস্করণ যদিও আমি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা আজ হইতে ৩৩ বৎসর আগের কথা। কিন্তু বর্তমানে বই প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা আমার জন্যে অকল্পনীয়। তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা অভাবিত উপায়ে এই সংস্করণটির প্রকাশ সম্ভব করিয়া দিয়াছেন।

আমার বহু কয়টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশক না পাওয়ার কারণে নূতন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, এই বিষয়ে স্নেহাস্পদ মওলানা আবদুল মতীন সোনালী পেপার এ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর জনাব আলহাজ্জ খান মুহাম্মাদ ইকবালকে অবহিত করেন। তিনি বইগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রায় সব কয়টি বই দেখিয়া তাৎক্ষণিকভাবে 'ইসলামের অর্থনীতি' প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ তাহার পরিচালিত কারখানা হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

জনাব ইকবালের সহিত আমার কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই, টেলিফোনে কয়েকবার কথা হইয়াছে মাত্র। তিনি আমার সাক্ষাৎ না পাইয়াও বই প্রকাশের জন্য নিজ হইতেই কাগজ দান দ্বীন—ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রচারে যে সহযোগিতা করিলেন তাহা মহান আল্লাহর নিকট একটি বড় অবদান বলিয়া স্বীকৃত হইবে, আশা করি। আমি তাঁহার প্রতি কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহার এই সহযোগিতাকে খাটো করিতে চাহি না। তবে তাহার সার্বিক কল্যাণের জন্য আমি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেছি। অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, ইহা এক বিরল দৃষ্টান্তের ঘটনা।

বইটির বর্তমান সংস্করণ সংশোধিত ও নূতন বিষয়ে সংযোজিত হওয়ায় পূর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ হইয়া সুধী পাঠকদের নিকট উপস্থিত হইল। ইহাতে তাহারা ইসলামী অর্থনীতির বিস্তারিত রূপের সহিত পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার অন্যান্য অর্থনীতির সহিত তুলনামূলক অধ্যয়নেরও বিরাট সুযোগ পাইবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পূর্ববর্তী তিনটি সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণটি সুধীবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইবে, এই আশা আমি আন্তরিকভাবেই পোষণ করিতেছি।

মোস্তাফা মনযিল
২০৮, নাখাল পাড়া

—মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

# সূচীপত্র

# এক নূতন অর্থনীতির প্রয়োজন

দুনিয়ার অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে একটা নূতন চিৎকার ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। এই চিৎকার যদিও ভাঙ্গা গলার, তেমন বলিষ্ঠও নয়; তবুও উহার প্রতি জনগণের উৎকণ্ঠা না জাগিয়া পারে নাই। সে চিৎকার হইল, একটা নূতন অর্থব্যবস্থা (New Economic order) চাই যাহা বর্তমানের বিরাজমান অর্থ ব্যবস্থার দুর্বহচাপে নির্যাতিত নিষ্পেষিত ও শোষিত- বঞ্চিত জনগণকে নিস্কৃতি ও স্বস্তি দিতে পারিবে। কেননা বর্তমানের যাবতীয় মানব-রচিত অর্থব্যবস্থা মানবজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যে অর্থব্যবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কার্যকর রহিয়াছে, তাহা পুঁজিবাদ হউক, কি সমাজতন্ত্র, মানুষের জীবনে নিত্য নূতন জটিল সমস্যা ও অর্থনৈতিক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সাধারণ মানুষকে ঠেলিয়া দিতেছে নির্মম কষ্টদায়ক দারিদ্র্য ও দুঃসহ অভাব অনটনের গভীরতম পংকে। এই অর্থব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে পেট ভরিয়া খাবার, লজ্জা ঢাকার বস্ত্র ও রৌদ্র-বৃষ্টি, পথিকের শানিত-উষ্ণ দৃষ্টিবান হইতে রক্ষাকারী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে। নানাবিধ রোগ-ব্যাধি, রক্তহীনতা ও অপুষ্টি হইতে মুক্তি দেওয়া উহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অথচ এই মানব-দুশমন অর্থব্যবস্থাই বর্তমান সময়ের বিশ্বমানবতাকে অক্টোপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, বন্দী করিয়াছে দাসত্বের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। উহার দাপট-প্রতাপে প্রত্যেকটি নর-নারী কঠিনভাবে প্রকম্পিত হইতেছে প্রতি মুহূর্তে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বরং দরিদ্ররা ক্রমশ অধিকতর দারিদ্র্যের গভীরে তলাইয়া যাইতেছে। আর ধনীরা শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ হইতেও উচ্চতর পর্যায়ে উঠিয়া সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে সমাজ-সভ্যতার স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির প্লাবন-স্রোতে সাধারণ মানুষ রসাতলে ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষুধা ও রোগ মানব দেহের গোশত ও মগজ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, বিন্দু বিন্দু করিয়া শুষিয়া নিতেছে রক্তের শেষবিন্দুটিও। দরিদ্র জনতা করভারে জর্জরিত। কর প্রথার পর্বত তাহাদের মেরুদণ্ড ভাংগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। সুদী কারবার সুদভিত্তিক অর্থনীতি লুটিয়া নিতেছে মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও রক্ত নিঙড়াইয়া উপার্জন করা শেষ কড়িটিও। বস্তুত এই হইল বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত সর্বপ্রকার অর্থব্যবস্থার তিক্ত বিষাক্ত পরিণতি। অথচ এই সব কয়টি অর্থব্যবস্থা-ই মানুষকে ভূ-স্বর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা–অগ্রগতি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে তাহাই তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে দারিদ্র্যের দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা জাহান্নামের দিকে অতি দ্রুত গতিতে। উহাদের গাল ভরা দাবি ও ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

অবশ্য মজার কথা হইল, বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদ,সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি পরস্পরকে এই অবস্থার জন্য অভিযুক্ত ও দায়ী করিতেছে। কেননা বর্তমান মানবতার মর্মান্তিক অবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কোনটাই প্রস্তুত নয় বরং এই সবের প্রত্যেকটিই অপরটিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চলিয়াছে। অথচ মানবরচিত এই কয়টি অর্থনীতির সারনির্যাস অভিন্ন পরিণতি সর্বতোভাবে এক। একই পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছে সমগ্র মানবকুলকে। এক কথায়, সে পরিণতি হইল Exploitation of masses by a handful coterie মুষ্টিমেয় কতিপয় কর্তৃক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর শোষণ।

বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সমূহের মধ্যে নামের পার্থক্য থাকিলেও এই সব গুলিই একই মৌল হইতে নির্গত, একই উৎস হইতে উৎসারিত। কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র (Communists manifesto) এবং মিলস -এর Political Economy দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থা উপস্থাপিত করিলেও উভয়টিই একই সময়ে—১৮৪৮ সনে প্রকাশিত ও উপস্থাপিত হইয়াছিল। একই স্থান—অর্থাৎ লন্ডন—হইতে দুইটিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আর এই দুইটি অর্থব্যবস্থার পশ্চাতেই প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে বিশ্ব ইহুদীবাদ। এই দুইটি অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে একটি হইল ব্যক্তিতান্ত্রিক পুঁজিবাদ আর অপরটি হইল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ—যদিও উহার নাম দেওয়া হইয়াছে সমাজতন্ত্র (Socialism)। কিন্তু দুইটিই জনমানুষকে শোষণ করার উপর ভিত্তিশীল। এই দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিলে তাহা শুধু মাত্রার পার্থক্য মাত্র। কিন্তু শোষণ এক ব্যক্তি দ্বারা হউক, কি হউক রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক, তাহাতে মূল বা পরিণতির দিক দিয়া কোনই পার্থক্য সূচিত হয় না। তবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের হাতে অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির সম্পূর্ণ একীভূত হওয়ার কারণে উহার শোষণটা সর্বাত্মক যেমন, তেমনি খুবই নির্দয় ও মর্মান্তিক। সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ রূপে নিরুপায় ও চরমভাবে অসহায়। ব্যক্তিতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শোষণে—মানুষ বলিয়া—কিছুটা দয়ার অবকাশ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের শোষণে দয়া-মায়া-ক্ষমার কোন প্রশ্ন-ই উঠিতে পারে না। বরং সেখানে দয়া, সহানভূতি বা মানবিক সহমর্মিতার কথা চিন্তা করাই অবাস্তব। কমিউনিজম সমাজতন্ত্রের চরম ও চূড়ান্ত রূপ। উহারই উপর অর্পিত হইয়াছে পুঁজিবাদকে চিরস্থায়ীকরণের কঠিন দায়িত্ব এবং উহা তাহাই করিতেছে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করিয়া। কেননা সমাজতন্ত্রের নিজস্ব কোন অর্থনীতি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আসলে উহা একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ব্যবস্থা (political system) মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উহার অর্থসংস্থা ও ব্যবস্থাপনা ঠিক তাহাই, যাহা পুঁজিবাদের সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা। কালমার্কস একজন সাংবাদিক পিতার সন্তান ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক বিষয়াদির সমালোচনা করার দক্ষতা ছিল প্রচন্ড। তাঁহার রচনাবলীতে অর্থনৈতিক বিষয়াদি পর্যায়ে যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয় তাহা মূলত পুঁজিবাদ হইতে ভিন্নতর কিছু নয়। এমন কি, কমিউনিস্টদের বাইবেল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'—পুঁজিবাদের সাফল্যের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দলীল ছাড়া আর কিছুই নয়। উহাতে বলা হইয়াছেঃ

The bourgeosie during its rule for nearly 100 years has created more massive and more clossed productive forces than have all preceding generations together.

শ্রম মূল্য মতাদর্শের (Labour theory of value) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়, সমাজতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ বিপুল সংখ্যক সাধারণ অ-নিপুণ— অযোগ্য শ্রমিকদিগকে সকল ধরনের যোগ্য ও সুদক্ষ শ্রমিকদের সমান পর্যায়ে আনিয়া শ্রম মূল্যকে গণিত শাস্ত্রের গণনা পদ্ধতি চালু করিতে এখন পর্যন্তও সক্ষম হয় নাই। শ্রম-মূল্য মতাদর্শের ভিত্তিতে মূল্য (Value) নির্ধারণ করিতেও সফল হইতে পারে নাই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা-বিশারদরা।

বস্তুত সমাজতান্ত্রিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি যে অতিশয় অসন্তোষজনক, তাহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাড়তি মূল্য ব্যাক্তিগত উদ্যোগের তুলনায় অনেক উচ্চ ও বেশী। তাই উহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেই তাহা বেশী প্রযোজ্য। Prof. Kantorovich linear programming-এর উদগাত। তিনি যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মূল্য গণনা পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন পণ্যের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠয়াছে,—যেমন উহার পড়তা খরচ ধরিয়া করা হয়।

বড় বড় ব্যবসায়ের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানার অধীন বহু সংখ্যক ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। ফলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Corporations)-সমূহ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সহকারেই সমধিক প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শক্ত রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। শুরু তে দুইটি পদ্ধতির মধ্যে যে সামান্য পার্থক্যটুকু ছিল, এক্ষণে তাহা আদৌ পরিলক্ষিত হইতেছে না। বরঞ্চ উভয় পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ও সাযুজ্য প্রকট। দুইটিই সুদের ভিত্তিতে চলে। আর তাহাই হইল সাধারণ মানুষকে শোষণ করার বড় হাতিয়ার। এই উভয় ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার মূলে আসল অবদান ইয়াহুদীদের। আর বর্তমান দুনিয়ার অর্থনীতি যে ইয়াহুদীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তাহা কাহারো অজানা থাকার কথা নয়। The jews and Modern Capitalism গ্রন্থ প্রণেতা সম্বার্ট (Somdart) বলিয়াছেনঃ The Jews were responsible for both the outward form, and finward spirit of capitalism,

পঞ্চদশ ও ষষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যে (১৪৯২ খৃস্টাব্দ) ইয়াহুদীরা স্পেন (১৪৯২ খৃঃ) পর্তুগাল (১৪৯৫—১৪৯৭খৃঃ) কলোন (১৪২৪ খৃঃ) অন্যান্য শহর-নগর এবং পরবর্তী সময়ে কতিপয় ইতালীয় শহর হইতে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। দক্ষিণ দিক হইতে তাহাদিগকে উত্তর দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা বিলাস দ্রব্যের যেমন অলংকার, সিল্ক ও মূল্যবান পাথর প্রভৃতির একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক হইয়া বসে। রপ্তানি বাণিজ্যেও তাহাদেরই প্রাধান্য ছিল। তাহারা বহু সংখ্যক উপনিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে। কলম্বাসকেও তাহারা অপরিমেয় অর্থ

দিয়াছিল। এই কলম্বাসও একজন ইয়াহুদী ব্যক্তি ছিল। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রে তাহারাই অর্থের বড় যোগানদার হইয়া দাঁড়ায়। তাহারাই এই সব নূতন গড়িয়া উঠা রাষ্ট্রসমূহের নিকট বিক্রয় করে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র ও খাদ্য। The Jewes and Modern Captalism গ্রন্থে বলা হইয়াছেঃ "Arm in arm, the Jew and the ruler stride through the age" পুঁজিবাদ যত উপায় ও পন্থা-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করিয়া সাধারণ মনুষের রক্ত শোষণ করিয়াছে তাহার সবগুলিরই অস্ত্রাগার নির্মাণ করিয়াছে এই ইয়াহুদীরাই। তন্মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা, ঋণপত্রের (securities) বাজার, modern credit instruments, stock promotion, instalment selling, বিজ্ঞাপন ও আধুনিক পত্র-পত্রিকা পরিচালনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মনে রাখা আবশ্যক, ইয়াহুদীদের একটা বিশেষ বিশেষত্ব হইল, একবার যে ইয়াহুদী, সে সব সময়ই ইয়াহুদী—দ্বিতীয় ও তৃতীয় বংশ শাখায় পৌঁছিয়া গেলেও সে ইয়াহুদীই থাকিবে। এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি ও কতকগুলি অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধা ও ঘটনা দুর্ঘটনা দুনিয়ায় সর্বাধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইয়াহুদীরা দুর্বল ও স্বল্প সংখ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজমান, পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত। তাহাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও কায়-কারবার তাহাদের নিজেদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ও সম্পাদিত।

আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা, বহুজাতিক কর্পোরেশন, বিশ্ব সমিতি, ফ্রীম্যাসন, লায়ন ও রোটারী ক্লাব, বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, বৃত্তি, সভা-সম্মেলন এবং বহুসংখ্যক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য (visible and invisible) কর্মতৎপরতা তাহারা সমানভাবে ও অবলীলাক্রমে চালাইয়া যাইতেছে এবং তাহাতে দুনিয়ার সব ধরনের মানুষকে সচেতন বা অবচেতনভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। আর একটা অজানা পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে এই নাবুঝ মানুষগুলিকে। সারা দুনিয়ার মানুষ ইয়াহুদীদের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহারা এই সব কর্মতৎপরতার দ্বারা তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে মাত্র।

তাই বর্তমানে বিরাজিত এই সব অর্থ ব্যবস্থা যখন অচল হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের আয়োজিত নাটকের নায়কেরা (protogonists) শুরু করিয়াছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নানাভাবে সুদ ও জুয়ার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া উহাকেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিতে। কেননা একমাত্র এই অর্থ ব্যবস্থা-ই তাহাদের সর্বাত্মক শোষণ, স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণ খতম করিয়া দিতে সক্ষম। তাহারা ভালো করিয়াই জানে ও অনুধাবন করিতে পারিয়াছে যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিতে পারে কেবলমাত্র ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যবস্থা—তাহা যে রূপের ও যে আকার-আকৃতিরই হউক-না- কেন। তাহাদের চালু করা বিষাক্ত সুদ প্রথা ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যবস্থাগুলির সমস্ত খারাপ

প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবকে কেবলমাত্র ইসলাম-ই পারে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ সুস্থ ও দোষমুক্ত করিয়া তুলিতে। তাই ইসলাম ও ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তাহারা নূতন বোতলে সেই পুরাতন মদ্যই পরিবেশন করিতে শুরু করিয়াছে সর্বাত্মক শক্তি দিয়া—যদিও তাহা কিছুটা পরিশীলিত করিয়া। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তির উপর তাহারা নূতন প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছে সমাজতন্ত্রের নামে। কিন্তু সমাজতন্ত্র কোন দিক দিয়াই কোন নূতন ব্যবস্থা নয়। এই জন্য শুরুতে তাহারা যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়াছিল, এখনো অব্যাহতভাবে তাহাই চালাইয়া যাইতেছে। মূল অর্থব্যবস্থায় নিহিত আসল ক্ষতি ও দোষ-ত্রুটি তাহারা কিছুমাত্র দূর করে নাই। ফলে সাধারণ মানবতার বিপদকে দীর্ঘায়িতই করা হইয়াছে। এই কারণে আজ একথা বলা ছাড়া কোন উপায়ই নাই যে, বর্তমানে প্রচলিত গোটা অর্থ ব্যবস্থাকেই উহার মূল ভিত্তি, শিকড় ও শাখা-প্রশাখা সহ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে এবং অবিলম্বেই ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করিয়া তুলিতে হইবে।

আধুনিক পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুরাপুরি খাপ খাইয়া যাইতে পারে এবং যে কোন সময়ের যে কোন চ্যালেঞ্জকে সুষ্ঠুরূপে পূর্ণ সার্থকতা সহকারে মুকাবিলা করিতে—যে কোন সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। একমাত্র এই অর্থব্যবস্থাই যথার্থ, স্বাভাবিক এবং সর্বপ্রকারের শোষণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেই সঙ্গে সার্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি প্রগতি ও নিরাপত্তার বিধান করা উহার পক্ষে খুবই সহজ। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধান কেবলমাত্র এই অর্থনীতির পক্ষেই সম্ভব। সমস্ত জুলুম ও বঞ্চনা বন্ধ করিয়া দেয় ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ ধন বন্টন পদ্ধতি। ইহা মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণকে বন্ধ করিয়া মানুষ কতৃর্ক মানুষের নিরন্তর কল্যাণ সাধনের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও জোরদার করিয়া তোলে। ধন-সম্পদের একীভূত পুঞ্জীভূত (concentration of wealth) হওয়া ও পারস্পরিক অসাম্য ও পুঁজিবাদের অন্যান্য অশুভ প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে একমাত্র এই অর্থব্যবস্থা। সেই সঙ্গে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বেশী মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে সুসম, সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থ বন্টনের মাধ্যমে।

ঠিক এই কারণে আধুনিক বিশ্বের বহু সংখ্যক অমুসলিম চিন্তাবিদ অর্থনীতিবিদ প্রকাশ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবি জানাইয়াছেন। কেননা অর্থনৈতিক দিক দিয়া বঞ্চিত নিঃস্ব সর্বস্বান্ত বিশ্ব মানবতাকে কেবল মাত্র এই অর্থব্যবস্থাই রক্ষা করিতে ও বাঁচাইতে পারে, বাঁচার মত বাঁচার সুযোগ করিয়া দিতে পারে। দুইজন অমুসলিম অধ্যাপকের একটা চিঠি দৈনিক Gardian পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে তাঁহারা লিখিয়াছিলেনঃ

The Muslims system seems to us to have great merit. The Western World should study it and perhaps adopt it in whole or in part.

কিন্তু নিজেদের মতের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী, নাস্তিক ও সংশয়বাদী ব্যক্তিরা ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই না জানিয়া না বুঝিয়া উহা অধ্যয়ন না করিয়া উহার প্রতি

তীব্র বিদ্বেষাত্মক ও কপটতাপূর্ণ মনোভাব এখন পর্যন্তও পোষণ করে। এই কারণে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পূতিগন্ধময় ক্ষুদ্রায়তন জলাশয় সেচিয়া ফেলিয়া নির্দোষ-আবিলতাহীন স্বচ্ছ পানির আগমন ও প্রবাহিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে তাহারা প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না। তাহারা উপহাস ও বিদ্রূপচ্ছলে প্রশ্ন করেঃ What is Islamic economic system?......... ইসলামী অর্থব্যবস্থা আবার কি? এই প্রশ্ন অবশ্য বহু সংখ্যক মুসলিম নামধারী চিন্তাবিদ ও নীতি-নির্ধারক ব্যক্তির মনেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়াছে হয় এই কারণে যে, তাহারা ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথবা ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিই তাহারা ঈমান হারাইয়া সম্পূর্ণ ভিন্নতর মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যামূলক (Technological) উন্নতি-অগ্রগতির দৃষ্টিতে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন, চিন্ত-গবেষণা এবং চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া একান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এই কাজে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের—যাহারা আধুনিক অর্থনীতি, উহার তত্ত্ব ও ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী—আগাইয়া আসা ও তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে চেষ্টা করা একান্তই কর্তব্য।

আমার লিখিত 'ইসলামের অর্থনীতি' গ্রন্থখানি লইয়া বর্তমান সময়ের বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের নিকট আমি উপস্থিত। এই গ্রন্থটি ১৯৫৬ সনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় বর্তমানের এই ১৯৮৭ সনেও 'ইসলামের অর্থনীতি' পর্যায়ে অন্ততঃ বাংলা ভাষার ইহাই একমাত্র মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। বিদগ্ধ সমাজের সকল পর্যায়ে ইহার যথার্থ মূল্যায়ন হইবে বলিয়া আমি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আশা করিতে পারি।

—মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

# অর্থনীতির গোড়ার কথা

## অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিচয়

মানুষের জীবন অসংখ্য প্রকার প্রয়োজনের সহিত নিবিড়ভাবে বিজড়িত। প্রয়োজন ও আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবন দিনরাত চক্রাকারে ঘুরিতেছে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু ও অপত্য স্নেহ প্রভৃতি মানুষের জীবনকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষ তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। সেই জন্য একটি স্বভাবজাত আগ্রহ, উৎসাহ এবং অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বোধ ও কর্মানুপ্রেরণা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান । নূতন নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে প্রত্যহ সঞ্চারিত হয়, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে মানুষ প্রবুদ্ধ হয়। তাহা পূরণ ও বাস্তবায়নের জন্য তাহাকে নূতন উদ্যমে সচেষ্ট হইতে হয়। এই চেষ্টা-যত্ন ব্যাপদেশে আবার নূতন প্রয়োজন উদ্ভূত হয়, সেই প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আবার তাহাকে নূতন চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। এইভাবে একদিকে প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অর্থোৎপাদন এবং সেই সঙ্গেই নূতন প্রয়োজন উদ্ভব হওয়ার এক অন্তহীন আবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা মানুষের জীবনকে সক্রিয় ও গতিশীল করিয়া রাখে। মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য এই অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তাহা পূরণ করার উপায় ও প্রনালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় যে সামাজিক বিজ্ঞানে, তাহারই নাম অর্থনীতি।

প্রয়োজন পূরণের জন্য চেষ্টা ও শ্রম, চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ ইহাই অর্থনীতির গোড়ার কথা। মানুষ সমগ্র জীবনই এই চক্রের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে, ইহা হইতে মানুষের নিস্কৃতি নাই। বস্তুত ক্ষুধা যদি পীড়াদায়ক ও প্রাণ সংহারক না হইত, দেহ যদি নিজ হইতেই শীতাতপের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত এবং সেই সঙ্গে লজ্জা-শরমের স্বাভাবিক প্রবণতারও মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুচী-পত্র হইতে অর্থনীতির নাম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

কিন্তু এই প্রয়োজনসমূহ যেহেতু স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও শাশ্বত, তাই অর্থনীতিও চিরন্তন সত্য। এই জন্য অর্থনীতি ঠিক ততখানি প্রাচীন, যতখানি প্রাচীন মানুষের চেষ্টা ও সাধনা। যদিও কালের অগ্রগতির ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিন্তার বিবর্তন ঘটিয়াছে

অনেক। কখনও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রচন্ডরূপ ধারণ করিয়াছে, কখনো বা উহার গুরুত্ব অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু উহার মূল বিষয়ে এবং উহার স্বাভাবিক ও বুনিয়াদী গুরুত্বে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম কখনই পরিলক্ষিত হয় নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বলিয়াছেনঃ

অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র যাহা—এক ব্যক্তি সমাজের একজন হওয়ার দিক দিয়া কিরূপ দূরদৃষ্টি ও মিতব্যয়িতার সহিত নিজ ঘরের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেয়। এই জন্য ব্যক্তিগত অর্থনীতির যে গুরুত্ব রহিয়াছে ঘরের ছোট্ট পরিবেষ্টনীতে, সমগ্র রাষ্ট্রে অনুরূপ গুরুত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির।

অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেনঃ

এই শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে, রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য উপার্জন-উপায়ের সন্ধান করা।

মানুষ এই দুনিয়ায় একাকী জীবন যাপন করিতে পারে না। তাহাকে অসংখ্য মানুষের সহিত পরস্পর সর্ম্পক রাখিয়া এবং একটি সুসংগঠিত সমাজের সদস্য হইয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। একাধিক লোকের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মানুষের কোন একটি সামান্যতম প্রয়োজনও পূর্ণ হইতে পারে না। সমাজের সহিত এক ব্যক্তির সমষ্টিগতভাবে এবং উহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ ও বিশেষ প্রকারের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অপরিহার্য। এই সব সম্পর্কের সামগ্রিক ও ব্যাপক আলোচনাই সমাজ-দর্শনের বিষয়বস্তু। মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ যেহেতু বিভিন্ন প্রকার ও বিবিধ দিক দিয়া হইয়া থাকে, সেই কারণে সমাজ-দর্শনেরও বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে, যাহা নীতিদর্শন, রাষ্ট্রনীতি, আইন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এইজন্য অর্থনীতিও সমাজ-দর্শনেরই একটি অংশ। অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা, সাধনা এবং অর্থনৈতিক সম্পদের উৎপাদন ও উহার বন্টন-ব্যয়ের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করাই হইতেছে অর্থনীতির উপজীব্য। এল. এম. ফ্রলার বলিয়াছেনঃ

'কেবল মূল্য ও সামঞ্জস্যের সমন্বয়েই অর্থনীতি হয় না, উহার পরিধি অতিশয় বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। বস্তুত মানব জীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের নাম অর্থনীতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন ব্যতীত উহার অন্য কোন উদ্দেশ্যই হইতে পারে না'। আর, টি, ইলে (R. T. ELY)-ও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেনঃ

"Economics is a science, but something more than a science, a science that though with the infinite variety of human life, calling not only for systematic, ordered thinking, but humam sympathy, imagination, and in an unusual degree for the saving grace of commonsense.'

অর্থনীতি বিজ্ঞান হইলেও বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা এমন বিজ্ঞান, যাহা মানব জীবনের অসীম বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহের আলোচনা করে। ইহা

কেবল সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত চিন্তার আবেদনই জানায় না, মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করিতে এবং বাস্তব জ্ঞান অসাধারণ পরিমাণ সম্প্রসারণ করিতেও উহা সচেষ্ট।

অর্থনীতিবিদ মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞা বলিয়াছেনঃ

Economics is a science which studies man in the ordinary business of life.

'অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। তিনি আরো বলিয়াছেনঃ 'মানুষ কিভাবে আয় উপার্জন করে এবং কিভাবে উপার্জিত আয় ব্যয় করে অর্থনীতি তাহারই নির্দেশ দেয়।'

অধ্যাপক এল. রবিনস্ এর মতে

Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.

"অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান যাহা মানুষের সে সকল আচরণকে অধ্যয়ন অনুশীলন করে, যে সকল আচরণ উদ্দেশ্য এবং নানা বিকল্প দিকে ব্যবহার যোগ্য উপায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে।"

অর্থনীতি কোন ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়। অর্থনীতির প্রকৃত রূপ সামাজিক। সামাজিক জীবনেই অর্থনীতির গুরুত্ব। কেয়ার্নক্রস (Cairnocross) তাই বলিয়াছেনঃ Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange.

বস্তুত সমাজের সর্বসাধারণ মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন অনুসারে পণ্যের উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টন এবং উৎপাদনের উপায় ও উহার সঠিক বন্টনের ন্যায়নীতি সম্পন্ন প্রণালী নির্ধারণ করাই হইতেছে অর্থনীতির কাজ। এই জন্য হওয়েরি (Howerey) দাবি করিয়া বলিয়াছেনঃ

অর্থনীতিকে চরিত্রনীতি হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না বলিয়া এই বিজ্ঞান কোনদিনই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। কারণ মানুষ হিসাবেই উদ্দেশ্য ও উপায়-পন্থার উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।'

কুরআন মজীদে অর্থনীতির এই সামাজিক মূল্যায়নই বিধৃত। তাই অর্থনীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে। অন্যথায় মানুষের প্রতি অবিচার করা হইবে।

## মানব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব

অর্থনীতির পূর্বোদ্ধৃত সংজ্ঞা হইতে একথা পরিস্ফুট হইয়াছে যে, ইহা মানব-জীবনের অসংখ্য দিক ও বিভাগের মধ্যে অন্যতম। উপরন্তু ইহা মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহের

মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করে বলিয়া ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই ইহাকে মানব জীবনের সমস্যা সমষ্টির মধ্যে একটি অংশ—অবশ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ—নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহাকেই যখন জীবনের সকল সমস্যা—সমস্ত জটিলতার একমাত্র মূল উৎস মনে করিয়া উহারই উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং উহার ভিত্তিতে অন্যান্য 'সকল সমস্যার সমাধান করার ব্যর্থ চেষ্টায় মনোনিবেশ করা হয়, তখনি মানব-সমাজে সর্বাত্মক ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই যাহারা মনে করেন, সকল ক্ষেত্রের সকল সমস্যারই মূলে রহিয়াছে অর্থব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থাই সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে'—তাহাদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ মানব-সমাজে একটা ক্ষণিক আলোড়নের সৃষ্টি করে বটে; কিন্তু তাহা কখনও প্রকৃত তথ্য ও সত্যিকার সমাধান পথের সন্ধান আনিয়া দেয় না।

প্রথমতঃ বর্তমান যুগের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিলেই আমরা এই কথার সত্যতা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। আমরা দেখিতেছিঃ বর্তমান সময় শিক্ষিত সমাজে অর্থনীতি সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এ যুগের মানুষের জ্ঞান-চর্চার ধারা, চিন্তার গতি ও ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করিলে পরিস্কার মনে হয়—ইহাদের দৃষ্টিতে অর্থনীতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নাই। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার এতখানি গুরুত্ব বোধ হয় আর কোনদিনই লাভ করিতে পারে নাই। ইতিহাসের একটানা গতিধারায় এই ব্যতিক্রমের মূলে কতকগুলি কারণ রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপর নাই। বস্তুত আজিকার সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া এক চরম সংকটের সম্মুখীন। দারিদ্র, অভাব-অনটন এবং দুঃসহ জঠরজ্বালা আজিকার মানুষকে জর্জরিত, লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে। নির্লিপ্ত শান্তিতে জীবন যাপন করা তো দূরের কথা, দুবেলা পেট ভর্তি করিয়া খাদ্য লাভ করাও আজ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এহেন অর্থনৈতিক সংকটই এ যুগের চিন্তাশীল মানুষকে চিন্তাভারাক্রান্ত ও ভারসাম্যহীন করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদিগকে এই সমস্যার সমাধান পথের সন্ধানকার্যে সকল শক্তি ও প্রতিভা একান্তভাবে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সমাজে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন, সংগ্রহ ও উপার্জনের পন্থা প্রতিনিয়ত জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। জীবিকার্জনের উপায় উত্তরোত্তর সংকটপূর্ণ ও অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া দেখা দিতেছে। আলাপ-আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রণয়ন বর্তমান সময় এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, অতীত ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং উহার ফলে মানব জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যা উহার সম্মুখে একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক জটিলতা মানুষের সকল শক্তি ও প্রতিভাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এইরূপ অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব গুরুত্ব আরোপ করার পরও মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান আজ পর্যন্ত হইতে পারে নাই—এ কথা

তিক্ত হইলেও সন্দেহাতীত সত্য। বস্তুত এই সমস্যা আজিও ঠিক ততখানিই অসমাধ্য হইয়া রহিয়াছে, যতখানি ছিল ইহার প্রথম পর্যায়ে। আধুনিক যুগের অর্থনীতিবিদদের গম্ভীর ও জটিলতর পরিভাষা, শাস্ত্রীয় বিতর্ক ও আলোচনা এবং গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশীলন অর্থনীতিকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে এ কথা ঠিক; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক অর্থ-সমস্যার কোন সমাধানই হয় নাই, ইহাও অনস্বীকার্য।

## চিন্তার বিপর্যয়

শুধু তাহাই নহে, বিগত দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শন এবং অর্থনীতি যে ভাবধারা ও দৃষ্টিকোণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহাতে চিন্তার ঐক্য ও সামঞ্জস্য মাত্রই রক্ষা পায় নাই। উপরন্তু তাহা মানুষের চিন্তা ও কর্মের জগতে বিকেন্দ্রিকতা, বিশ্লিষ্টতা ও নিদারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সংশয়-সংকুল মানস হইতে যে চিন্তাধারা ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাতে ঈমান ও দৃঢ়-প্রত্যয়ের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না, আর সন্দেহ-সংকুল চিন্তাধারা হইতে মানুষ কোন স্বস্তি, কোন স্থায়ী কল্যাণ পথের সন্ধান লাভ করিতে পারে না; উহার সাহায্যে জীবনকে কোন নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করা মাত্রই সম্ভব নয়। এই কারণেই অর্থনীতির সমগ্র বিষয়টি এমন অস্পষ্ট, জটিল ও অসমাধ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। অর্থনীতির এই দূরবস্থার কথা 'বারবারা উটন' (Woothen) ন্যায় বিখ্যাত চিন্তাবিদও স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Lament for Economics গ্রন্থের কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"আমরা আমাদের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশই কেবল মতবাদের অস্ত্র তৈয়ার করার কাজে ব্যয় করিতেছি। অথচ বাস্তব কর্মজীবনে উহার প্রয়োগ মাত্রই করা হয় না।" —"বর্তমান সময় মানুষ যে অর্থবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছে, তাহা হইতে সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। আর তাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্যও নয়।" অর্থশাস্ত্রবিদগণ কখনই একটি কথায় একমত হন না— হইতে পারেন না, এবং বাস্তব কর্মজীবনের সহিত আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নাই।"

এইজন্য বর্তমান সময়ে একদিকে 'অর্থ দর্শনকেই একমাত্র দর্শন এবং পেট ও অন্ন সমস্যাকেই একমাত্র সমস্যা হিসাবে পেশ করা হইতেছে। অধ্যাপক জোডের ভাষার, "বর্তমান যুগের বিজয়ী দর্শন হইতেছে পেট, পেট বা পকেটের দৃষ্টিতেই এ যুগের সব কিছুর বিচার ও যাচাই করা হয়।" অন্যদিকে এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক সমস্যা বলিতে কোন সমস্যাই কোথাও নাই এবং তাহা জীবনকে কোন দিক দিয়াই প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। এই দুইটি মত ও দৃষ্টিকোণ যেমন পরস্পর বিপরীত দুই প্রান্তিকে অবস্থিত; তেমনি এই উভয় প্রকার মত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা এই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে চরমতর অজ্ঞতার পরিণতি। অথচ মূলগতভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তার ব্যাপারে ভারসাম্যহীন হইয়া পড়া—কোন একদিকেরও সীমালংঘন করা—মানুষের গবেষণা নীতির বুনিয়াদি ভুল

আমাদের মতে চিন্তা গবেষণার এই পদ্ধতি মূলতই ত্রুটিপূর্ণ। অর্থনীতি যে মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে একটি গুরুতর সমস্যা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। সেই সঙ্গে ইহাও অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক সমস্যাই মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধানতম সমস্যাও তাহা নয়। আর মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়া গেলেই তাহার সামগ্রিক জীবনের সর্ববিধ সমস্যারও সমাধান আপনা আপনিই হইয়া যাইবে, এই রূপ কথায় শুধু বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা হয় না বরং মহা বিভ্রান্তিরও কারণ হইয়া দাড়ায়। এই কারণে মানব জীবনে পরম সুষ্ঠুতা ও সুসংবদ্ধতা স্থাপনের জন্য একান্তই অপরিহার্য হইতেছে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা, যাহা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে দাড়াইয়া মানুষের সর্ববিধ সমস্যার সুবিচারপূর্ণ সমাধান দিতে সমর্থ হইবে এবং উহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও অনুরূপ সামঞ্জস্যশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ হইবে।

## অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং সকল প্রকার দারিদ্র ও শোষণ-পীড়ন হইতে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য—পরন্তু গণজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যে অর্থনীতি গৃহীত হইবে, তাহাতে অনিবার্যভাবে নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ বর্তমান থাকিতে হইবে। অন্য কথায়, এই মূলনীতিসমূহ যে অর্থনীতিতে বর্তমান থাকিবে, তাহাই মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। আর যাহাতে এই মূলনীতিসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত নহে, তাহা কখনই মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

এই পর্যায়ে এখানে সাতটি মূলনীতির উল্লেখ করা যাইতেছেঃ

১। মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ও অখন্ড 'ইউনিট', উহাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ও খন্ড-বিখন্ড করা এবং খণ্ডিত জীবনের জন্য খণ্ডিত বিধান গ্রহণ করা অতিশয় মারাত্মক। মানব জীবনের এই একত্ব ও অখন্ডত্বের জন্যই উহার সমগ্র দিক ও বিভাগের পারস্পরিক ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকা একান্তই অপরিহার্য। অনুরূপভাবে মানুষের সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থার সহিত অর্থনীতিরও সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজে অর্থব্যবস্থার যে মূল্যমান (values) প্রচলিত থাকিবে, উহার রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক জীবন-বিধানেরও অনুরূপ মূল্যমান বর্তমান থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই মানুষের গোটা জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের অখন্ড ও সার্বিক জীবনের ক্ষেত্রে স্থাপিত হইতে এবং ক্রমবিকাশ লাভ করিতে পারে।

২। সে অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবেঃ নির্বিশেষে সমগ্র মনুষ্য জাতির কল্যাণ সাধন ও সমৃদ্ধি বিধান। বিশেষ কোন বংশ, গোত্র, শ্রেণী জাতি বা অঞ্চলের উন্নতির জন্য উহার বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্বই থাকিবে না।

৩। যে সমাজে সেই অর্থনীতি কার্যকর হইবে, তাহাতে সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়পরতা পূর্ণরূপে স্থাপিত থাকিতে হইবে। তথায় ব্যক্তি বৈষম্যের অবকাশ থাকিতে

পারিবে না। উহার অভ্যন্তরে কোনরূপ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকিতে পারিবে না। উহা মানব সমাজে কোনরূপ শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করিবে না, সমাজের লোকদিগকে শ্রেণী-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবে না, উহার কোন কারণও সেখানে উদ্ভূত হইবে না। এক কথায় উহাতে ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার সুরক্ষিত হইবে। ব্যক্তির উপর আবর্তিত সমাজের অধিকারগুলিও তাহাতে সংরক্ষিত থাকিবে এবং ব্যক্তির অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী বা উহার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না। ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারার ভিত্তিতে এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হইবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি—উভয়েরই স্বার্থের সংরক্ষণ, ব্যষ্টিকে সমষ্টির স্বার্থে আঘাত হানার সুযোগ না দেওয়া এবং সমাজ সমষ্টিকেও ব্যক্তি স্বার্থ গ্রাস করার অবকাশ না দেওয়া—উভয়েরই স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত যে অর্থ ব্যবস্থায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিক স্বার্থে এই নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য ও সামঞ্জস্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহাই হইতেছে নিখুঁত ও নির্ভুল অর্থনীতি।

৪। সে অর্থনীতি সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করার এবং উহাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার সুযোগ করিয়া দিবে। অর্থনৈতিক চেষ্টা, সাধানা ও উপার্জন প্রচেষ্টা চালাইবার অধিকারের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবে।

৫। এই অর্থব্যবস্থার সাহায্যে বৈষয়িক উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উৎকর্ষ এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশও পূর্বরূপে সাধিত হইবে। কারণ নৈতিক উন্নতি ব্যতীত বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি যে মরীচিকা প্রতারণা মাত্র, তাহা এক সন্দেহাতীত ও ঐতিহাসিক সত্য। পাশ্চাত্য জগতের যেসব চিন্তাশীল দার্শনিক নৈতিক চরিত্রের নাম পর্যন্ত শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাহারাও আজ এই সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইংল্যন্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জি. ডি. হব (G. D. hobb) এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেনঃ

> নৈতিক মূল্য ব্যতীত কাজ করায় যে বিপদের আশংকা থাকিয়া যায়, আমি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে চাই। বস্তুত নৈতিক নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা, ইহাতে সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তিই রাজনীতি বা সমাজনীতি কোন ব্যাপারেই বস্তুবাদী (secular) হইতে পারে না।

জার্মান অর্থনীতিবিদগণ যথার্থভাবেই নৈতিক গুনের অর্থনৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। বর্তমানে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নৈতিকতার এই গুরুত্ববোধ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা কস্মিনকালেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহারাও এখন তাহা খুব জোরে-শোরেই স্বীকার করিতেছেন।

বস্তুত উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন কাজই নৈতিক চরিত্রের বিধান-বিমুক্ত হইতে পারে না। কোন উদ্দেশ্যই—তাহা ভাল হউক, মন্দ হউক, নিরপেক্ষ হইতে পারে না। কোন

ব্যক্তিই নৈতিক চরিত্রের অনুসারী না হইয়াও 'বিজ্ঞানী' হইতে পারে বলিয়া মনে করা 'মুনাফিকী' ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এইরূপ মুনাফিকীর ভিত্তি চিন্তাবিশ্লিষ্টতার উপর স্থাপিত। অতএব এহেন অর্থব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ লাভ কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতে পারিবে না, বরং উহাকে সেজন্য রীতিমত সহায়ক ও ব্যবস্থাপক হইতে হইবে। 'নৈতিক চরিত্রের বিকাশ' কথাটি এখানে খুব ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। এহেন অর্থব্যবস্থায় মানুষ যে কেবল তাহার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিনিচয়েরই ক্রমবিকাশ সাধনের উপযোগী হইবে তাহাই নয়, উপরন্তু তাহা পরস্পরের অন্তর্নিহিত শক্তি ও যোগ্যতা-প্রতিভার স্ফূরণ সাধনেরও ইতিবাচক সাহায্যকারী হইবে। এমন কি, এই সহযোগিতা ও সহানুভূতি কেবল সামাজিক চাপে (social conventions) পড়িয়াই হইবে না, তাহা হইবে ব্যক্তির স্বকীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম-উৎসাহ (Initiative) অনুসারে। আর এইরূপ হইলেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে। মানব সমাজের পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার উৎসমুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তি সুখ ও সম্পদে সুসমৃদ্ধ হইলেও সে সমাজকে নিতান্ত দরিদ্র সমাজই বলিতে হইবে। হযরত ঈসা (আ) এই জন্যই বলিয়াছিলেন Men does not live bread alone, but he needs some spiritual foods' 'মানুষ শুধু রুটি পাইয়াই বাঁচিতে পারে না, তাহার "আধ্যাত্মিক (নৈতিক) খাদ্যের"ও প্রয়োজন রহিয়াছে। মানুষের অনশন বা অর্ধাশনই সমাজের দারিদ্র্যের একমাত্র প্রমাণ নয়, সমাজের লোকদের পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা, সহানুভূতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সহৃদয়তার নির্মল ভাবধারার অভাব হওয়াই হইতেছে একটি সমাজের দরিদ্র হওয়ার প্রধানতম লক্ষণ।

৬। সে অর্থব্যবস্থা দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জীবন-যাত্রার মৌলিক প্রয়োজন—খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, চিকিৎসা এবং শিক্ষা—পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। যে অর্থনীতি ইহা করিতে পারে না বা করার জন্য আন্তরিকভাবে নিরন্তর চেষ্টা করে না, তাহা মানুষের গ্রহণযোগ্য অর্থনীতি নয়।

৭। উক্তরূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা ও যথাযথরূপে উহাকে চালু রাখা ব্যক্তির চিন্তা, মত-প্রকাশ, চলাফেরা প্রভৃতির স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণকারী কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। বরং সে জন্য দেশে প্রকৃত গণ-অধিকার সম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। বুর্জোয়া বা সমূহবাদী কিংবা পাশ্চাত্যের প্রতারণাময় গণতন্ত্র নয়, আল্লাহরই সার্বভৌম-ভিত্তিক খিলাফত ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষ ধরনের কোন অর্থ ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্য কোন নিরংকুশ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হইলে তাহা যে স্বাভাবিক ও শাশ্বত অর্থব্যবস্থা নয়, তাহা সুস্পষ্ট। এই জন্যই উপরিউক্তরূপ অর্থব্যবস্থার পশ্চাতে উহার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্য একটি সম্পূর্ণ নিখুঁত গণ-অধিকারবাদী রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এই রাষ্ট্রশক্তি সমাজের লোকদের প্রাণ, ধন ও সম্মানের নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, চলাফেরা ও সম্মেলন সংগঠনের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। উহা একদিকে

সমাজের অর্থব্যবস্থার পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করিবে এবং অপরদিকে সেই অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা স্থাপন করিবে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের যে অর্থনীতিতে মূলতঃই এবং কার্যকরভাবে বর্তমান থাকিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই এক আদর্শ, উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত অর্থব্যবস্থা হইতে পারে। যে অর্থব্যবস্থা এই মানদন্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহা নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণ সাধন—মানুষের জীবনকে সুখী, সুন্দর—সমৃদ্ধ করিতে কোনদিনই সমর্থ হইতে পারে না।

## পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম

উপরিউল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতে পারে যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি কি স্বকপোলকল্পিত, না ইহার মূলে সত্যিই কোন ভিত্তি রহিয়াছে? এবং এই বৈশিষ্ট্য সমন্বিত অর্থব্যবস্থা কি পৃথিবীর কোথাও এবং কোন সময়ই বাস্তবায়িত হইয়াছে? আর ভবিষ্যতে তাহা হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুত মানুষের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনীতির উল্লিখিত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আদৌ কল্পিত নয়, মানুষের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এইরূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান সময় এইরূপ এক অর্থব্যবস্থার জন্য সমগ্র পৃথিবী উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় ব্যাকুল। আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ যে ধরনের অর্থব্যবস্থার সহিত পরিচিত, উহার অধীন তাহারা কিছুমাত্র শান্তি বা স্বস্তি লাভ করিতে পারে নাই, বরং তাহাতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা পর্যন্ত হারাইতে বাধ্য হইয়াছে।

বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম—এই দুই প্রকারের অর্থব্যবস্থাই বাস্তবে প্রচলিত রহিয়াছ—অধুনা প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে এই দুইটিই গ্রাস করিয়া লইয়াছে। অথচ মানবতা এই উভয় ব্যবস্থায় মজলুম, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। বস্তুত এই সব ব্যবস্থায় মানুষ যে কোনক্রমেই সুখী হইতে পারে না, তাহা উভয় ব্যবস্থার আদর্শিক বিশ্লেষণ হইতেই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইবে।

## পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার ছয়টি মূলনীতি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এ সম্পর্কীয় আলোচনার গোড়াতেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুঁজিবাদ নিছক একটি অর্থব্যবস্থা মাত্র নয়, বরং একটি জীবন দর্শন—একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদ অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হইতেছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। ইহাতে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখারই সুযোগ নয়, তাহাতে সকল প্রকার উৎপাদন-উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে পারে এবং যে-কোন পথে তাহা ব্যয় এবং ব্যবহারও

করিতে পারে; যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করিতে পারে এবং যতদুর ইচ্ছা মুনাফাও লুটিতে পারে। শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ রহিয়াছে, তাহাদিগকে শোষণ করিয়া একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুণ্ঠনের পথেও সেখানে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নাই। ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হইয়াও কাহাকেও কোন প্রকার কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে না—সে অধিকার কাহারও নাই।[১]

মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের জন্মগত ইচ্ছা রহিয়াছে। উহার দাবি সম্পূরণ এবং উহার বাস্তব রূপায়নের জন্য ব্যক্তিকে উপার্জন করার এবং উহার ফল এক হাতে সঞ্চিত করিয়া রাখার সুযোগ করিয়া দেওয়া পুঁজিবাদের দ্বিতীয় মূলনীতি। উহার মতে এই সুযোগ না দিলে মানুষ কিছুতেই অর্থোৎপাদনের জন্য উৎসাহী ও অগ্রণী হইবে না।

উহার তৃতীয় মূলনীতি হইতেছে অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহা কেবল বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যেই নয়, এই শ্রেণীর ও একই দলের বিভিন্ন লোকদের মধ্যেও ইহা বর্তমানে কার্যকর রহিয়াছে। মূলত ইহা "বাঁচার লড়াই" (struggle for Existence) নামক দার্শনিক শ্লোগান হইতেই উদ্ভূত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতে প্রতিযোগীতার অবাধ অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে না, প্রচুর উৎপাদন ও তড়িতোৎপাদনেরও ইহাই একমাত্র নিয়ামক। ইহাই মানুষকে বিশ্বরহস্য উদঘাটন করিয়া অভিনব আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

মালিক ও শ্রমিকের অধিকারে মৌলিক পার্থক্য করণ এই ব্যবস্থার চতুর্থ মূলনীতি। এই পার্থক্য যথাযথভাবে বর্তমান রাখিয়াও নাকি পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করা যায়। অথচ ইহার ফলে গোটা মানব সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে—একদল উৎপাদন—উপায়ের একচ্ছত্র মালিক হইয়া পড়ে, আর অপর দল নিতান্তই মেহনতী ও শ্রমবিক্রয়কারী জনতা। প্রথম শ্রেণীর লোক নিজেদের একক দায়িত্বে পণ্যোৎপাদন করে; তাহাতে মুনাফা হইলে তাহা দ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সিন্ধুকই ভর্তি করে, লোকসান হইলে তাহাও একাই নীরবে বরদাশ্‌ত করে। শ্রমিকদের উপর উহার বিশেষ কিছু প্রভাব প্রবর্তিত হয় না। ইহারই ভিত্তিতে পুঁজিদারগণ নিজেদের অমানুষিক ও কঠোরতম কার্যকলাপকেও ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। পুঁজিদারদের যুক্তি এই যে, মূলধন বিনিয়োগ, পণ্যোৎপাদন ইত্যাদিতে সকল প্রকার ঝুঁকি ও দায়িত্ব যখন তাহারাই গ্রহণ করে, তখন মুনাফা হইলেও তাহা এককভাবে তাহাদেরই প্রাপ্য এবং শ্রমিকদিগকে শোষণ করারও তাহাদের অবাধ সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত শ্রমিক শোষণই পুঁজিবাদ অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার।

পঞ্চম মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন ও আয় উৎপাদনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এবং ব্যক্তিগণের কাজের অবাধ সুযোগ করিয়া দেওয়াই রাষ্ট্র-সরকারের দায়িত্ব। জনগণ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক

১. Every person is free to use his property in any manner he likes and he has not to submit to any dictation from any superior in this respect.

চেষ্টা-সাধনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ও চুক্তিসমূহ (Contracts) কার্যকর করার সুবিধা দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ।

ষষ্ঠ মূলনীতিঃ সুদ, জুয়া প্রতারণামূলক কাজ-কারবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিনা সূদে কাহাকেও কিছুদিনের জন্যে 'এক পয়সা' দেওয়া পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে চরম নির্বুদ্ধিতা। বরং উহার 'বিনিময়' অবশ্যই আদায় করিতে হয় এবং উহার হার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হউক, অভাব-অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হউক কিংবা অর্থোপার্জনের উপায়-স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্যই হউক, কোন প্রকারেই লেনদেন বিনাসূদে সম্পন্ন করা পুজিবাদী সমাজে অসম্ভব।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ একটু সূক্ষ্মভাবে যাঁচাই করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা কখনই সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। ইহার মধ্যে দুই একটি বিষয় হয়ত এমনও রহিয়াছে যাহা কোন কোন দিক দিয়া মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে: কিন্তু উহার অধিকাংশই হইতেছে মানবতার পক্ষে মারাত্মক। শুরুতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে উহা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই উহার অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও ধ্বংসকারিতা লোকদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহারা দেখিতে পায় যে, সমাজে ধনসম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সর্বগ্রাসী হস্তে কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছে আর কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব ও বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। উহা ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে একেবারে পথের ভিখারী করিয়া দিতেছে। সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহার ভিত্তিমূলকে চূর্ন-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। একদিকে অসংখ্য পুঁজিদার মাথা উঁচু করিয়া দাড়ায়। অপর দিকে দরিদ্র দুঃখী ও সর্বহারা মানুষের কাফেলা হামাগুড়ি দিয়া চলে সীমাহীন—সংখ্যাহীন। পুঁজিবাদী সমাজে এই আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য দেখিয়া পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও আজ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। অধ্যাপক কোলিন ক্লার্ক বলিয়াছেন, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম এবং সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ের মধ্যে শতকরা বিশলক্ষ গুণ পাথর্ক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য এক একটি সমাজে যে কত বড় ভাঙ্গন ও বিপর্যয় টানিয়া আনিতে পারে, তাহা দুনিয়ার বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

পুঁজিবাদী সমাজের আর একটি মৌলিক ত্রুটি হল বাস্তব ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীই হয় উহার শাসক ও সর্বময় কতৃত্বের অধিকারী। তাহারা মিলিতভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার সহিত গরীব, দুঃখী কৃষক ও শ্রমিককে শোষণ করে, তাহাদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও রক্ত পানি করিয়া উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করিয়া বিলাসিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে: মানুষের বুকের রক্ত লইয়া উৎসবের হোলী খেলায় মাতিয়া উঠে। শক্তির নেশায় মত্ত হইয়া নিরীহ জনতার উপর অমানুষিক

নির্যাতন চালায়। গোটা দেশের বিপুল অর্থসম্পদ বিন্দু-বিন্দু করিয়া অল্প সংখ্যক লোকের হাতে সঞ্চিত হইয়া পড়ে—কুক্ষিগত হইয়া যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন শোষকের। তখন সমাজের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র ও অভাব-অনটনের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, দুনিয়ার সর্বাধিক বৈষয়িক ও বাস্তব উৎকর্ষ লাভ হওয়া সত্ত্বেও উহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক অধিবাসী প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই তিক্ত সত্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, একটি সাম স্যপূর্ণ সুখী ও সুসমৃদ্ধ সমাজ গঠন করিতে, সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অধিকার আদায় করিতে এবং মানব-সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি স্থাপন করিতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। পুঁজিবাদভিত্তিক সমাজে উন্নত অর্থব্যবস্থার এক বিন্দু আলোকচ্ছটা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'হবসন' 'কেরিয়া' এবং তাহার পর 'লর্ড কেইন্‌জ' পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার গভীরতর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব উদঘাটিত করিয়াছেন যে, জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এইরূপ অর্থব্যবস্থার গর্ভ হইতেই জন্মলাভ করে। এইরূপ অর্থব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হইতেছে ধন-সম্পদের অসম বন্টন। এই অসম বন্টনই দেশের কোটি কোটি নাগরিকের ক্রয়-ক্ষমতা হরণ করিয়া লয়। ইহার ফলেই সমাজের মধ্যে সর্বধ্বংসী শ্রেণী-সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট পূঁজিবাদী দেশ আমেরিকায় সাম্প্রতিকালে এইরূপ পরিস্থিতিরই উদ্ভব হইয়াছে। আমেরিকার পণ্যোৎপাদনের বিপুল পরিমাণের সহিত জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই তথায় বিপুল পরিমাণ পণ্য অবিক্রিত থাকিয়া যায়। ফলে এক সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সমগ্র দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় বেকার লোকদের সংখ্যা ৭২ লক্ষ পর্যন্ত পৌছিবে বলিয়া 'ফরচুন' নামক এক মার্কিন পত্রিকা আশংকা প্রকাশ করিয়াছে। আর ইহাই হইল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি ।

## কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদি সমাজের মজলুম শোষিত মানুষকে বুঝ দেওয়া হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। ইহার উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ নির্যাতনের চির অবসান ঘটিবে। এইজন্য কমিউনিজমের অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি Means and Instruments of production জাতীয় মালিকানা বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।[১] ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্রপরিচালক মুষ্টিমেয়

১. বলা বাহুল্য, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পরিভাষা ছাড়া মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়া কোনই পার্থক্য নেই।

শাসক-গোষ্টির নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায় উপাদান ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ।

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য গোড়াতেই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য এবং ইহাকে স্থায়ী ও চালু রাখা এক সর্বাত্মক ডিক্টেটরী শাসনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আর বস্তুতই এই দুইটি উপায় কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্যও বটে।

১৯১৭ সনে রাশিয়ার এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই অর্থব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এই সময়ের মধ্যেই যে তিক্ত ফল দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিয়াছে, তাহা সকল দিক দিয়াই ভয়াবহ। একদিকে তাহা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, অপরদিকে সাধারণ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ সুবিধার গাল-ভরা দাবি পুঁজিবাদীকে দেশের মতই অপূর্ণ ও অবাস্তব হইয়া রহিয়াছে। স্বয়ং রাশিয়ার সরকারী সূত্র হইতে জানা যায়, সে দেশে জনগণের আয়ের হারে পাঁচশত ও তিন লক্ষের পার্থক্য বিদ্যমান।[২] অনুরূপভাবে এ কথাও আজ প্রমাণিত হইয়াছে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানেও অসংখ্য অন্নবস্ত্রহীন মানুষ বাস করে। রাশিয়ার ভিক্ষুকদের বিপুলতা দেখিয়া তথাকার এক যুব প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তোলে এবং অবিলম্বে উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় দাবি করে। এ দেশের যে সকল প্রতিনিধি রাশিযা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের বিবৃতি ও রচনাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিজমের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইযাছে এবং যে অলৌকিক ভূস্বর্গ রচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যে রঙীন ও চিত্তাকর্ষক চিত্র-দ্বারা জন-মানুষদের লোভাতুর করিয়া এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছিল, মূলত তাহা সবই আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। বাস্তব দুনিয়ায় উহার কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ—উভয়ই খোদাহীনতা ও ধর্মহীনতার (secularism) গর্ভ হইতে উদ্ভূত বলিয়া উভয় সমাজের মানুষই মনুষ্যত্বের মহান গুণ-গরিমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, উহা মানুষকে নিতান্ত পশুর স্তরে নামাইয়া দিয়াছে। মানুষ আকৃতি বিশিষ্ট এই 'পশু'গণ তাই আজ পরস্পরের সহিত শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। বর্তমান সময়ের দুইটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ঝগড়া বিবাদ, সীমান্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের অন্তঃসারশূন্যতা বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক দেশ মানুষের বাসোপযোগী নহে। সমাজতান্ত্রিকতার নামে সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতা চিরতরে হরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্যক্তির কোনই মূল্য সেখানে স্বীকৃত নয়। সমাজস্বার্থকে সেখানে সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক রূপে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিকে

২. Soviet Income Tax Shedule ও Soviet Economic Sysem গ্রন্থ দ্রঃ।

সমাজ ও সমষ্টিস্বার্থের বেদীমূলে বলিদান করা হইয়াছে। বস্তুত কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থায় মানুষ সামষ্টিক যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাহার নিজের প্রকৃতি বা প্রয়োজন অনুসারে কোন কাজ করার বিন্দু মাত্র অধিকার তাহার নাই।

উপরে বলিয়াছি, কমিউনিস্ট সমাজ ও উহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, কোন সর্বগ্রাসী ও কঠোর ডিক্টেটরী শাসন-ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ব্যতীত মাত্রই স্থাপিত হইতে এবং কিছু সময়ের জন্যও তাহা চলিতে পারে না। লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করিয়া কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল করা এক কঠিন ও ধ্বংসাত্মক বিপ্লব ব্যতীত মাত্রই সম্ভব নয়"। কমিউনিজমের তৃতীয় পিতা' স্ট্যালিন-ও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেনঃ

"এক কঠিন ও কঠোর সর্বাত্মক বিপ্লব ব্যতীত বুর্জোয়া সমাজে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা কি সম্ভব? ........প্রোলেটারিয়ানদের ডিক্টেটরী শাসন-কর্তৃত্ব ব্যতীত?.....নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে এইরূপ কোন বিপ্লব-সৃষ্টি সম্ভব বলিয়া যদি কেহ মনে করে, তবে হয় তাহার মস্তিস্কে বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যথায় মানুষের সাধারণ বুদ্ধি হইতেও সে বঞ্চিত।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম কোনটিই মানুষকে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণ, উন্নত, মানুষ্যত্বের মর্যাদা স্থাপনকারী এবং সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা দান করিতে মাত্রই সমর্থ হয় না। এই উভয় অর্থব্যবস্থায় কোনটিই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। বরং ব্যাপারটিকে ইহারা আরো অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। অসংখ্য পুঞ্জীভূত আবর্জনার অতল তলে মূল বিষয়টির চাপা দিয়া মানবজাতিকে এক দুঃসহ দুঃখ ব্যথা ও ব্যর্থতা বঞ্চনায় জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবী আজ এই দুই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—নির্মম ও সর্বগ্রাসী নিষ্পেষণে অতিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বমানব আজ এই উভয় প্রকার সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা হইতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চায়, এক তৃতীয়—অর্থ-ব্যবস্থার সন্ধানে বিশ্বমানব আজ নিঃসীম ব্যাকুলতায় উদগ্রীব। আমাদের মতে বিশ্বমানবের সঠিক কল্যাণ করিতে পারে একমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা। অতঃপর দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে আমরা তাহাই পেশ করিব।

## ইসলামী জীবনব্যবস্থার ভিত্তি

বিশ্বমানবের স্থায়ী শান্তিদাতা ও কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থা হইতেছে ইসলামের অর্থনীতি। একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই দুনিয়ার মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করিতে পারে, পারে মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে। ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ কাঠামো পেশ করার পূর্বে উহার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

এ সম্পর্কে প্রথমে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ইসলামের অর্থ-দর্শন উহার জীবন দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন জিনিস নয়। মূলতঃ উহা ইসলামের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র। কোন বস্তুর একটি অংশকে উহার সমষ্টির ও গোটা বস্তুর মধ্যে রাখিয়া বিচার বা যাচাই না করিলে সেই অংশটির প্রকৃত মূল্য ও অবস্থা নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহা এক বৈজ্ঞানিক ও অনস্বীকার্য সত্য। এই সত্য উপেক্ষা করা বা ইহা অনুধাবন করিতে অসমর্থ হওয়ার দরুনই পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাধান বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই। আর এই একদেশদর্শী দৃষ্টির কারণেই আধুনিক সমাজের লোকদের মনে ইসলাম ও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মারাত্মক ভ্রান্তি বোধের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন–ব্যবস্থার মূল ভিত্তিসমূহের উল্লেখ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করি। তাহা হইতে একদিকে যেমন মানব জীবনে অর্থ-ব্যবস্থার স্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা সহজ হইবে, অপরদিকে ইসলামী জীবন–ব্যবস্থায় উহার অর্থনীতির গুরুত্ব এবং স্থানও সকলের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহার পরই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের পথ-নির্দেশ এবং উহার ব্যাপক নীতি-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও উহার আন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিবে।

১. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা বিশ্বাসের প্রথম ভিত্তি হইতেছে উহার বিশ্ব-দর্শন। ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণা করে যে, পৃথিবী এই বিশ্বজগত—এইটি আকস্মিক দুর্ঘটনা সৃষ্ট বস্তু নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এক সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান মহান সত্তা বিশেষ এক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া ও বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই ইহার একমাত্র মালিক, একচ্ছত্র শাসক ও নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকারী। একমাত্র তাঁহারই আইন ও বিধান নিখিল সৃষ্টির পরতে -পরতে চালু হইয়া আছে এবং মনুষ্য-জগতেও একমাত্র তাহারই আইন চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাআলা খলীফা—প্রতিনিধি, আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরন্তু দুনিয়ার এই জীবনই চূড়ান্ত নয়, ইহার পর আর একটি অবিনশ্বর জীবন আসিবে, যখন মানুষকে আল্লাহর সম্মুখে ইহ-জীবনের সকল কাজের ও প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয়ের পর্যন্ত হিসাব দিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী মানুষ পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভ করিতে বাধ্য হইবে।

২. কেবল পেটের দাবি পূরণ করা, নিছক জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করা এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এতদাপেক্ষা বহু উন্নত, মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশী এবং বিরাট। মানুষ একটি অর্থনৈতিক জীব মাত্র নয়, মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত'। এই পৃথিবীতে সত্যের, ন্যায়ের এবং পুণ্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এক

শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করা আর অন্যায়, পাপ ও জুলুমের বিলোপ সাধন করাই মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِالْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ- (ال عمران- ١١٠)

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে । তোমরা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যময় কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়, পাপ ও মন্দ কাজ হইতে লোকদেরকে বিরত রাখ—আর আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

৩. ইসলাম মানব সমাজের শুধু বাহ্যিক সংশোধন-সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে উন্নত ও ক্রমবিকাশমানরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেবল উহাকেই যথেষ্ট মনে করে না। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনের যতখানি সংস্কার বা সংশোধন করিতে চাহে, ব্যক্তি মন, চিন্তা ও জীবন সংশোধন করাকেও ততখানিই অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করে। কারণ, ব্যক্তির মাঝে উন্নত, সততাপূর্ণ ও পবিত্র নৈতিক চরিত্র এবং মহান ভাবধারা সুপরিস্ফুট না হইলে উন্নত ও আদর্শ সমাজ গঠিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সংস্কারকামী লোক সমাজের কেবল বাহ্যিক সংশোধনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা তাহারা বোধ করে নাই। সমষ্টির উপর একদেশদর্শী দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কারণে লোকদের ব্যক্তিগত জীবনকে তথায় উপেক্ষা করা হইয়াছে। আর তাহারই ফলে সমগ্র মানব সমাজই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের ইহা যে এক মারাত্মক বিভ্রান্তি ও ত্রুটি এবং চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে চরম দৈন্যের প্রমাণ, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

৪. ইসলাম এক চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা বলিয়া উহার উপর স্থাপিত রীতি-নীতি ও আদর্শ সমাজ-জীবন পুনর্গঠনের জন্য চিরকালীন মৌলিক ব্যবস্থা—তাহার কোনটিই সাময়িক বা ক্ষণিক নহে। উদ্দেশ্য, নীতি ও লক্ষ্যই উহার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাহা লাভ করার উপায় উপাদান ও সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে কোন স্থায়ী নির্দেশ কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বীন-ইসলামের দুশমনদের সহিত ড়ড়াই সংগ্রাম করিতে গিয়া তাহাতে বন্দুক ব্যবহার করা হইবে, না কামান, তীর ব্যবহার করিতে হইবে না তরবারী —ইসলাম সে সম্পর্কে কিছুই বলে নাই।

ইসলাম শুধু যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নিয়ম-নীতির উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অনুরূপভাবে ভূমি চাষের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করা হইবে না, ট্রাক্টর; শিল্পোৎপাদনের জন্য হস্তচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হইবে, না আধুনিক আবিষ্কৃত বিরাট

১. সম্প্রতি এদেশীয় একদল তথাকথিত চিন্তাশীল (?) লোক তাহাদেরই অন্ধ অনুকরণে মাতিয়া উঠিয়াছে।

যন্ত্রশক্তি, ইসলাম এ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই। বরং জমি লাভ, কারখানা স্থাপন—এই উভয় ক্ষেত্র ও উপায়ের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এই উভয় ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক-মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপন্ন ফসল ও পণ্যের সুবিচারপূণ্য বন্টনের উপরই ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কারণ, পৃথিবীর বাহ্যিক আবরণে—উপায়-উপাদানে, তথা যন্ত্র ও কল-কব্জার পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ সূচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যাপারে কোন 'চিরস্থায়ী সত্য' কথা বলা সমীচীন নয়।—তাহা বলিলে ইসলাম চিরকালের ও সকল দেশের মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হওয়ার মর্যাদা লাভ করিতে পারিত না। পরন্তু নৈতিক নিয়ম এবং মানুষের বাস্তব কর্মজীবনের জন্য প্রদত্ত বিধান ও ব্যবস্থা চিরন্তন, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়—যেমন অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। এইজন্য ইসলাম এই ক্ষেত্রের জন্য চূড়ান্ত ও স্থায়ী মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতি উপস্থাপিত করিয়াছে।

ইসলাম প্রদত্ত ব্যবস্থার এই মূলভিত্তির উপরই উহার বিরাট জীবন প্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে। ইসলামের অর্থনীতি এই বিরাট ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অংশ মাত্র। কাজেই উহাকে এই পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে রাখিয়াই বিচার করিতে হইবে: যখনই উহার আলোচনা-সমালোচনা বা সে সম্পর্কে গবেষণার সময় আসিবে ইসলামের মূলগত ব্যবস্থা ও ভাবধারার সহিত মিলাইয়াই তাহা করিতে হইবে। উহাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতে গেলে মারাত্মক ভুল হওয়া স্বাভাবিক। মূলত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য অসংখ্য সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মনে করা এবং সেই দৃষ্টিতে উহার সমাধান লাভের চেষ্টা করা যেমন বৈজ্ঞানিক ভুল, অনুরূপভাবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধীও। এই পন্থা যাহারা অবলম্বন করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহারা চরম অবৈজ্ঞানিকতার প্রমাণ দিয়াছে এবং ইসলামের নামে তাহারা ইসলাম বিরোধী অর্থনৈতিক মতাদর্শ উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুত ইসলাম মানুষের সমাজ ও উহার পরিবেশের অন্তর্নিহিত গতি-প্রকৃতি এবং নিয়ম কানুন বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। সৃষ্টিকর্তা যে উদ্দেশ্যে মানুষ ও সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, সমাজকে—ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়কেই—সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ-নির্দেশ। এক কথায়, ইসলাম মানব-সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্লেষণের একটি বিশেষ তত্ত্ব এবং সমাজকে নির্বিশেষে সর্বসাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর রূপে গড়িয়া তোলার জন্য একটি সক্রিয় হাতিয়ার। জগত ও জীবনের গতিধারা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীর নাম জীবন-দর্শন; আর মানুষের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর নাম জীবন-সমস্যা। জীবন-সমস্যার আয়তন, গভীরতা ও জটিলতা প্রভৃতির দিক দিয়া পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু জীবন-দর্শন—জীবন-সমস্যার বিশ্লেষণ করার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী—স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। জীবন-দর্শন সাধারণ সূত্র। সাধারণ সূত্রের সাহায্যেই সাধারণ সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই—বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে এবং বিশেষ সিদ্ধান্তে ও বিশেষ সূত্রে উপনীত হইতে হয়। অতএব সাধারণ সূত্র সর্বকালের, সর্বত্র ও সর্বব্যাপারে প্রযোজ্য এবং অপরিবর্তনীয়। ইহা এক বৈজ্ঞানিক যুক্তি-ভিত্তিক অকাট্য সত্য।

# উৎপাদনের উৎস ও উপকরণ

মানুষের জীবন অপরিহার্য প্রয়োজন ও আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে। মানুষের অসংখ্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—বৈষয়িক বা বস্তুতান্ত্রিক এবং নৈতিক বা মানবিক প্রয়োজন। এই প্রয়াজনসমূহ যথাযথভাবে পূর্ণ না করিয়া কোন মানুষই—সে সভ্য হউক, অসভ্য হউক—এক মুহূর্তের তরেও জীবন যাপন করিতে পারে না, বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

মানুষের এই প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিজীবনেই অনুভূত হয় না—সমাজ ও জাতীয় জীবনেও ইহা শাশ্বত ও অনিবার্য। একই দেশের বা একই সমাজের ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রয়োজন পূর্ণ হয় সমাজের লোকদের পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে, আর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অপরিহার্য আন্তর্জাতিক লেন-দেন। এই কারণে প্রত্যেকটি প্রয়োজনেই দুইটি দিক অবশ্যম্ভাবী। একটি দিক উহার জাতীয় বা অভ্যন্তরীণ আর অপরটি আন্তর্জাতিক। এই উভয় দিকে যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও রাষ্ট্রীয়-জীবন কঠিন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে বাধ্য।

মানুষের এই উভয়বিধ-সর্ববিধ—প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাবতীয় অপরিহার্য উপায়-উপাদান মানব-সমাজ ও বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে পূর্ব হইতেই আল্লাতাআলা একত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মুক্ত ও নির্মল বায়ু উদার প্রকৃতির বুকে সতত প্রবহমান। জলীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত জল। আলো ও উত্তাপ অনুরূপভাবে সহজলভ্য। এই তিনটি প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সাধারণভাবে মানুষকে বিশেষ কোন শ্রম-মেহনত বা সাধ্য-সাধনা করিতে হয় না। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রয়োজনই শ্রম-মেহনত বা চেষ্টা-সাধনা ব্যতীত পূর্ণ হইতে পারে না।

মানুষের খাদ্য ও আচ্ছাদনের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তাহা যদিও বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে অফুরন্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাহা উপার্জন সাপেক্ষ, মানুষের শ্রম-মেহনতের সাহায্যেই উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলা আবশ্যক। উহার সহিত মেহনত যুক্ত না হইলে তাহা মানুষের কোন প্রযোজনই পূরণ করিতে পারে না। উপরন্তু, মানুষের কেবল বাঁচিয়া থাকারই প্রয়োজন নয়, যেন-তেন প্রকারে শুধু জীবন ধারণ করাই মানুষের কাম্য নয়। এই উন্নত, সুসভ্য—সর্বোপরি বিশ্বের সেরা সৃষ্টি হিসেবে, উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকার জন্যও তাহার বহুবিধ উপাদান উপকরণ আবশ্যক। এই

উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহও ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে স্বভাবজাত উপকরণের সহিত মানুষের শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার যোগ হইলে।

বস্তুত মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ-উৎপাদন আবশ্যক। উৎপন্ন অর্থ-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ভোগ-ব্যবহারের জন্য আবশ্যক সম্পদ বন্টনের। সম্পদ বন্টন প্রসংগেই পারস্পরিক বিনিময় ব্যবস্থাও অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং সর্বশেষে জাগে লব্ধ ধন-সম্পদ ব্যয় করার প্রশ্ন।

অর্থশাস্ত্রের এই বিভিন্ন পর্যায় ও দিক সম্মুখে রাখিয়াই ইসলামের অর্থনীতির আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনা হইতে দুইটি কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। প্রথম এই যে, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান অতি স্বাভাবিক, সুবিচারমূলক এবং সহজসাধ্য; আর দ্বিতীয় এই যে, মানুষের সর্ববিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে সক্ষম—অন্য কোন ব্যবস্থা নয়।

## উৎপাদনের উৎস

মানব-সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রধানতম ও স্বভাবজাত উপায় (Productive Resources) দুইটিঃ প্রথম জমি এবং দ্বিতীয় জন্তু-জানোয়ার।

প্রত্যেক দেশেই সাধারণতঃ তিন প্রকারের জমি বর্তমান পাওয়া যায়ঃ (১)চাষযোগ্য, (২)খনিজ সম্পন্ন, (৩) বন-জঙ্গল (প্রান্তর এবং মরুভূমিও ইহার মধ্যে গণ্য)।

জন্তু-জানোয়ার সাধারণতঃ দুই প্রকারঃ (১) স্থলভাগের ও (২) জলভাগের।

(১) স্থলভাগের জন্তু-জানোয়ার তিন প্রকার হইয়া থাকেঃ (ক)চতুষ্পদ জন্তু, (খ)পাখী ও (গ) পোকা মাকড়।

(২) জলভাগের জন্তুও দুই প্রকারঃ (ক) জলভাগের পাখী ও মৎস্য এবং (খ) জলজন্তু

এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎ, বাষ্প, বায়ু, অগ্নি বা সূর্যের উত্তাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানও অর্থোৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমান সভ্যজগতে অর্থনীতির মূলে এই উপাদানসমূহের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

উল্লিখিত সকল প্রকার উৎপাদনী উপায়ই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতাআলা প্রকৃতির বুকে পূর্বে হইতেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু এই উপাদান সমূহের কোন একটি হইতেও মানুষ উপকৃত হইতে পারে না। অন্য কথায় এই সব উপাদানের ব্যবহারিক মূল্য হইতে পারে না—যতক্ষণ না এই সবের সহিত মানুষেরর শ্রম যুক্ত হইবে। এইজন্যই সম্পদ লাভের উল্লিখিত উপায় সমূহের সঙ্গে শ্রম-মেহনতকেও একটি উৎপাদনী উপায় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। তাই অর্থনীতিবিদ মার্শাল শ্রমের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ Any exertion of mind or body undergone, partly or wholvly with a view

to some good other than the pleasure derived directly from the work' অর্থাৎ মানসিক বা শারীরিক যে কোন প্রকারের পরিশ্রম যাহা আংশিকভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের নিমিত্ত করা হয়, তাহাই শ্রম।

বস্তুত মানুষের শ্রম-শক্তি তিন প্রকার (ক) বুদ্ধি শক্তি, জ্ঞান-প্রতিভা (Intellect) (খ) শৈল্পিক দক্ষতা ও কুশলতা (Skill and Expert knowledge) ও (গ) দৈহিক বল (Physical power)

(ক) বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি চার প্রকারঃ (১) সাংবাদিকতা বিষয়ক (Journalistic) (২) গবেষণামূলক (Research), (৩) সাংগঠনিক কার্য সম্বন্ধীয় (Administrative), (৪) বিচার বিভাগীয় (Judicial)।

(খ) শৈল্পিক দক্ষতা ও কুশলতা তিন প্রকার ঃ (১) কৃষি কার্যে দক্ষতা (Agricultural skill and knowledge) শিল্পকার্য সম্পর্কীয় দক্ষতা এবং (৩) বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় (Commercial) দক্ষতা।

(গ) দৈহিক শক্তি কেবল মজুর ও শ্রমিক-শ্রেণীর লোকদের জন্যই একটি উৎপাদক উপায়। তাহারা সাধারণত এই একটি মাত্র শক্তির সাহায্যেই জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকে। মস্তিস্ক বা চিন্তাশক্তি থাকিলেও তাহা প্রয়োগের খুব বেশী আবশ্যক হয় না, অবকাশও থাকে না। বস্তুত এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের মেহনতী জনতারই প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে—সকল প্রকার 'কাজের লোক' ইহাদের মধ্য হইতেই পাওয়া যায়। আর সমাজের সকল বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী ইহারাই বিভক্ত হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক উপাদানকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে একদিকে যেমন উহার সহিত মানুষের শ্রমশক্তির প্রয়োগ হওয়া একান্ত আবশ্যক, অপর দিকে মূলধন ব্যতীত মানুষের এই শ্রমশক্তি কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। এই জন্য মূলধনও অর্থোৎপাদনের একটি অন্যতম উপায় (Factor) হিসাবে অবশ্যই গণ্য হইবে।

অতএব প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি, জন্তু-জানোয়ার, শ্রমশক্তি এবং মূলধন এই পাঁচটিই অর্থোৎপাদনের মূল উৎস। মানুষের সাধারণ জৈবিক প্রয়োজন পূর্ণ করিতে এবং উন্নত, সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবন-যাপন করিতে হইলে এই পাঁচটি জিনিসকে ভিত্তি করিয়াই তাহার অর্থনীতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উপায়সমূহ সম্পর্কে সাধারণভাবে ও বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

## প্রাকৃতিক উপাদান

মানুষ প্রাকৃতিক জীবসমূহের অন্যতম। মানবদেহ যেসব মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে তাহাই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার উপরই মানুষের দৈহিক-জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। এই উপাদানসমূহ আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতির বুকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের বস্তুতই যে সব দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সবকিছু প্রকৃতির বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আকাশ,

পৃথিবী, বায়ু, পানি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রভৃতি সবকিছুই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পূর্ণ করার আয়োজনে সতত কর্মনিরত হইয়া আছে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى لْاَرْضِ جَمِيْعًا- (البقرة-٢٩)

পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সবই আল্লাহ তা'আলা—হে মানুষ, তোমাদেরই কল্যাণ বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রত্যকটি অণু-পরমাণু, প্রত্যেকটি পদার্থ বিশেষ করিয়া সূর্য এবং চন্দ্রকে, উভয়ের আবর্তনকে—এক স্থায়ী নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَٰئِبَيْنِ- (ابراهيم-٣٣)

এবং তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও অভিন্ন নিয়মানুবর্তী বানানো হইয়াছে।

এই জন্যই প্রকৃতির সকল উপাদান মানুষেরই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুরআনের ঘোষণাঃ

وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا- (الزخرف-٣٥)

দুনিয়ার এই সব দ্রব্য-সামগ্রী দুনিয়ার জীবন যাপনের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কেবল মানুষেরই নয়—সকল প্রকার জীবজন্তুরই জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জাগতিক ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

ومَامِنْ دَابَّةٍ فِى لْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا- (هود-٦)

পৃথিবীর সকল জীবের রিযিক—জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান—পরিবেশন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার।

অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতির সকল প্রকার জীব-জন্তু ও বস্তু ব্যবহার করা, যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় উপাদান লাভ করার জন্য তাহা প্রয়োগ করা মানুষের কর্তব্য। কারণ মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন না করা আল্লাহর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহা বৈরাগ্যবাদ, এতএব ইসলামে তাহা শুধু পরিত্যাজ্যই নয়: প্রকৃতপক্ষে তাহা অপরাধজনকও নিঃসন্দেহে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ-
(الاعراف-٣٢)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করিয়া তোলার জন্য যেসব উপাদান ও দ্রব্য–সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখানে যেসব পবিত্র ও উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য রহিয়াছে, সেসবকে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে কে?

বস্তুত, এই সকল দ্রব্য-সামগ্রী ও উপায়-উপাদানকে হারাম ও নিষিদ্ধ মনে করার প্রবণতাকেই বলা হয় বৈরাগ্যবাদ এবং

وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَكَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ- (الحديد-٢٧)

বৈরাগ্যবাদ তাহাদের নিজেদেরই মনগড়া, আমি আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপ করার কোন নির্দেশ দান করি নাই।

## পশুর অর্থনৈতিক মূল্য

পশু ও জন্তু–জানোয়ার অর্থোৎপাদনের এক প্রাচীনতম উপাদন। পশু শিকার করিয়া আহার করা যাইতে পারে, বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করা যাইতে পারে, লালন-পালন ও উহার বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া সম্পদ অর্জনের পথ সুগম করা যাইতে পারে। পশুর চামড়া, হাড়-পশম ও দুগ্ধ ইত্যাদি মানব-সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অন্যতম, বিশেষ পশুকে যানবাহন ও ভার বহনের কাজেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষত রেল-লাইন ও জলযানবিহীন এলাকার অভ্যন্তরীণ পণ্য ও লোক চলাচলের বাহন হিসাবে গরু, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ প্রভৃতি আদিম কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং বর্তমান কালেও এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। পশুর এই বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ- (النحل-٥)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই (ব্যবহার ও উপকারের) জন্য পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে পশম রহিয়াছে এবং উহার আরো বহুবিধ ব্যবহারিক মূল্য বা পন্থা রহিয়াছে। (তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে) তোমরা উহা খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করিয়া থাক।

বলিয়াছেনঃ

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا- كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ- (الانعام-١٤٢)

এমন সব চতুষ্পদ জন্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা যানবাহন ও ভার বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার হয় এবং এমন জন্তুও, যাহা খাদ্য হিসাবে ও শয্যার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর দেওয়া রিযিক হিসাবে তোমরা তা খাও।

অপর এক আয়াতের বলা হইয়াছেঃ

وَالْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً- (النحل-٨)

ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এই জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, এই সবকে তোমরা যানবাহন কিংবা ভারবহনের কাজে ব্যবহার করিবে এবং ইহা তোমাদের জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবে।

বস্তুত ঘোড়া ইতিহাস-পূর্বকাল হইতে দ্রুতগামী যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্থল যুদ্ধে আজও গোড়া ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান সভ্যতার অবদানে মোটর বা রেলগাড়ী দ্রুতগতিবান যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও অশ্বের গতিশক্তি Horse power শক্তি-পরিমাপের একক মানদন্ড হিসাবে এখনো গণ্য হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যে প্রাচীন সভ্যতার ক্রোড়েই লালিত-পালিত এবং উহারই প্রভাবাধীন হইয়া আছে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

## পাখীর অর্থনৈতিক মূল্য

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে পাখীরও যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে । প্রথমত উহার গোশত ও ডিম মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহার লালন পালন করিয়া, আরো অধিক পাখী উৎপাদন করিয়া এবং তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করা খুবই সহজ। পাখীর পালক দ্বারাও বহুবিধ মূল্যবান জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, পাখীর ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত কম মূলধন-সাপেক্ষ। এই জন্য নবী করীম (স) সচ্ছল অবস্থার লোকদিগকে পশুপালন এবং সংগতিহীন লোকদিগকে পাখী পালন ব্যবসায় করার নির্দেশ দিয়াছেন।[১]

## মৌমাছি ও গুটিপোকা পালন

মৌমাছির উৎপন্ন মধু এবং মোম হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে বলিয়া মানব-সমাজে উহার যথেষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রহিয়াছে। মধু পুষ্টিকর খাদ্য, উহা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। মধু সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ- (النحل-٦٩)

ইহাতে মানুষের উপকার এবং রোগ-আরোগ্য-গুণ বর্তমান রহিয়াছে।

বস্তুত মধুতে ক,খ ও গ খাদ্য-প্রাণ বর্তমান। ইহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিকৃত থাকে এবং অনায়াসে ইহাকে বহুদূর পথে রফতানী করা চলে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, মৌমাছি পালন খুবই লাভজনক ব্যবসায়। ইহা কুটির শিল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোন যন্ত্র বা শিল্পের সহিত ইহার কোন প্রতিযোগিতা নাই। এইজন্যই ইহার জাতীয় ও

১. ইবনে মাজা ও কানযুল উম্মাল

অর্থনৈতিক মূল্য অত্যধিক। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মধুর ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ এবং প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ কুরআন শরীফে মধুর ব্যবহারিক মূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এই বলিয়াঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ- (النحل-٦٩)

চিন্তাশীল—অনুশীলনকারী ও অনুসন্ধিৎসু লোকদের জন্য ইহাতে যথেষ্ট গবেষণার বিষয় রহিয়াছে।

অনুরূপভাবে গুটিপোকা পালনের যথেষ্ট আর্থিক মূল্য রহিয়াছে। এই পোকা রেশম তৈয়ার করে। এই রেশম বিক্রয় করিয়া কিংবা উহা দ্বারা কাপড় বুনিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করা যাইতে পারে।

## বন-জঙ্গল

জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় বন–জঙ্গলের গাছ-পালা ও লতা-গুল্ম হইতে নানা ভাবে অর্থোৎপাদন হওয়া সম্ভব। শুধু তাহাই নয়, ইহা মানব-জীবনে—তথা মানব–সভ্যতার পক্ষে এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। যুগ-যুগান্তকাল হইতেই ইহা নানাভাবে মানব-সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। বন-জঙ্গল হইতে প্রভূত পরিমাণে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কাষ্ঠ হইতে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া শক্তি-সম্পদ হিসাবেও ইহার মূল্য যথেষ্ট। যে কয়লা ভিন্ন আধুনিক সভ্যতার প্রায় সকল কাজই অচল হইয়া পড়ে, তাহাও এই শক্ত কাঠেরই রূপান্তর। কুরআনে বলা হইয়াছেঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِالْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ- (يس-٨٠)

কাঁচা সবুজ বৃক্ষ হইতে তোমাদের জন্য আল্লাহ অগ্ন্যুৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাই তাহাই তোমরা জ্বালাইয়া থাক।

জ্বালানি কাষ্ঠ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ শক্ত কাঠ বন-জঙ্গলে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, দালান-কোঠার দরজা-জানালা ও কড়িকাঠ, রেল লাইন স্থাপন, নৌকা, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা—প্রভৃতি অসংখ্য কাজে এই কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয়।

কুরআন হাদীসে বন-সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যের বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, রশি লইয়া জঙ্গলে গিয়া কাষ্ঠ আহরণ করা এবং নিজ কাঁধে বহন করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করা অপরের সম্মুখে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করা অপেক্ষা অধিক উত্তম" (বুখারী শরীফ)। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ ফল-মূল, শাক সব্জি এবং কফিও এই বন-সম্পদেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদে এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছেঃ

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهِ اَزْوَاجًا مِنْنَّبَاتٍ شَتّٰى-كُلُوا وَارْعَوا اَنْعَامَكُمْ- (طه-٥٤)

আকাশ হইতে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টিপাত করেন এবং উহার সাহায্যে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষলতা ও শাক-সজ্বি উৎপাদ করেন। হে মানুষ, তোমরা ইহা নিজেরা খাও এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও খাইতে দাও।

## কৃষিকার্য ও বাগান রচনা

মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই কৃষিকার্যের সাহায্যে লাভ করা যায়। এইজন্য অর্থনীতির দৃষ্টিতে ভূমি কর্ষণ ও বাগান রচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের দৈনিক প্রয়োজীয় দ্রব্য–সামগ্রীর শতকরা অন্তত ৯০ ভাগ ভূমি হইতেই লাভ করিতে হয়। কৃষিকার্যকে সুষ্ঠু ও দোষ-ক্রটি মুক্ত করিয়া তোলা প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক সমাজেরই অবশ্য কর্তব্য। এই সর্বশ্রেষ্ট উৎপাদন উপায়ের প্রতি উপেক্ষা ও অমনোযোগিতার দরুন মানব-সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদের সম্মুখীন হয়। এই জন্য কৃষিকার্য ও ভূমি সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা এবং উন্নত প্রণালীতে এই কার্য সম্পাদন করার দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। কৃষিকার্য দ্বারা একদিকে যেমন ধান,গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য লাভ করা যায়, অন্যদিকে পাট, তুলা, রাবার প্রভৃতি অর্থকরী শৈল্পিক উপাদানও তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পুষ্টির জন্য খাদ্য হিসাবে যে শাক-সজির গুরুত্ব অনেক তাও এই জমি চাষ হইতেই পাওয়া সম্ভব। মূলত মানুষ ও গৃহপালিত পশুর খাদ্যের মূল উৎসই হইল ভূমি চাষ।

কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার পথে বিভিন্ন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে। এই প্রতিবন্ধকতা অনতিবিলম্বে দূর না করিলে প্রয়োজনীয় শস্যোৎপাদন মারাত্মকরূপে ব্যাহত হইতে বাধ্য। নিকৃষ্ট ধরণের জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করিলে, সার প্রয়োগের সাহায্যে উর্বরতা বৃদ্ধি করিলে এবং অন্যান্য দিক দিয়া জমির অপচয় ও ক্ষয় প্রতিরোধ করিলে শস্যোৎপাদন প্রচেষ্টা বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, জমির ক্ষয়-ক্ষতি, উপযুক্ত সারের অভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যথাসম্ভব সত্তর দূর করা একান্ত আবশ্যক।

মানব দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপাদেয় ফল খাওয়ারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এজন্য বাগান রচনা করা এবং তাহাতে সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করা কর্তব্য। এইসব বাগান হইতে কেবল খাদ্যোপযোগী ফলই লাভ হইবে না, বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী দ্রব্যাদিও তাহা হইতে সংগ্রহ করা যাইবে। অতএব ভূমি কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বাগান রচনারও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই কাজে উৎসাহ দানের জন্য নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْيَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ - (بخارى)

যে মুসলমান কৃষিকাজ করিবে, ফসল ফলাইবে, বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং কোন পাখী, মানুষ কিংবা জন্তু উহা হইতে কিছু খাইবে তাহা তাহার পক্ষ হইতে দান স্বরূপ গণ্য হইবে (এবং এইজন্য সে সওয়াব পাইবে)।

## প্রস্তর ও খনিজ সম্পদ

প্রস্তর ভূপৃষ্ঠের আর একটি অতি দরকারী বস্তু। ইহা মানুষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দালানকোঠা ব্রীজ-কালভার্ট ও সড়ক-প্রাচীর নির্মাণের ব্যাপারে প্রস্তর, চুনা, সুরকী ইত্যাদি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। কাজেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে প্রস্তরেরও যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে।

ভূপৃষ্টের সীমা সংখ্যাহীন উপাদান-সামগ্রী ও কাঁচামাল ব্যতীত ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের অসামান্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানব-সভ্যতার স্থিতি ও প্রগতির পথে উহার ভূমিকা বিস্ময়কর। মাটির অতল গভীরে অসংখ্য প্রকার মহামূল্যবান খনিজ দ্রব্যের স্তূপ স্বাভাবিকভাবেই পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, উহার পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যতীত। মানুষের জৈব জীবনের পক্ষে অপরিহার্য খনিজ পদার্থ মাটির সহিত মিশিয়া আছে। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।[১] বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-সব্জি ইত্যাদি মাটি হইতে রস গ্রহণ করিয়াই বাঁচে এবং ইহারা মাটির রসের সঙ্গে এই সব খনিজ দ্রব্যও আহরণ করিয়া থাকে। আর মানুষ এইসব গাছ ও লতার ফল-মূল এবং শাক সব্জি ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বলিয়া উল্লিখিত খনিজ পদার্থ সমূহের সারাংশ মানবদেহে প্রবেশ করে।

মানব-সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য লৌহ, তাম্র, পিতল, ইস্পাত, স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-মানিক্য, পেট্রোল ও কেরোসিন ইত্যাদি দ্রব্য মানুষ খনিজ হইতেই লাভ করে। এইসবের অর্থনৈতিক মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اُطْلُبُوا الرِّزْقَ فِىْ خَبَايَا الْاَرْضِ- (طبرانى)

মাটির গভীর তলদেশে—ভূপৃষ্ঠের পরতে পরতে—জীবিকার সন্ধান কর।

যে লৌহ বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মেরুদন্ড এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী ও শৈল্পিক যন্ত্রপাতির আদি পিতা, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

১. কেননা মাটির এই সব মৌলিক উপাদান দিয়াই মানব দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ- (الحديد-٢٥)

আমি লৌহ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাতে বিরাট শক্তি নিহিত রহিয়াছে, এবং আছে মানুষের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হওয়ার অপূর্ব সম্ভাবনা।

## সমুদ্র-সম্পদ

সৃষ্টির আদিকাল হইতে পৃথিবীর বহু দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ সন্নিহিত সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জি হইয়া যাইতেছে। তাহার ফলে সমুদ্র–গর্ভে অশেষ ও অসীম পরিমাণ খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

ভূভাগের শতকরা ৭১ ভাগ সমুদ্র পরিবেষ্টিত। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিশাল সামুদ্রিক ভান্ডারে ৫ কোটি লক্ষ টন পরিমাণ দ্রবীভূত উপাদান বা লবণ বর্তমান আছে। পৃথিবীব্যাপী প্রগতিশীল সমাজের খনিজ ও ধাতব বস্তুর চাহিদা মিটাইবার পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রে বিপুল পরিমাণ মাছ, খাদ্য উপযোগী কঠিন আবরণ বিশিষ্ট জীবসমূহ চিংড়ি মাছ ইত্যাদি শৈবাল ও সামুদ্রিক গাছ-পালাও রহিয়াছে—তাহা দ্বারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান অনায়াসেই হইতে পারে।

উর্বরতার দিক হইতে সমুদ্র যে-কোন সু-উর্বর জমির সঙ্গে তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতি একর জমির উর্বরতার তুলনায় সমুদ্র অধিক উর্বর। ইহা ছাড়া পৃথিবীর উপরিভাগের জমির বেলায় যেমন জলাভাব বা বন্যার ভয় রহিয়াছে, সমুদ্রে তাহা নাই। উপরন্তু পোকা-মাকড়ের আক্রমণে বা গাছপালার ব্যধির ফলে জমিতে উৎপন্ন শশ্যাদি অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়, সমুদ্রে তাহা হইয়া থাকে অতি সামান্য পরিমাণে। কিন্তু মানুষ সমুদ্রের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদের অতি অল্প অংশ মাত্র এখন পর্যন্ত তাহারা কাজে লাগাইতে সার্মথ হইয়াছে।

অধিকন্তু, সামুদ্রিক প্রাণীদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যতখানি অবহিত, সামুদ্রিক আগাছা বা অন্যান্য উদ্ভিদ সম্বন্ধে ততদূর অভিজ্ঞ নহেন।

রাষ্ট্রসংঘের পার্থিব সম্পদের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে যে গড়ে দুই কোটি পরিমাণ মাছ পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র হইতে আহরিত হয়, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ২০ বছরের মধ্যে উহার পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদের এই বিপুল সম্ভাবনার জন্যই আল্লাহ তা'আলা অশান্ত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও সর্বগ্রাসী নদী-সমুদ্রকে মানুষের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়েছেন। মানুষ ইহার তলদেশে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদই আহরণ করিতে পারে।

নদী–সমুদ্র হইতে একদিকে যেমন মানুষের প্রধান খাদ্য মৎস্য আহরণ করা যায়, অপরদিকে মুক্তা-মুংগা প্রভৃতি বহুমূল্য সম্পদও লাভ করা যায়। এইসব সম্ভাবনার দিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেঃ

سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا-

(النحل-١٤)

'সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বাধ্য ও অধীন বানাইয়া রাখা হইয়াছে—যেন তাহা হইতে তোমরা টাটকা মাংস (মাছ) এবং মুক্তা-মুংগা প্রভৃতি অলংকার ও ধাতব দ্রব্য আহরণ করিতে পার।

বস্তুত মাছ মানব সভ্যতার শুরু হইতেই মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আগুন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল বর্তমান যুগেও মৎস্য শিকার এক উল্লেখযোগ্য অর্থকরী শিল্প বিশেষ। মানুষের খাদ্যের মধ্যে 'প্রোটিন' একটি অপরিহার্য দ্রব্য। মাছের মধ্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত সমুদ্র হইতে নানাপ্রকার জলজন্তুও শিকার করা যায়, যাহা মানুষের বিবিধ উপকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যাহা বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে।

## বায়ু, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি

বায়ু, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ উপাদনের কাজে অপরিহার্য। বায়ু এবং বৃষ্টি না হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষা পাইতে পারে না। ইহাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনের জন্যও ইহার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। কুরআন মজীদে এইজন্য স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছেঃ

وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ لاَيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

(البقره-١٦٤)

এবং বায়ুর প্রবাহ ও আবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তী মেঘমালা প্রভৃতিতে বুদ্ধিমান ও মননশীল জনগণের পক্ষে আল্লাহর অস্তিত্বের অনেক নিদর্শন এবং গবেষণার প্রভূত বিষয়বস্তু ও উপকরণ বর্তমান রহিয়াছে।

বিদ্যুৎও অনুরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ইহা বর্তমান সভ্যতার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সন্দেহ নাই। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত না হইলে বর্তমানে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত চরম উন্নতি উৎকর্ষ লাভ যে মোটেই সম্ভব হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য কুরআনের ভাষায়, বিদ্যুৎ মানুষ জাতির আশা

ভারসার প্রধান কেন্দ্র এবং অপূর্ব সম্ভাবনার উৎস বিশেষ। ইহার সদ্ব্যবহারে মানুষের যে বিরাট কল্যাণের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, কুরআন শরীফে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু এই বিদ্যুতের অপব্যবহার হইলে বা পাশবিক দৃষ্টিতে ইহার ব্যবহার করা হইলে যে বিশ্ব-মানবতার ধ্বংস সাধন হইতে পারে কুরআন মজীদে সেদিকেও ইংগিত রহিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ- (الروم-٢٤)

তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন ভয় ও আতংকের জিনিসরূপে এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার উৎসরূপে এবং তিনি উর্ধ্বলোক হইতে পানি বর্ষণ করেন, পরে উহার সাহায্যে মৃত জমি সঞ্জীবিত করেন। বস্তুত ইহাতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের নিদর্শন বর্তমান; চিন্তাশীল লোকদের জন্য গবেষণার বহু বিষয়ও ইহাতে রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষ আজ নানাভাবে ব্যবহার করে, তাহা হইতে নানাবিধ শক্তি আহরণ করিয়া অসংখ্য কাজে নিয়োগ করে। পানি ও আগুনের ব্যবহারে বাষ্প ও বিদ্যুৎ এবং ঝর্ণাধারা, তীব্র জলস্রোত ও বায়ু প্রবাহ হইতে বিরাট শক্তি উৎপন্ন হইয়া মানব-সভ্যতাকে আজ অপূর্ব সম্ভাবনাময় করিয়া তুলিয়াছে। সূর্যকিরণ, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, আণবিক শক্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি নানাদিক দিয়া মানুষের জীবন ও সমাজকে বিপুলভাবে উন্নত করিয়াছে।

## শিল্প

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানুষের সর্ববিদ প্রয়োজনীয় উপাদান কোন না কোনরূপে প্রকৃতির বুকে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই উপাদানসমূহ মানুষ উহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে উহাদের বর্তমান রূপ পরিবর্তন করিয়া। ভেড়ার পশম কেহ ব্যবহার করে না, তাহা হইতে কম্বল বা বিভিন্ন প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করা হইলে পরই তাহা মানুষের ব্যবহারে আসে। খনির কাচা লৌহ মানুষের কোন কল্যাণই করিতে পারে না—যতক্ষণ না তাহা আগুনে জ্বালাইয়া উহা হইতে মানুষের ব্যবহারোপযোগী ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র, কল-কব্জা বা যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইবে। কাষ্ঠ কাঁচামাল হিসাবে কেবল জ্বালানির কাজেই ব্যবহৃত হইতে পারে, অথচ তাহাতে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমের যোগ হইলে তাহা হইতে নৌকা, জাহাজ, ঘরবাড়ি, দালান-কোঠার সরঞ্জাম এবং নানাবিধ মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার তৈয়ার করা সম্ভব। শুধু তাহাই নয়, সভ্যতার অপরিহার্য উপাদান কাগজ এবং এক প্রকার পোশাক ও ইহা হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

বস্তুত কাঁচামালে প্রাকৃতি-উপাদানের স্বাভাবিক অবস্থা, উহার বাহ্যিক রূপ এবং আকৃতি ও আঙ্গিক পরিবর্তন সাধন করিলে উহার ব্যবহারিক মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

অর্থনীতির পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় শিল্প (Industries)। শিল্প-কার্য মানুষের অর্থোৎপাদনের একটি উপায় মাত্র নয়, মূলত অর্থনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইহাই মানব–সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

শিল্প প্রধানত দুই প্রকার। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে যেসব শিল্পকর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহা কুটীর-শিল্প নামে অভিহিত হয়। আর সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলা হয় হস্তশিল্প। কারণ প্রধানত এই কাজ হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন করা হয়—কল–কব্জার ব্যবহার ইহাতে বিশেষ হয় না। বর্তমান সময়ের ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে এককভাবে বা ছোট আকারে (Small scale production) যেসব শিল্পোৎপাদন হয় তাহাও এই গার্হস্থ্য শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোৎপাদনের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে না, বর্তমান বিজ্ঞান মানুষের সামনে বিরাট বিরাট কল-কারখানা স্থাপন এবং বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের সিংহদ্বার উদঘাটন করিয়া দিয়াছে। ইহাকে আমরা 'যন্ত্র-শিল্প' নামে উল্লেখ করিতে পারি। প্রথম প্রকার শিল্পোৎপাদনে অধিক মূলধনের আবশ্যক করে না; কিন্তু শেষোক্ত প্রকার শিল্পোৎপাদন পর্যাপ্ত ও প্রচুর মূলধন ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

বস্তুত এই উভয় প্রকার শিল্পেরই উল্লেখ পাওয়া যায় কুরআন মজীদে। মানব–সভ্যতার প্রাচীনতম কাল হইতেই এই উভয় প্রকার শিল্পকার্যের প্রচলন হইয়াছে। তন্মধ্যে নৌকা, জাহাজ, লৌহ-দুর্গ, বয়লার, খেলনা, পানির কূপ, লৌহ চাদর, প্রাচীন ও বিরাট আকারের তৈজসপত্র প্রস্তুত করার বিষয় কুরআন মজীদে উল্লেখ পাওয়া যায়।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ- (سبا-١٣)

শিল্পী-কারিগরগণ কারখানা মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী দুর্গ, খেলনা, পানির পাত্র এবং বড় বড় বয়লার ইত্যাদি নির্মাণ করিতেছে।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ-حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا- حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا- (كهف-٩٦)

তোমরা আমার নিকট লৌহ-নির্মিত চাদর উপস্থিত কর, (তাহা আনিয়া এক প্রাচীর নির্মাণ করা হইলে) যখন উভয়ের মধ্যখানে এই প্রাচীর উহাদেরই সমান উচু করা হইল তখন লোকদিগকে বলা হইল, এখন আগুনের কুন্ডলি উত্তপ্ত কর। শেষ পর্যন্ত যখন এই লৌহ প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল, তখন সে বলিল, আন, আমি ইহার উপর গলিত তামা ঢালিয়া দিব।

এই আয়াতটি লৌহ ও তাম্র ব্যবহার ও উহার শিল্প গড়িয়া তোলার দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করিতেছে। বর্তমান সভ্যতার চরম মাত্রার উন্নতির মূলে লৌহ ও তাম্র শিল্পের গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না

## মৃৎশিল্প

মাটির দ্বারাও পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনের অসংখ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় । স্থাপত্য, কাঁচ ও আয়না নির্মাণও এই মৃৎশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে ইহার যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক মূল্য রহিয়াছে।

## বয়ন-শিল্প

মানব-সভ্যতায় বয়ন বা বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা এইদিকে যেমন মানুষের লজ্জা নিবারণের উপায়, অপরদিকে ইহা মানুষের ভূষণও বটে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে পোশাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে।

يٰبَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَا سًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا- (الاعراف-٢٦)

হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, অন্য পক্ষে ইহা তোমাদের ভূষণও বটে।

এই পোশাকই মানুষকে শীত-গ্রীষ্মের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে তাহাই বলা হইয়াছেঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّوَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ- (النحل-٨١)

আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য টুপি ও জামা-কোর্তা তৈয়ার করিয়াছেন, যাহা গ্রীষ্মের ও শীতের আক্রমণ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করে, এতদ্ব্যতীত বর্ম ইত্যাদিও প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

তাঁবু, ছাতা, সিল্ক ইত্যাদির কাপড় প্রস্তুত করা এই রয়ন শিল্পেরই বিভিন্ন দিক। এই সবের যে বিরাট অর্থনৈতিক ব্যবহারিক মূল্য রহিয়াছে, তাহা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষার উল্লিখিত হইয়াছে।

## চর্ম শিল্প বা ট্যানারী

গরু,ছাগল, উট এবং অন্যান্য জন্তুর চর্ম হইতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ব্যবহার্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে। নবী করীম (স) মৃত জন্তুর চর্ম কি করা হয় জিজ্ঞাসা করিলে আসহাবগণ উহার ব্যবহার করার বৈধতা সম্পর্কে হযরতের নিকট জানিতে চাহিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম হইলেও উহার চামড়া ও পশম ব্যবহার করা হারাম নয়। তাহা নিঃসন্দেহে যে কোন অর্থকরী কাজে নিযুক্ত ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

চামড়া হইতে জুতা, ব্যাগ, বাকল বড় বড় বই-কিতাবের উৎকৃষ্ট বাঁধাই এবং শীতপ্রধান দেশের জন্য এক প্রকার মোজা ও জামাও তৈয়ার করা হয়।

## পরিবহন ও যানবাহন

পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির জন্য মানুষ আল্লাহ-প্রদত্ত বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে বিভিন্ন জন্তু-জনোয়ার ব্যবহার করিতে পারে, পারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভারবাহী যন্ত্র ও যানবাহন প্রস্তুত করিতে।

পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরিত করার জন্য প্রধানত দুইটি পথই ব্যবহৃত হইয়া থাকে—জলপথ ও স্থলপথ।

জলপথে নৌকা ও জাহাজই হইতেছে প্রধানতম বাহন। কালামে পাকে বলা হইয়াছেঃ

وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ- (البقره-١٦٤)

এবং নৌকা, জাহাজ মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী লইয়া নদী-সমুদ্রে চলাচল করে।

বস্তুত ভারী পণ্য-দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমুদ্রগামী বিরাট বিরাট জাহাজ ব্যতীত সম্ভব নয়।

স্থলপথে আমদানি-রফতানির কাজ সাধারণত এক এক দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকার মধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। এই কাজে প্রাচীনকালে—যন্ত্র সভ্যতার পূর্বকাল পর্যন্ত—চতুষ্পদ জন্তুই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً- (النحل-٨)

ঘোড়া,খচ্চর (গরু, উট ইত্যাদিও) পরিবহন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

যদিও বর্তমান যুগে এই চতুষ্পদ জন্তুই একমাত্র যানবাহন নয়—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ঘোড়া আজিও প্রাচ্যদেশসমূহ গতির এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে শক্তির প্রতীক হইয়া আছে। 'হর্স পাওয়ার' (Horse power) কথাটি বর্তমানে সব দেশেই প্রচলিত, ঘোড়া-খচ্চর-গরু-গাধা যানবাহন হিসাবে আজ পর্যন্তও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই; বর্তমানেও তাহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান সময়ে মোটর, ট্রাক, রেলগাড়ী প্রভৃতি বাষ্পচালিত যানবাহন এই কাজ অত্যন্ত সহজ করিয়া দিয়াছে। এইসব অধুনা-আবিষ্কৃত যানবাহনের সাহায্যে অধিক ভারী দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে ও অতি অল্প সময়ে দূরবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে আমদানী-রফতানি করা চলে। এক কথায় বর্তমান সভ্যতার রক্তচলাচল এইসব যানবাহন ব্যতীত মাত্রই সম্ভব নয়। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَتَحْمِلُ اَثْقَا لَكُمْ اَلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ الرَّحِيْمِ- (النحل-٧)

এইসব যানবাহন তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রী দূরবর্তী এমন সব শহর ও স্থান পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়, যে পর্যন্ত তাহা বহন করিয়া নেওয়া তোমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার ছিল; কিন্তু তোমাদের রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়াময় (বলিয়াই তিনি এইসব যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন)।

মানুষের জীবন সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতির রুদ্ধদ্বার উদারভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জল ও স্থলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত করিয়া মানুষ এখন অন্তরীক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। বায়ুকে করায়ও করিয়া—উহার উপর বিজয় রথ চালাইয়া—দিগ দিগন্তকে একই কেন্দ্রবিন্দুর সহিত নিবিরভাবে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। বস্তুত এই আকাশপথ—এই ব্যোমযানেই-পৃথিবীর দূর-দূরান্তরে অবস্থিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানব সমাজকে পরস্পরের অতি নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছে। এই কথাই বলা হইয়াছে কালামে পাকের নিম্নলিখিত আয়াতেঃ

فَسَخَّرْنَالَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ- (ص-٣٦)

বায়ুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখিয়াছি। তাহা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী খুবই হালকা ও নম্রভাবে প্রবাহিত হয়, যেখানেই উহা পৌঁছায়।

মাটি, পানি ও বায়ুকে আয়ত্তাধীন করিয়া মানুষ অগ্নিকেও কাজে প্রয়োগ করিয়াছে এবং আগুন ও পানির সম্মিলনে বাষ্প সৃষ্টি করিয়া এক বিরাট শক্তি (power) লাভ করিয়াছে। ইহার দরুন এক দেশের উদ্বৃত্ত বা অপ্রয়োজনীয় পণ্য অন্য দেশে রফতানি করা সম্ভবপর হইতেছে। যানবাহনের এই উন্নত শক্তির সাহায্যে প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণ করা যেমন সহজ হইয়াছে, বিরাট আকারে অর্থকরী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার পথও অনুরূপভাবে সুগম হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর জাতিসমূহের এবং একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অসাম্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দূর করা ইহার সাহায্যে অতীব সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

## ব্যবসায়-বাণিজ্য

যানবাহন ও আমদানি-রফতানির সাহায্যে জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য পণ্যদ্রব্য বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রে পৌঁছায়। ব্যবসায়ী তাহা খরিদ করিয়া পুনরায় অন্যত্র বা অন্যভাবে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। কাজেই অর্থোৎপাদনের অন্যান্য অসংখ্য উপায়ের মধ্যে ব্যবসা—বাণিজ্যও একটি অন্যতম উপায়। ব্যবসা—বাণিজ্য দ্বারা অর্থোৎপাদনের জন্য কুরআন মজীদ যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-
(الجمعه-١٠)

নামায সমাপ্ত হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ইতস্তত ছড়াইয়া পড় আল্লাহর অনুগ্রহ—ধনসম্পদ—অনুসন্ধান, আহরণ ও উপার্জন কর।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাহায্যে অর্থোপার্জন করারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উল্লিখিত আয়াতে।

অন্যত্র বলা হইয়াছেঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الاَّاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ- (النساء-٢٩)

মুসলমানগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে অসদুপায়ে পরস্পর পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করিও না। তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসয়া-ব্যণিজ্যের মারফতেই অর্থের আদান-প্রদান কর।

নবী করীম (স) মুসলমানদিগকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং ইসলামী সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পন্থী ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ

اَلتَّاجِرُ لِصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَاشُّهَدَاءِ- (ترمذى)

সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হইবেন।

এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতি ব্যবসায়-বাণিজ্যের অপরিসীম গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা একদিকে যেমন প্রচুর অর্থপার্জনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অপরদিকে ইহা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে সুদৃঢ় ও উন্নত করিয়া তোলে, অন্য কথায়, ইহা মানুষের খোদাভীতি (তাকওয়া) ও নৈতিক চরিত্রের এক কঠোর পরীক্ষা-ক্ষেত্র।

কালামে পাকে বলা হইয়াছেঃ

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا- (البقرة-٢٧٥)

আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করিয়াছেন, কিন্তু সূদ ও সূদভিত্তিক যাবতীয় কারবার হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

تِسْعَةُ اَعْشَارِ الرِّزْقِ فِىْ التِّجَارَةِ- (كنزالعمال)

রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রহিয়াছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে। বস্তুত জাতীয় জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিরাট স্তম্ভ বিশেষ; তাই বলা হইয়াছেঃ

لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ لَصِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ- (كنزالعمال)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই ব্যবস্থা না হইলে তোমাদের জীবন দুর্বিসহ ও অপরের উপর দুর্বহ বোঝা হইয়া পড়িত।

## শ্রম ও উপার্জনের অধিকার

মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য জীবন-যাপনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও উপাদান-উপকরণ বিশ্বপ্রকৃতির বুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সব মূলতই মুবাহ—তাহা ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকার সাধারণভাবে সকল মানুষেরই সমানভাবে বর্তমান। প্রত্যেক মানুষই তাহা হইতে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহা প্রয়োগ ও বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জনও করিতে পারে। ইহা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত বা স্বাভাবিক অধিকার। এইসব স্বভাবজাত দ্রব্য-সামগ্রী সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন মানুষেরই কিছুমাত্র শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয় নাই। কাজেই নৈসর্গিক উপাদানের উপর কাহারও একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা নিরংকুশ ভোগাধিকার স্থাপিত হইতে পারে না। শ্রমেরও ব্যবহারিক বা বিনিময় মূল্য রহিয়াছে এবং তাহাও একপ্রকার সম্পদ বা উৎপাদন উপায়, ইসলামী অর্থনীতি এ কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছে। মানুষের মধ্যে শ্রমশক্তি জন্মগতভাবেই নিহিত ও সুপ্ত রহিয়াছে। আল্লাহর বাণী এই শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত করিয়াছে। কুরআন মজীদে নানাভাবে মানুষকে কর্মশক্তি প্রয়োগ করার ও এই ব্যাপারে কোনরূপ অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও গাফিলতি প্রদর্শন না করার জন্য আকুল আহবান জানানো হইয়াছে।

একটি আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ- (يس - ٣٥)

তাহারা যেন উহার ফসল ভোগ করে, যেন ভোগ করে তাহাদের হাত যেসব কাজ করিয়াছে তাহার ফলও। এইরূপ অবস্থায় তাহারা কি শোকর করিবে না?

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানুষের খাদ্য দুইটি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে। একটি জমিতে গাছ-গাছড়া জন্মাইয়া উহার ফল ও ফসল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা। আর দ্বিতীয়টি—হাত দ্বারা কোন পণ্যদ্রব্য তৈয়ার করা এবং উহার সরাসরি বিনিময়ে অথবা উহার দরুন লব্ধ মজুরীর বিনিময়ে খাদ্য-দ্রব্য খরিদ করা। আর এই দুইটি উপায়ের মূলে মানুষের শ্রমই অপরিহার্য উৎস। শ্রম না হইলে এই দুইটি পথের কোন পথেই মানুষের খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হওয়া সম্ভব হইতে পারে না।

নবী করীম (স) শ্রম করিয়া জীবিকার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং শ্রম করার কারণে তাঁহার হাতে ফোসকা পড়িয়া গিয়াছিল। এই ফোসকা পড়া হাত দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ

هَذِهِ يَدٌ يُحِبُّهَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ

আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল এইরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।

শ্রমিকের কোন কাজই নিষ্ফল যাইতে পারে না। শ্রমিক যে শ্রমই করিবে উহার মজুরী সে অবশ্যই পাইবে। শ্রমের মূল্য ও মজুরী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা মানবতা বিরোধী কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ (هود-١٥)

যে লোক দুনিয়ার জীবন ও ইহার সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণমাত্রায় দান করিব এবং এই ব্যাপারে তাহারা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

আয়াতটি যদিও পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের সম্পর্কে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আয়াতটির বৈষয়িক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ইহার বাহ্যিক অর্থ এই কথাই প্রমাণ করে যে, যে-লোক যে-কাজই করিবে, সে-ই উহার প্রতিফল লাভের অধিকারী হইবে এবং এই শ্রমের প্রতিফল তথা মজুরী হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা আল্লাহ্র নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই ইসলাম পরিশ্রম করিয়া সম্পদ আহরণ ও অর্থোপার্জন করার নির্দেশ দিয়াছে।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ (عنكبوت-١٧)

আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা আর যাহার যাহার উপাসনা ও দাসত্ব কর, তাহারা কেহই তোমাদের রিযিক-এর মালিক নয়—তাহারা কেহই তোমাদিগকে রিযিক দিতে পারে না। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নিকটই রিযিক-এর সন্ধান কর।

এই আয়াত হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট ভাষায় জানা যায়। প্রথমত, মানুষের রিযিকের মালিক—রিয্কদাতা—আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ মানুষকে রিযিক দানের যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন তাহা এই যে, মানুষের নিজেকেই তাহা সন্ধান করিতে হইবে—তাহা উপার্জনের জন্য মানুষকে রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইবে। ইসলামী অর্থনীতি অর্থোপার্জনের জন্য পরিশ্রম করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছেঃ

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - (الملك-١٥)

সেই মহান আল্লাহ্ই জমিকে তোমাদের জন্য নরম মসৃণ বানাইয়া দিয়াছেন। অতএব, তোমরা ইহার পরতে পরতে সন্ধানকার্য চালাও এবং এই সবের মাধ্যমে আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক তোমরা আহার কর এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে (এই কথা অবশ্যই স্মরণে রাখিবে)।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেনঃ

مَنْ مَشى فَقَدْ اَكَلَ وَمَنْ كَانَ قَادِراً عَلَى الْمَشْيِ وَلَمْ يَمْشِ كَانَ جُدَيْراً الأَيَاكُلَ-

যে লোক জমির উপর শ্রম করিবে সে-ই খাদ্য পাইবে। যে তাহার সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শ্রম করিবে না, সে খাদ্য না পাওয়ার যোগ্য।

অতএব, শ্রম খাদ্য উপার্জনের প্রধান ও প্রথম উপায়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের রিযিক লাভ করাকে তাহার নিজের শ্রম করার উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন।

সূরা আল-জুম'আর আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَا نْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ- (الجمعة-١٠)

যখন নামায পড়া সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তোমরা জমির দিকে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্র নিকট অনুগ্রহের সন্ধান কর।

এই আয়াত অনুযায়ী যে লোক আল্লাহ্র নিকট হইতে রিযিক লাভের জন্য অনুসন্ধান চালাইবে ও শ্রম করিবে, সে অবশ্যই খাইতে পাইবে।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

كَسْبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (بيهقى فى شعب الا يمان)

হালাল রুজী উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।

অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ-

শ্রমজীবী ও উপার্জনকারী আল্লাহ্র বন্ধু।

অপর হাদীসে ইরশাদ হইয়াছে

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ- (بخاري-احمد)

নিজ হস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছু নাই।

সাহাবাগণ নবী করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

اَىُّ الْكَسَبُ اَطْيَبُ-

কোন্ প্রকারের উপার্জন উত্তম?

জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেনঃ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ- (احمد)

ব্যক্তির নিজ হাতের কাজের বিনিময় কিম্বা সুষ্ঠু ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা।

রাসূলে করীম (স) তাকীদ করিয়া বলিয়াছেনঃ

لَا يَاْخُذُ اَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ فَيَاْتِى بِحَزَمَةِ الْحَطَبِ عَلٰى ظَهْرِ خَيْبِهَا يَكُفُّ اللّٰهُ
بِهَا وَيُدَ بِّرُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اُعْطُوْهُ اَوْمَنَعُوْهُ- (بخارى)

তোমাদের কেহ রশি লইয়া গিয়া জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া স্বীয় পিঠের উপর বহন করিয়া লইয়া আসিলে আল্লাহ্ তাহাকে সেই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবেন, যাহাতে কিছু পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই।

اِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنُوْ مُوا عَنْ طَلْبِ اَرْزَاقِكُمْ-

ফজরের নামায পড়ার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হইয়া ঘুমাইয়া থাকিও না।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা 'দিন'-কে মানুষের জীবিকার্জনের উপযুক্ত সময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথাঃ

وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ- (بني اسراءيل-١٢)

আমি দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছি, যেন এই সময় তোমরা তোমাদের আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার।

শ্রেষ্ঠ মানব হযরত নবী করীম (স) এবং তাঁহার সাহাবীগণ অর্থোপার্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহারা সকলেই শ্রম করিয়া ধন

উপার্জন বা পণ্যোৎপাদনের এক উজ্জ্বলতম আদর্শ মানব সমাজের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। কুরআন মজীদে এই কাজের জন্য প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছেঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (المزمل - ٢٠)

আর অন্যান্য বহুলোক (সাহাবী) এমন রহিয়াছে যাহারা জমিনের দিকে দিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

তাই ইসলামে প্রত্যেকটি মানুষের জীবিকা উপার্জনের পূর্ণ আযাদী থাকা আবশ্যক। সেইজন্য সকল প্রকার উপায় ও পন্থা ব্যক্তির অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাই থাকিতে পারে না। সামাজিক বা আইনগত কোন বাধাও থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যেসব পন্থা ও ব্যবস্থা সমাজে কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব কিংবা ভোগাধিকার স্থাপন করে ইসলামী অর্থনীতি তাহা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। এক কথায়, ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজে জীবিকার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা রক্ষিত হইতে হইবে।

## মূলধন

প্রাকৃতিক উপাদানের সহিত মানুষের শ্রমের যোগ হইলে সম্পদ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। পরিশ্রমলব্ধ ও উপার্জিত এই সম্পদকে আরও অধিক লাভের উদ্দেশ্যে অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করিলে তখন উহাকে বলা হয় মূলধন (Capital)।

বস্তুত মূলধনও অর্থোৎপাদনের একটি উপায় (Factor)। মূলধন ব্যতীত মানুষের শুধু শ্রম কখনই কোন মূল্যোৎপাদন করিতে পারে না। শ্রমের সঙ্গে মূলধনের মিলন হইলেই মানবসমাজে প্রচুর অর্থোৎপাদনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।

এই জন্যই ইসলাম সঞ্চিত অর্থ সম্পদকে অব্যবহৃত ও বাক্‌স-বন্দী করিয়া রাখিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছে। ব্যষ্টি বা সমষ্টির নিকট কোন মূলধন সঞ্চিত হইলেই উহা আরও অধিক অর্থোৎপাদনের কোন সুসংবদ্ধ কাজে নিয়োগ করার জন্য কুরআন মজীদে তীব্র ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- (التوبه- ٣٥)

যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (মূলধন) সঞ্চিত করিয়া রাখে, মানুষের কল্যাণকর কাজে উহা খরচ করে না,তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।

ধনসম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখা এবং তাহা অধিক জনকল্যাণকর কাজে নিয়োগ না করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। ফী সাবীলিল্লাহ—আল্লাহ্‌র পথে

খরচ করার অর্থ কেবল গরীব-দুঃখীদের মধ্যে মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ বন্টন বা দান করা নয়; জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির যে কোন কাজে, বেকার জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের যে কোন পন্থায় মূলধন বিনিয়োগ করাও আল্লাহ্‌র পথে খরচ করারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই ধরনের কাজে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে সমাজের অসংখ্য বেকার ও জীবিকাহীন মানুষের জন্য জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব হয়। বস্তুত ইহা অপেক্ষা 'আল্লাহ্ পথের কাজ' বড় আর কিছুই হইতে পারে না। এই জন্যই ইসলামী সমাজে অর্থগৃধ্নু–অর্থ সঞ্চয়কারীকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ-

(الهمزة)

অপরকে দোষারোপ করা এবং পরকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য অপমান সূচক কথা বলা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য বড়ই দুঃখজনক পরিণাম। তাহারা কেবল টাকা-পয়সা জমা করে এবং (উহা কি রকম বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বার বার গণিয়া দেখে। উহারা ধারণা করে যে, তাহাদের ধনসম্পত্তিই তাহাদিগকে চিরঞ্জীব করিয়া রাখিবে।

ইসলামী সমাজের অর্থসম্পদ কোন ক্রমেই এক হস্তে বা একটি গোষ্ঠীর মুষ্ঠিতে পুঞ্জীভূত হইতে ও অব্যবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে না। এমনকি, কোন ইয়াতীম শিশুরও কোন নগদ অর্থ থাকিলে তাহাও যে কোন লাভজনক কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلَامَنْ وَلِّى يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَايَتْرُكْهُ حَتّٰى تَا كُلَهُ الصَّدَقَةُ-

(موطا امام مالك، ترمذى)

সাবধান, তোমাদের কেহ ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত হইলে এবং তাহাদের নগদ টাকা থাকিলে তাহা অবশ্যই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবে। তাহা অকাজে ফেলিয়া রাখিবে না। অন্যথায় বাৎসরিক যাকাত ও সাদকাই উহার মূলধন নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে।

কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হইয়াছেঃ

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ- (الحشر٧)

ইসলামী সমাজের ধনসম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যেই কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিতে না পারে।

খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে ইয়াতীমদের অর্থসম্পদও অধিক ধন-উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হইত। হযরত উমর ফারূক (রা) মূলধন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এমন কি সরকারী বৃত্তিধারী লোকদেরও তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ

ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। কারণ, তাহা হইলে তাহাদেরই সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদিগকে অধিককাল পর্যন্ত সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না এবং তাহাদের অর্ন্তধানের পর তাহাদের সন্তান-সন্ততি সহায়-সম্বলহীন হইয়া পরের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইবে না।

একজন সাহাবীর নিকট কোন শ্রমিক মজুরীবাবদ প্রাপ্য কিছু পরিমাণ অর্থ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত তাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই অবসরে তাহার টাকা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা না করিয়া উক্ত সাহাবী অধিক অর্থোৎপাদনের কাজে উহা বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে তাহাতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। কিছুকাল পরে সেই মজুর ফিরিয়া আসিলে শুধু তাহার মজুরী বাবদ প্রাপ্য টাকাই তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল না, সেই সঙ্গে তদলব্ধ মুনাফাও তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইসলামী সমাজে টাকা-পয়সা বিনা কাজে সঞ্চয় করিয়া রাখা—তাহা যে-কোন টাকাই হউক না কেন—নীতিগত ভাবেই অন্যায়। এই জন্যই উল্লিখিত সাহাবীও মজুরের প্রাপ্য অর্থকে বেকার ফেলিয়া না রাখিয়া লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুত ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাহারও মূলধন বৃদ্ধি পাইলে ইসলামী সমাজে পুঁজিবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠে না। ইসলামে পুঁজির ব্যবহার পদ্ধতি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট হইয়া আছে এবং উহার উপর এমন সব বাধ্যবাধকতা ও বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া উহাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে যে, তদনুযায়ী পুঁজি বিনিয়োগ হইলে তাহা দ্বারা জাতীয় সম্পদই বৃদ্ধি পায় এবং তাহা সমাজের বিপুল জনগণের মধ্যেই অব্যাহত ধারায় আবর্তিত হইয়া মানব সাধারণের অপূর্ব কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এইজন্য নবী করীম (স) ব্যক্তি এবং সমষ্টি—উভয়কেই পুঁজি তথা মূলধন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিতে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

اِنَّكَ اَنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

(بخاري شريف)

তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকদের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে সচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী করিয়া রাখিয়া যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভাল।

# অর্থোৎপাদনের পন্থা

মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য দ্রব্য-সামগ্রী এবং সুসভ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান উপকরণ উৎপন্ন করার মৌলিক উপায়সমূহের প্রয়োগ ও ব্যবহার কিভাবে হইতে পারে—পক্ষান্তরে কোন্ নিয়ম-পন্থা অনুযায়ী ঐগুলির প্রয়োগ এ ব্যবহার করিলে সুষ্ঠুরূপে প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন সম্ভব, বর্তমান নিবন্ধে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই।

মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অপরিহার্য দ্রব্য-সামগ্রী আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, মানুষের এমন কোন প্রয়োজনেরই নাম করা যাইতে পারে না, যাহা পূরণের জন্য কোন দ্রব্য যথাযথভাবে কিংবা উহার মূল উপাদান বিশ্বপ্রকৃতির বুকে বর্তমান নাই।

## ধন-সম্পদের মালিকানা

অর্থোৎপাদন পর্যায়ে সর্বাধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্ন। এই নিবন্ধের শুরুতেই আমরা এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

ধন-সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের মৌল ঘোষণা হইল, আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ মালিকত্ব ও সার্বভৌমত্ব। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হইয়াছে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ- (الشورى-٤٩)

আকাশমন্ডল ও জমিনের মালিকানা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট।

বলা হইয়াছেঃ

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (البقره-٢٨٤)

আকাশমন্ডলে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আছে জমিনে, তাহার সব কিছুই আল্লাহ্র জন্য—আল্লাহ্র মালিকানাধীন।

এই দুইটি এবং এই ধরনের অসংখ্য আয়াত হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদ ও যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণ-সামগ্রী যত কিছুর অস্তিত্ব আছে—তাহা মাটি, জমি, নদী-সমুদ্র, পানি, সূর্যতাপ, চন্দ্রের আলো যাহাই হউক না কেন—সব কিছুই

নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানাভুক্ত। এই ব্যাপারে কেহই তাঁহার সমতুল্য নাই, কেহ তাহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, এই মালিকত্বে কেহ তাঁহার সহিত শরীকও নাই। উপরন্তু আল্লাহর এই মালিকানা ফল ভোগ ও ব্যয় ব্যবহারের দিক দিয়া নয়, তাঁহার এই মালিকানা হইল মৌলিক সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণাধিকারের দিক দিয়া। তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র মালিকানা সম্পর্কে এইরূপ কথা বলার কি কারণ থাকিতে পারে? আমরা মনে করি এই কথা বলার মূলে দুইটি উদ্দেশ্য নিহিতঃ

একটি এই যে, মানুষ যখন ধন-সম্পদ অর্জন করিয়া লয়, তখন তাহার মনে ধন-সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভের দরুন যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা জাগিয়া উঠে, এই আয়াত দ্বারা উহার পথ বন্ধ করা হইয়াছে। কেননা অহংকার—অর্থনৈতিক অহংকার ও গৌরব—সমাজ জীবনে বহু প্রকারের পাপের স্রোত প্রবাহিত করে। কিন্তু ধন-সম্পদের স্বত্বাধিকারী যদি ঈমানদার লোক হয়, তাহা হইলে সে প্রতিমুহূর্তে মনে রাখিবে যে, এই ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক সে নিজে নয়, মালিক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। এই বিশ্বাসে তাহার মন ভরপুর ও প্রশান্ত হইয়া থাকিবে এবং ধন-সম্পদ লইয়া তাহার মনে কোনরূপ অহঙ্কার ও অহমিকা জাগিবে না।

আর দ্বিতীয় হইল, মালিকানার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধানকে সে পুরাপুরি মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং আল্লাহ্‌র মর্জীর বিপরীত পথে সে একটি কপর্দক আয়-ও করিবে না, ব্যয়-ও করিবে না।

সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা পর্যায়ে কুরআন মজীদের দ্বিতীয় ঘোষণা হইলঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ- (ابراهيم-٣٣-٣٦)

তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জলভাগের যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করিয়া (চলাচলের যোগ্য করিয়া) দিয়াছেন, যেন উহা তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক সমুদ্র বক্ষে যাতায়াত করিতে পারে এবং তিনি তোমাদের জন্য খাল ও নদী-নালাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন: নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে—উহা চির আবর্তনশীল। তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

অপর একটি আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ-

জমিনে যাহা কিছু আছে তাহা সবই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ন্ত্রিত ও কর্মরত করিয়াছেন।

বলিয়াছেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِى السَّمٰوَاتِ- (الجاثيه -١٣)

তিনি তোমাদের জন্য আকাশমন্ডলে যাহা কিছু আছে তাহা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

এই আয়াতে যে দুনিয়ার সব শক্তি, উপাদান ও দ্রব্য-সামগ্রীকে মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণ বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের তরফ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে মানুষের জন্য। ইহার বিনিময় তিনি মানুষের নিকট হইতে কোন মূল্য গ্রহণ করেন নাই। নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন মানুষের কাজে ব্যবহৃত হইবার জন্য, মানুষের ভোগ-ব্যবহারে আসার ও তাহাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য।

এই বিশ্বলোককে মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়ার এই মৌলিক ঘোষণায় দুইটি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

প্রথম, এই দুনিয়ার কোন কিছু আয়ত্তাধীন করা মানুষের পক্ষে কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক, প্রতিভা ও কর্ম-শক্তি একাগ্রভাবে নিয়োজিত হইলে আল্লাহ্‌র দেওয়া তওফীক অনুযায়ী তাহা সম্ভব ও সহজ। ইহাতে মানুষের ইচ্ছা–সংকল্প ও কর্মপ্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এই সবকে মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলেও মানুষ প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম নিয়োজিত না করিলে এবং উহা হইতে উপকৃত হইতে ও ফল লাভ করিতে চেষ্টিত না হইলে কোন কিছু লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয়,আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণ লাভ করার ও ভোগ-ব্যবহার করার ব্যাপারে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অভিন্ন ও সমান অধিকার সম্পন্ন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এই সবকিছুকে আয়ত্তাধীন হইবার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন নির্বিশেষ সমস্ত মানুষের জন্য। ইহাতে বিশেষ কোন ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী বা বর্ণের লোকদিগকে সম্বোধন করা হয় নাই এবং এই গুলির উপর কাহাকেও একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারীও বানানো হয় নাই।

পরন্তু ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি সামগ্রীই মানুষের কোন মূল লক্ষ্যবস্তু নয়। উহা মানুষের জীবন-যাপনের উপকরণ মাত্র। উহা ব্যবহার করিয়া মানুষ নিজেদের প্রয়োজর পূরণ করে ও কল্যাণ লাভ করে। অতএব, যে লোক উহা এই উদ্দেশ্যে ও এই নিয়মে ব্যবহার করিবে, তাহার হাতে এই সম্পদ ও সম্পত্তি তাহার নিজের ও সমাজের জনগণের সাধারণ কল্যাণে নিয়োজিত থাকিবে। কিন্তু কেহ যদি উহাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, চরম কাম্য এবং একান্তই বাঞ্ছনীয়রূপে গ্রহণ করে, উহার সাধ আস্বাদনেই মশগুল হইয়া থাকে,তবে তাহার হাতের এই মাল-সম্পদ তাহার নিজের জন্যও যেমন ধ্বংস টানিয়া আনে, তেমনি ধ্বংসের সৃষ্টি করে গোটা সমাজেরও। সাধারণভাবে সমগ্র মানুষের জন্য তাহা সার্বিক বিপর্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ঠিক এই কারণেই ধন-সম্পদ ও বৃত্ত-সম্পত্তিকে কুরআন মজীদে خير 'পরম কল্যাণের উৎস' এবং فضل الله 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

মালিকানা সম্পর্কে পশ্চিম অর্থনীতিবিদদের উপস্থাপিত ধারণা পুঁজিবাদী অর্থনীতির উৎস। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন (John Austin) মালিকানার সংজ্ঞা বলিয়াছেন।

মালিকানা মূল অর্থের দিক দিয়া কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর এক ধরনের অধিকার দেয় যাহা ভোগ-ব্যবহারের দিক দিয়া অসীম এবং ব্যয় ও হস্তান্তর করার ব্যাপারে শর্তহীন। (Leetures on Jurisprudence, Vol. II, P. 790)

মালিকানা অধিকারের এই সংজ্ঞা উহার ইসলামী সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ন ভিন্নতর। কেননা এই সংজ্ঞায় মালিককে অসীম ও শর্তহীন অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এইরূপ ধারণার কোন স্থান নাই।

ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপঃ

اَلْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّرِعُ ابْتِدَأَعَلَى التَّصَرُّفِ اِلَّا لِمَا نِعٍ-

(الا شباء والنظا نر-ابن نجيم ص- ٢٩٤)

মালিকানা ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার বিশেষ, শরীয়াত-দাতার অনুমতি, উহার উৎস, উহার প্রমাণকারী; অবশ্য ইহার কোন নিষেধকারী থাকিলে তাহা অন্য কথা।

মালিকানা অপর এক সংজ্ঞায় বলা হইয়াছেঃ

فِيْ اِصْطِلَاحِ الْفِقْهِ اَلْمِلْكُ اِتِّصَلُ شَرْعِيٌّ بَيْنَ الْاِ نْسَانِ وَبَيْنَ شَيْءٍ يَكُوْنُ سَبَبًا لِتَصَرُّفِهِ وَمَا نِعًا عَنْ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ-

(دأرة الماعارف، حيدر اباد، دكن ١٣٢٩ هجر)

ফিক্‌হার পরিভাষায় মালিকানা হইল মানুষ ও কোন জিনিসের পারস্পরিক শরীয়াতসম্মত সম্পর্কে; যাহার দরুন মালিক উহার ব্যয়-ব্যাবহার করিতে পারে এবং অপর লোকদিগকে উহা ব্যয়-ব্যাবহার হইতে নিষেধ করিতে পারে।

শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে উদ্‌রীস মালিকানার সংজ্ঞা দিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

اَلْمِلْكُ اِبَاحَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِيْ عَيْنٍ اَوْ مَنْفَعَةٍ اِ تُمَكِّنُ صَا حِبَهَا مِنَ الْاِ نْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْعَيْنِ اَوِالْمَنْفَعَةِ اَوْاَخْذِ الْعَوْضِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ هِيَ كَذَلِكَ -

(الفروق ج٣ ض ٢١٦)

মালিকানা হইল কোন জিনিস বা মুনাফা সম্পর্কে শরীয়াতভিত্তিক এমন অনুমতি যাহার দরুন মালিক সেই জিনিস নিজে ভোগ-ব্যবহার করার কিংবা উহার মুনাফা নিজে লাভ করা বা উহার বিনিময় লাভ করার অধিকার পাইয়া যায়। কেননা উহার অবস্থা-ই এইরূপ।

এ যুগের একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মুস্তফা আহমদ জুরকা লিখিয়াছেনঃ

اَلْمِلْكُ هُوَ اِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يَسُوْغُ لِصَاحِبِهِ التَّصَرُّفُ الاَّ لِمَانِعٍ

(المدخل الفقهى العام ص -١٥٩)

মালিকানা হইল কোন জিনিসকে এমনভাবে খাস করিয়া লওয়া যাহা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অন্যদের হস্তক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত হয়। এইরূপ যে করিবে সে উহার ব্যয়-ব্যবহার করার অধিকারী হইবে—কোন নিষেধকারী হইলে অন্য কথা।

এই সব সংজ্ঞা মূলত একই জিনিস প্রমাণিত করে। মালিকানা অবশ্যই শরীয়াতের বিধান মুতাবিক অর্জন করিতে হইবে। শরীয়াত যেরূপ মালিকানা অধিকার দেয় তাহাই স্বীকৃতব্য। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানার মূল উৎস হইল শরীয়াতের বিধান-দাতার অনুমতি। শরীয়াত দাতার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত কোনরূপ মালিকানা যে ইলামের স্বীকৃত নয়, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই।

ইহা হইতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামে মানুষের ক্ষেত্রে ধন-সম্পত্তির মালিকত্বের কোন নিজস্ব বা বিশেষ স্থান বা গুরুত্ব নাই। অন্য কথায় নিরংকুশ মালিকানা ইসলামে কোন মানুষের জন্যই স্বীকৃত নয়। উহা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহার মুকাবিলা—বান্দার মালিকত্ব মূলত মালিকানায় নয়, ইহা আসলে আল্লাহ্‌র মালিকানার খিলাফত—আমানতদারি মাত্র।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানারও কোন অবকাশ ইসলামে নাই। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কারুর মালিকত্বই আল্লাহ্‌র মালিকত্বের সমান নয়।

## প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রকারভেদ

মানুষের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীকে ইসলাম দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। প্রথম, স্বভাবজাত ও নৈসর্গিক—যাহা প্রস্তুত করিতে মানুষের কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নাই। আর দ্বিতীয় হইতেছে মানুষের শ্রমলব্ধ উপাদান এবং শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ উৎপাদিত পণ্যরাজি।

## প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার-নীতি

উল্লিখিত দুই প্রকার উপাদানের ভোগ ও ব্যবহারাধিকার সম্পর্কেও ইসলামের দুইটি নীতি রহিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকার উপাদানের ভোগ-ব্যবহার করার ব্যাপারে একটি দেশের বা অঞ্চলের সকল মানুষেরই সমান অধিকার রহিয়াছে, উহার উপর বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির একচেটিয়া মালিকান-কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। সকল নাগরিকই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য উহা হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামগ্রী অবাধে গ্রহণ করিতে পারে: সে জন্য কোন মূল্য আদায় করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যাইতে পারে না।

নদী-পুকুরের পানি, বন-জংগলের কাষ্ঠ, স্বভাবজাত বৃক্ষ-গুল্মের ফলমূল, ঘাস-তৃণলতা, আলো-বাতাস, অরণ্য ও মরুভূমির উম্মুক্ত জন্তু, পাখী, জমির উপরিভাগস্থ খনিজ সম্পদ—সূর্মা-লবণ, ডানবির (Napther) প্রভৃতির উপর কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

এই ধরনের যাবতীয় জিনিসই সকল নাগরিকের সম্মিলিত ও সর্বাধিকার সম্পন্ন সম্পদ। ইহা সকল মানুষের মিলিত ব্যাবস্থাধীন থাকিবে এবং সকলের জন্য ব্যবহৃত হইবে। সকলেই তাহা হইতে উপকৃত হইবার সমান অধিকার লাভ করিবে। হযরত নবী করীম (স) এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রধান সামগ্রীর ভোগাধিকার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِى ثَلَاثِ اَلْمَاءُ وَ الْكَلَاءُ وَالنَّارُ-

(كتاب الا موالو احمد، ابوداؤذ، كتاب الخراج)

সকল মানুষই পানি, ঘাস এবং আগুন-উত্তাপের ব্যবহারধিকারে সমানভাবে অংশীদার।[১]

রসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءَ - (موطاما لك)

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি অপরের জমিতে যাইতে বাধা দেওয়া চলিবে না। কেননা ইহার ফলে পানিহীন জমির মালিককে তাহার জমির ঘাস ও ফসল হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

আল্লামা খাত্তাবী একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

فِى هَذَا دَلِيْلٌ اَنَّ الْكَلَاءَ وَالرَّعْى لَا يُمْنَعُ مِنَ السَّارِحَةِ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَسْتَاْثِرَ بِهِ دُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ - (معا لم السنن ٣-ص ٤٣)

পশুগুলির সাধারণ খাদ্য গ্রহণ হইতে উহাদের কোন মালিককে নিষেধ করা যাইবে না। কেহ অন্য মানুষের পশুগুলিকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই একক মালিক হইয়া বসিবে, তাহা জায়েয নয়। এই হাদীস তাহাই প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত যেসব জিনিস নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় এবং যাহা কাহারও ব্যক্তিগত ভোগাধিকারে বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাধীনে ছাড়িয়া দিলে সর্ব সাধারণের সমূহ অসুবিধা, কষ্ট বা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহা সবই সার্বজনীন মালিকানা সামগ্রী হিসাবে গণ্য হইবে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এ সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

مِلْكُ اَحَدٍ بِا لْاِ حْتِجَارِ مِلْكُ مَنَعَةٍ فَضَاقَ عَلَى النَّاسِ فَاِنْ اَخَذَ الْعَوْضَ عَنْهُ

১. এখানে আবিষ্কৃত গ্যাস ও তেল এই পর্যায়ে গণ্য।

اَغْلَاهُ فَخَرَجَ عَنِ الْمَوَاضِعِ الَّذِىْ وَضَعَهُ اللّٰهُ مِنْ تَعْمِيْمِ ذَوِى الْحَوَائِجِ مِنْ غَيْرِ كَلْفَةٍ (المغنى)

সীমানা নির্দিষ্ট করার পর কেহ এই সব 'জিনিসের' মালিক হইয়া বসিলে সে উহার ভোগাধিকার হইতে অন্য লোকদিগকে বিরত ও বঞ্চিত করিবে এবং জনগণ ভয়ানক অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হইবে। ইহার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা যে জিনিসকে যে কাজের জন্য যে মর্যাদা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সেই মর্যাদায় বর্তমান থাকিয়া নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না এবং তাহাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

খনিজ-সম্পদ, ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ অন্যান্য মুল্যবান সম্পদ—যে জন্য বিশেষ কোন পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না, তাহাও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত হইতে পারে না।

শাহ্ ওয়ালাউল্লাহ্ দিহ্লভী (র) লিখিয়াছেনঃ

لَا شَكَّ اَنَّ الْمَعْدَنَ الظَّاهِرَ الَّذِى لا يَحْتَاجُ اِلٰى كَثِيْرِ عَمَلٍ اِقْطَاعُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِضْرَارُ بِهِمْ وَتَضْيِيْقُ عَلَيْهِمْ - (حجة الله البا لغه ج ٢ص ١٠٤)

যেসব জমির উপরিভাগস্থ খনিজ-সম্পদ আহরণ করায় বিশেষ কোন শ্রম বা প্রচুর পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের আবশ্যক হয় না, তাহা কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানায় ছাড়িয়া দিলে সর্ব সাধারণ মুসলমানের কষ্ট ও অসুবিধা হইবে।

অতএব, বর্তমান সময়ে সকল প্রকার খনিজ-সম্পদই এই নীতির অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়িবে।

যে চারণভূমি কোন এলাকার সমস্ত পশুর জন্য নির্দিষ্ট হইবে, ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুসলিম সকলেরই পশু তাহাতে বিচরণ করিতে পারিবে, উহার উপর কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হইতে পারে না। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لا حِمى اِلاَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِه-

চারণভূমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট (তাহাতে অপর কাহারো মালিকানার একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত নয়)।

আর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রদত্ত ব্যবহারাধিকার সর্বসাধারণের জন্য।

মোটকথা, ইসলামী অর্থনীতি সর্বসাধারণের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষের ব্যক্তিগত ও একচেটিয়া মালিকানা স্থাপনের অধিকার দেয় না। অনুরূপভাবে আধুনিককালের যেসব ভারী শিল্প ও সার্বজনীন কার্য কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর অধিকারে ন্যস্ত করা হইলে জনসাধারণের অসুবিধার

আশংকা রহিয়াছে, তাহার উপরও সার্বজনীন মালিকানা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা কাহারো ব্যক্তিগত বা দলগত কর্তৃত্বে ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের নাই। নবী করীম (স) ইবরাজ ইবনে হাম্মাল নামক একজন সাহাবীকে ইয়মেনের মায়ারিক নামক শহরে একটি নির্দিষ্ট স্থান জায়গীর হিসাবে দান করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, এই স্থানটিতে লবণের খনি রহিয়াছে, যাহা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য, তখন তিনি উহা তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইলেন।[১] ইহার কারণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

لِاَنَّ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَالْـمَـاءِ اَنَّ النَّاسَ جَمِيْعًا فِيْهِ شُرَكَاءُ فُكَرِهَ اَنْ يَّجْعَلَهُ لِرَجُلٍ يَجُوْزُهُ دُوْنَ النَّاسِ

কেননা ঘাস, আগুন, উত্তাপ ও পানি ইত্যাদির ব্যাপারে রাসূলে করীমের নীতি হইল, উহাতে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সমান অধিকার সম্পন্ন। এই জন্য তিনি এই সব জিনিস সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করিয়া বিশেষ কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াকে পছন্দ করিতে পারেন নাই।[২]

এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেনঃ

لَيْسَ لِلْاِ مَامِ اَنْ يَقْطِعَ مَا لَا غِنَى الْمُسْلِمِيْنَ عَنْهُ يَعْنِى اِذَاكَانَتْ اَجَمَّتُهُ اَوْ بَحْرٌ يَشْرَبُوْنَ مِنْهُ اَوْ مِلْحَةٌ لِاَهْلِ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لِلْاِ مَامِ اَنْ يُقْطِعَ ذَالِكَ

(كتب الا موال، ابي عبيد ص ٢٩٢)

যেসব জিনিস সাধারণভাবে সকল মুসলমানের (নাগরিকদের) অত্যাবশ্যকীয়—যেমন খাল, নদী বা সমুদ্র যাহা হইতে সকলেই পানি পান করে কিম্বা লবণের আকর, যাহা সমস্ত এলাকাবাসীর জন্য জরুরী, তাহা কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানায় দান করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের নাই।

## রাষ্ট্রয়ত্তকরণ ও ব্যক্তিগত মালিকানা

প্রাকৃতিক উপাদানে ব্যক্তিগতভাবে কাহারো মালিক না হওয়া এবং তাহার উপর সকল মানুষের সামগ্রিক অধিকার স্থাপিত হওয়াকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (Nationalization) বা রাষ্ট্রীয়করণ।

---

১. فتوح البادان ص ٨٤، كتاب الا موال لابى عبيد ص ٢٧٦

২. ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, জমি বন্টনের ব্যাপারে সরকারের ভুল হইতে পারে, অনপযুক্ত বা অনধিকারী ব্যক্তি উহা পাইয়া যাইতে পারে কিম্বা যাহা সাধারণ্যে বন্টনীয় নয়, তাহা বন্টন হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বন্টন প্রত্যাহার করা কর্তব্য।

বর্তমান সময় এই রাষ্ট্রীয়করণ কথাটি এক শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ইহাই মূল কথা। এই মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক উপাদান-সামগ্রী এবং মানুষের শ্রমলব্ধ সম্পদের মধ্যে মালিকানার দিক দিয়া কোনই পার্থক্য নাই। বরং সকল প্রকার উপায়-উপাদান ও উৎপাদন-উপায়কেই তাহারা সমানভাবে সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ বলিয়া মনে করে। কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন জিনিসেরই মালিক হইবে না, সব কিছুই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে—সাধরণত কমিউনিজম ও মার্কসবাদের ধ্বজাধারিগণই এই মত পোষণ ও প্রচার করিয়া থাকে। এই মতের দৃষ্টিতে সমাজের মধ্যে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার কোন গুরুত্ব বা মর্যদাও নাই। নৈতিক প্রাধান্য একান্তভাবে সমাজেরই করায়ত্ত থাকে। ব্যক্তি তথায় খাটিবে, মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিবে, কিন্তু উপার্জিত সম্পদের উপর তাহার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র কোন স্বত্ব স্বীকৃত হইবে না। 'আমার' বলিয়া কোন জিনিসের উপর সে দাবি করিতে পারিবে না। সমাজ তাহাকে এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া নিজেই উহার উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপন করিবে। ব্যক্তি তাহার মেহনত যোগ্যতা ও মননশক্তি ব্যয় করিয়া উপার্জন করিবে এবং তাহার বিনিময়ে সমাজের নিকট হইতে পেটভরা খাদ্য, পরিধানের জন্য বস্ত্র আর সম্ভব হইলে থাকিবার জন্য একটি খুপড়ি লাভ করিবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে সমাজের চাকর, 'চাকরী'ই তাহার ললাট লিখন, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার একমাত্র রক্ষাকবচ। বলা বাহুল্য, কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের ইহাই সারকথা।[১]

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি সম্পদ ও সম্পত্তির এই নিরংকুশ রাষ্ট্রীয়করণ নীতিকে একটি জাতীয় আদর্শ হিসাবে মাত্রই সমর্থন করে না। ইসলামী অর্থনীতি কোন একক ও বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নয়, ইহা মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার একটি শাখা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মানব-জীবনের অসংখ্য দিক ও বিভাগের একটি দিক মাত্র। কাজেই ইসলাম যেমন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে কোন সমাজ গঠন করে না, অনুরূপভাবে ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক গোলামীর দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের বেদীমূলে তাহাকে বলি দিতেও ইসলাম মোটেই প্রস্তুত নয়।

ইহার কারণ এই যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জীব-জন্তু ও বস্তুর সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। মানুষ প্রধানত ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য। ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। ব্যক্তি হয় সমাজেরই একজন কিন্তু সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা সুস্পষ্ট হইয়া থাকে সব সময়ই। ব্যক্তি-সত্তা সেখানে কোন ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না। নামায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদি ব্যক্তি-মানুষের কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যদিও এই সকল কাজ সম্পাদন করিতে হয় সামাজিকভাবে-সমষ্টিগতভাবে। ইসলামের অর্থনীতিও কখনো ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া

১. ইহা কমিউনিজমের তত্ত্বকথা। বাস্তবের সহিত ইহার মিল খুবই কম। কেননা উত্তরকালে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যক্তিদিগকে কিছুটা মালিকানা ভোগের সুযোগ দিয়াছে।

সমাজের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে না। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিকেও সেখানে নিরংকুশ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যক্তিগত মালিকানা-অধিকার ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী ও নিরংকুশ স্বাধীন বানাইয়া দেয়। সমাজ ও মানব-সমষ্টিরও কোন গুরুত্ব তাহাতে স্বীকৃত হয় না। সমাজ থাকুক কি ধ্বংস হইয়া যাউক, দেশের কোটি কোটি মানুষ বাঁচুক কি অনাহারে মৃত্যুর মুখে পতিত হউক—স্বেচ্ছাচারমূলক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অর্থাৎ পুঁজিবাদে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। সে জন্য কাহারো একবিন্দু মাথা-ব্যাথাও নাই। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে তো ব্যক্তিগত সমস্যা বলিতে কিছুই নাই। সেখানে সমাজের সমস্যা লইয়া রাষ্ট্রের যাহাকিছু মাথাব্যথা।

বস্তুত, মানবসমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। যেখানেই ব্যক্তিকে অধিকতর স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে, সেখানেই মানুষ হিংস্র পশুতে—অর্থনৈতিক গৃধ্নুতে—পরিণত হইয়াছে। আর যেখানেই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া—পুঁজিবাদের এই অবিচারমূলক ব্যবস্থা দূর করার নাম করিয়া—মানুষকে শোষণ-মুক্ত করিবার গালভরা দাবি করা হইয়াছে এবং সমাজকেই সর্বশক্তির আধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক অধিকার হরণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, সেখানেই সমাজের নামে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক কোটি কোটি মানুষের শুধু নিরংকুশ শাসকই হয় নাই, একমাত্র হইয়া বসিয়াছে। সেখানে ব্যক্তি-মানুষের কেবল অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যই বিলুপ্ত হয় নাই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হইতেও মানুষ নির্মমভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজের এই সমস্যা দুনিয়ার কোন মতাদর্শই আজ পর্যন্ত সমাধান করিতে পারে নাই। ইহার চূড়ান্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিচারমূলক সমাধান করিয়াছে একমাত্র 'রিযিকদাতা' 'ভাগ্যবিধাতা—তথা জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালি ৮ ও ইসলাম। মানব-সমাজের অস্বাভাবিক ও অবিচারমূলক ব্যবস্থার এই দুই সীমান্তের মধ্যখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে ইসলামের সুবিচারমূলক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজে—অর্থনীতিতেও—ব্যক্তিকে সমাজ-শৃঙ্খলার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে ব্যক্তি যতখানি সত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রও ঠিক ততখানিই সত্য। সেখানে ব্যক্তিকে তাহার জীবন রক্ষার জন্য যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার ততখানি সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, যতখানি দেওয়া হইয়াছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাঁচাইবার জন্য। ব্যক্তিকে দায়ী বানানো হইয়াছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাঁচাইবার জন্য। ব্যক্তিকে দায়ী বানানো হইয়াছে সমষ্টির জন্য। আবার সমাজ সমষ্টিকেও দায়ী বানানো হইয়াছে ব্যক্তির জন্য। ব্যক্তি ও সমষ্টি-এর কোনটিই ইসলামে উপেক্ষিত নয়।

অতএব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় না ব্যক্তি-মালিকানার চরম ও নিরংকুশ অবকাশ রহিয়াছে, না জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণের নামে সমগ্র সম্পদ ও সম্পত্তির উপর মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও নির্মম নিষ্পেষণ নীতি স্থাপনের সুযোগ। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপনই হইতেছে এই চিরন্তন সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ইসলাম স্বাভাবিক, নৈসর্গিক ও সকল মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে অপরিহার্য উপাদানসমূহকে ব্যক্তি-মালিকানার অধিকারভুক্ত করে নাই বলিয়া এবং 'দুনিয়ার সবকিছুর মালিক আল্লাহ' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে দেখিয়া, ব্যক্তিগত ভোগাধিকার ও মালিকানাধিকার হরণ করা আর যাহাই হউক, ইসলামী মতাদর্শ হইতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তো সারেজাহানের প্রত্যেকটি বস্তুরই মালিক, তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? কিন্তু আল্লাহ্র এই 'মালিকানা'—পূর্বে যেমন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—তাঁহার নিজের ভোগ-ব্যবহারের জন্য নয়; আল্লাহ্ নিজে কোন জিনিসেরই ভোগ বা ব্যবহার করেন না। আল্লাহ্র মালিকানা তাঁহার প্রভুত্ব ও বিধান পালনের ভিতর দিয়াই স্বীকৃত ও কার্যকর হইয়া থাকে। কাজেই দুনিয়ার সমস্ত জিনিস—যাহা মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে—আল্লাহ্র নিয়ম ও বিধান অনুসারেই ব্যবহার করিতে এবং উৎপাদন ও বন্টন করিতে হইবে। সেজন্য মানুষ নিজেদের মনগড়া কোন বিধান রচনা করিতে পারিবে না, করিলে তাহা অনধিকার চর্চা হইবে। কেননা মানুষ নিজস্বভাবে ধন-সম্পদের স্রষ্টা, উৎপাদক বা মালিক নহে। প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ্, আল্লাহ্র মর্জী ও আল্লাহ্রই আইন-বিধান পুরাপুরিভাবে তাহাতে কার্যকর হইবে। মানুষ যাহার প্রকৃত স্রষ্টা বা মালিক নয় তাহার উপর নিজের মর্জী চালাইবার ও স্বীয় মনগড়া বিধান ও ব্যবস্থা চালু করার মানুষের কি অধিকার থাকিতে পারে? বস্তুত, ইহাই হইতেছে আল্লাহ্র মালিকানার প্রকৃত তাৎপর্য। কাজেই এই দুইটি নতুন আবিষ্কৃত ছিদ্রপথ হইতে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের (Socialism) অনুপ্রবেশ কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

পক্ষান্তরে, ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার সহিত পুঁজিবাদী মতাদর্শের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বেড়ান ব্যক্তিকে ইনসাফ ও অধিকার আদায়ের বিধি-নিষেধ পালনের অনিবার্যতা হইতে মুক্তি দিয়া চরম পুঁজিতন্ত্রের প্রসার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ ইসলামের সহিত—বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থার সহিত—এই ধরনের কার্যকলাপের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

বিশেষত, ইসলামের ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানার কুরআনী মর্যাদা হইল খিলাফত। এই বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে মানুষের যাহা আসল মর্যাদা, ধন-সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারের অধিকারেও ঠিক সেই মর্যাদা-ই স্বীকৃত। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের ঘোষণা হইলঃ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ رَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ – (الحديد ٧)

তোমরা আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদিগকে যে ধন-সম্পদে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় ব্যবহার কর।

আল্লামা আলূসী এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেনঃ

اَیْ جَعَلَكُمْ سُبْحَا نَهُ خُلَفَاءَ عَنْهُ عَزَّوَجَلَّ فِى التَّصَرُّفِ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَمْلِكُوْنَ حَقِيْقَةً – (روح المعا نى ج ٢٨ص ٦٩)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তাঁহার তরফ হইতে ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ, ব্যয় ও ব্যবহার করার জন্য খলীফা বানাইয়াছেন, যদিও তোমরা উহার প্রকৃত মালিক নও।

আয়াতটির বক্তব্য হইলঃ দুনিয়ার ধন-সম্পদে মানুষকে খলীফা বানানো হইয়াছে। ইহার ব্যয় ও ভোগ ব্যবহার করার অধিকার মানুষকে দেওয়া হইয়াছে আল্লাহ্‌র দেওয়া আইন ও বিধানের মধ্যে থাকিয়া। কেননা প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ্ নিজেই। মানুষ তাঁহার 'খলীফা' মাত্র এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবেই তাহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-মালের আমানতদার। এই খিলাফত মর্যাদাকেই অথবা আমানতদারীকেই আমাদের ভাষায় 'মালিকানা' বলি। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার এই ধরনের 'ব্যক্তিগত মালিকান' একটা সামাজিক দায়িত্ব হিসাবেই প্রয়োগ করিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত ধন মালকে সামষ্টিক ধন-মাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছেঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - (النس)

তোমরা তোমাদের ধন-মালকে পারস্পরিক বাতিল উপায়ে ভক্ষণ বা গ্রহণ করিও না।

বুঝা গেল যে, ব্যক্তিগত আমানতদারীতে রক্ষিত যাবতীয় ধন-মাল সমষ্টির অধিকারের ধন-মাল। সেই ধন-মালে সব ঈমানদার ব্যক্তিরই সমান অধিকার রহিয়াছে।

## জাতীয়করণ নীতির অবৈজ্ঞানিকতা

একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শ হিসাবে জাতীয়করণ নীতি (Nationalization) প্রকৃতপক্ষেই অবৈজ্ঞানিক, মানবতার পক্ষে এতদাপেক্ষা মারাত্মক অভিশাপ আর একটিও হইতে পারে না।

বস্তুত, মানুষের মধ্যে স্বভাবগত যে 'অহম জ্ঞান' (Ego) রহিয়াছে তাহা ব্যক্তিগত মালিকানা-সম্পর্কিত ভাবধারার উৎসমূল। একটি শিশু যখন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অনুভব করে এবং সে তাহার নিজস্ব শক্তি সম্পন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনা করিতে শুরু করে, তখনি তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার চেতনা জাগ্রত হয়। ক্রমশঃ ইহা পরিবর্ধিত হইতে থাকে। যে কারণে মানুষ 'আমি', 'তুমি' এবং 'সে' বলিয়া পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, ঠিক সেই কারণেই মানুষ 'আমার', 'তোমার' ও 'তাহার' বলিয়া দ্রব্য-সম্পদের উপর অধিকার প্রয়োগের দিক দিয়াও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করিতে বাধ্য হয়। ইহারই পরিণামে 'আমার মালিকানা' 'তোমার মালিকানা' এবং 'তাহার মালিকানা'র ধারণা মানব-মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এইভাবে মানুষের 'আমি' ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা গোটা সমাজ ও তমদ্দুনের প্রতি ধমনিতে প্রবাহিত হইতে শুরু করে। মনস্তত্ত্বের বিচারে ইহা এক নির্ভুল ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

এই স্বভাবগত ভাবধারার শক্তি এত তীব্র যে, ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া হাজার লক্ষগুণ বেশী সুযোগ সুবিধা ও আরাম-আয়েশের সামগ্রী দান করিলেও সে কিছুতেই সন্তুষ্টী হইতে পারিবে না। তাহাকে তাহার নিজ ঘর হইতে বাহির করিয়া কোন উচ্চশ্রেণীর হোটেলে সর্ববিধ আরামের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেও সে সেখানে at home (বা নিজের বাড়িতে) হওয়ার মত তৃপ্তি কখনও লাভ করিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা-সংক্রান্ত ভাবধারা মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা ইখতিয়ার লাভের প্রেরণা হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। কাজেই ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তিকে জাতীয় মালিকানার অক্টোপাসে বন্দী করিলে তাহা কোন ক্রমেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা হইতে পারে না। একজন ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ অধিকার ও স্বাধীনতা দান করা একজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র দেহ ও সত্তার স্বীকৃতির অনুরূপ উহার সীমাবদ্ধ মালিকানাকেও স্বীকার করাই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পন্থা। সমাজ বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহাই এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

ব্যক্তিগত মালিকানা হরণ করিয়া সর্বগ্রাসী জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপন করা যে মানবতার পক্ষে একান্তই মারাত্মক ব্যবস্থা, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া।

## জাতীয় মালিকানা সাম্যবাদ

বস্তুত, সমস্ত উপার্জন উপায়কে সরকারী কর্তৃত্বে সোপর্দ করিয়া গোটা মানুষকে সরকারের দিন-মজুর বা বেতনভোগী চাকরে পরিণত করিয়া দিলেই মানুষ সুবিচার ও সর্ববিদ দিক দিয়া সমান অধিকার লাভ করিবে—এইরূপ মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক ভাঙ্গনের সুযোগ লইয়া রাশিয়ায় ১৯১৭ সনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশের সকল প্রকার ধন-সম্পদ ও উৎপাদন-উপায় নিরংকুশভাবে কমিউনিস্টদের কুক্ষিগত হইল। এইজন্য সোভিয়েত সরকারকে প্রায় উনিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিতে হইয়াছে। প্রায় বিশ লক্ষ মানুষকে কঠিন, বর্বর ও অমানুষিক শাস্তি প্রদান করিতে হইয়াছে। একমাত্র কোল খোজ (kokho-Co-operative farming) পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ছোট জমিদার (kullaks)-দিগকে যেভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পৃথিবীর রুশ-সমর্থক কমিউনিস্টরাও চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই অমানুষিক জুলুম ও হত্যাকান্ডের পর যে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি কার্যকর করা হইয়াছিল তাহার ফলে সকল মানুষের জন্য সমানাধিকার স্বীকৃত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা। কিন্তু কার্যত এই সাম্য ও সমানাধিকার সেখানে নিতান্ত মায়া-মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে। সাম্যবাদের শ্লোগান এখানে সম্পূর্ণরূপে ও নির্মমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। রাশিয়ায়-James Bwruhan-এর ভাষায় জাতীয় আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শতকরা ১১-১২ জন উচ্চ শ্রেণীর শাসকগণই ভোগ করে। সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের এই নিরংকুশ ভোগ-সম্ভোগ কি চরম শোষণ ও দুর্নীতির নির্লজ্জ পরাকাষ্ঠা নয়?

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কমিউনিস্ট কমরেড Yovn রাশিয়ার শ্রেণীগত পার্থক্যের বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে পেশ করিয়াছেনঃ

গার্হস্থ্য মজুরদের বেতন পঞ্চাশ হইতে ষাট রুবল পর্যন্ত—আহার বাসস্থান ব্যতীত। সাধারণ মুজর একশত ত্রিশ হইতে দুইশত পঞ্চাশ রুবল পর্যন্ত মজুরী লাভ করে। দায়িত্বসম্পন্ন ও উচ্চস্তরের অফিসার মাসিক পনেরো শত রুবল হইতে দশ হাজার রুবল পর্যন্ত এবং ফ্যাক্টরী ডিরেক্টর, শিল্পী, লেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী বিশ হাজার হইতে ত্রিশ হাজার রুবল পর্যন্ত অর্জন করে।

১৯৩৭ সনে রাশিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য মজুরী চার্ট নিম্নোক্তরূপ তৈয়ার করা হইয়াছিলঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সধারণ শ্রমিক ঃ | ১১০ | হইতে | ৪০০ | রুবেল মাসিক |
| মধ্যম মানের কেরানী ঃ | ৩০০ | হইতে | ১০০০ | রুবেল মাসিক |
| উচ্চমানের অফিসার ঃ | ১০০০ | হইতে | ১০,০০০ | রুবেল মাসিক |
| প্রথম মানের নাগরিক ঃ | ২০,০০০ | হইতে | ৩০,০০০ | রুবেল মাসিক |

রুশ পত্রিকা TRUD কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায়, একটি খনিতে ১৫৩৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় এবং তাহাদের মজুরীর হার নিম্নোক্ত রূপ ধার্য করা হয়ঃ

এক হাজার শ্রমিকের বেতন মাসিক ১২৫ রুবল হিসাবে। চারিশত শ্রমিকের বেতন মাসিক ৫০০ রুবল হইতে ৮০০ রুবল করিয়া। ৭৫ জন শ্রমিকের বেতন প্রতিজন মাসিক ৮০০ রুবল হইতে ১০০ রুবল। ৬০ জন শ্রমিকের বেতন মাথাপ্রতি মাসিক ১০০০ হইতে ৩৫,০০০ রুবল পর্যন্ত।

রাশিয়ার শ্রমিকদের বেতনে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজিত, তাহা বেতনের উপরোক্ত হার হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এইরূপ বেতনকে কি কোন প্রকারে সাম্যবাদী আদর্শের অনুকূল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে?

বস্তুত, রাশিয়ার শতকরা ৭.৯ জন লোক মাসিক ২৪০ রুবলের কম বেতন পায়। আর অবশিষ্ট শতকরা একুশ জন লোক ইহাদের-ই শ্রমলব্ধ মুনাফা দুই হাতে শুঁষিয়া নেয় এবং বিলাসিতার পাহাড় সৃষ্টি করে।

রাশিয়ার সামরিক বাহিনীতে বেতনের এই তারতম্য আরো মারাত্মক ধরনের।১৯৪৩ সনে সাধারণ সৈনিক মাসে দশ রুবল বেতন পাইত। আর লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ লাভ করিত মাসিক এক হাজার রুবল এবং কর্নেল পাইত চব্বিশ শত রুবল।—Economist পত্রিকা ৩০শে জুলাই ১৯৪৩ সন

'নিউ ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকার প্রবন্ধকার লেভন সীডো লিখিয়াছেন,রাশিয়ার শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে বেতনের দিক দিয়া যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দুনিয়ার কোন সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশেও বর্তমান নাই। সীডো এই পার্থক্যের যে হার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলঃ

| | |
|---|---|
| সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে | ১—২০ |
| ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে | ১—৮০ |

সাধারণ মানুষে ও উচ্চ অফিসারদের মধ্যে ১—১০০ এরও অধিক পার্থক্য বিদ্যমান।

ডিকোস্টা তাঁহার 'শয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ' নামক গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন, রাশিয়ার মোট আয়ের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ শতকরা ১১কিংবা ১২ জন লোকের পকেটস্থ হয়। আর অবশিস্ট অর্থ শতকরা ৮৮ জন লোকের মধ্যে বন্টন করা হয়।

প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ডগলাস জে তাহার Socialism in the new Soviet নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেনঃ

বর্তমানে রুশ সমাজে প্রকৃত আয়ে ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর উপর নীচে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বৃটেন ও স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলি অপেক্ষা অধিক এবং সম্ভবত আমেরিকায় বিরাজমান পার্থক্যেরই সমান।

এসব যদিও অনেক দিন আগের কথা, বর্তমান অবস্থা এই যে, কারখানার ডাইরেক্টর ও ম্যানেজাররা কারখানায় লব্ধ মুনাফার অংশও লাভ করিয়া থাকে। আর ইহারা অধিক মুনাফা লুটিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক-মজুরদের দ্বারা অমানুষিক ধরনের শ্রম করায় অথচ নিতান্ত নগণ্য পরিমাণে মজুরী দেওয়া হয়।

সম্পত্তির রাষ্টীয়করণের পর রাশিয়ার শ্রমিকদিগকে সরকার চালিত লংগরখানা হইতে খাবার গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এইসব লংগরখানা হইতে খুব নিকৃষ্ট মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কসিগীন-ও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৯৪৮ এবং ৪৯ সনে সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, একজন খনি-শ্রমিক মাসে ১০ হাজার রুবল উপার্জন করে (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এ প্রাভ্দা এবং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এর ইজ্ভেস্তিয়া দ্রষ্টব্য ) সরকারী ও অন্যান্য প্রাধাণ্য সূত্র হইতে জানা যায় যে, একজন কলেজের অধ্যাপক মাসিক ৪ হইতে ৫ হাজার রুবল এবং গবেষণাগারের কর্মকর্তাগণ মাসিক ৮ হাজার রুবল বেতন লাভ করে। একাডেমী এ সয়েন্সের সদ্যরাও উক্ত সংস্থার সদস্য হিসাবে মাসিক ৫ হাজার রুবল পাইয়া থাকে। একাডেমী অব সায়েন্সের সদস্যরা উক্ত সংস্থার সদস্য হিসাবে মাসিক ৪ হাজার রুবল পাইয়া থাকে। একাডেমী অব সায়েন্সের সদস্যরা সাধারণত বিভিন্ন গবেষণাগারের কর্মকর্তা বলিয়া তাহাদের মাসিক আয় ১৩ হাজার রুবলের কাছাকাছি পৌঁছায় (হ্যারি সোয়াট্স্ লিখিত রাশিয়ান সোভিয়েট ইকনমি , ৪৬৭ পৃষ্ঠ)' ১৯৫২ সেনে 'ইকনমিক উইকলিতে' একজন সাংবাদিকের লিখিত এক প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্য হইতে জানা যায়, সোভিয়েট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাসিক ১৬ হাজার রুবল, রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা মাসিক ২০ হাজার রুবল এবং একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি মাসিক ৩০ হাজার রুবল বেতন পায়।

রাশিয়ার 'মজুরদের' বেতনের এই আকাশছোঁয়া পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া এবং Webb এর ন্যায় অন্ধ রুশ-সমর্থকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

'ব্যক্তিগণের আমদানীর ক্ষেত্রে রাশিয়ায় যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যাইতেছে, উহার চূড়ান্ত নমুন Extreme instanc আমেরিকায় না হইলেও বৃটেনে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। ফল কথা এই যে, ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার কেবল উচুঁদরের লোকদের মধ্যেই বিভক্ত হয়—পূর্বে যেমন মজুর ও বুর্জোয়া লোকদের মধ্যে বন্টন কর হইত। এই কথায় সত্যতা Soviet Economic System গ্রন্থে উল্লেখিত Income tax Schedule হইতেও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ৩৮১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৮৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্লেখিত হইয়াছেঃ

রাশিয়ার ১৯৪০ সনের ইনকাম ট্যাক্স শেডুল অনুসারে পাঁচশত রুবল হইতে শুরু করিয়া তিন লক্ষ রুবল পর্যন্ত আয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। অর্থাৎ একজন লোকের নিকট তিন লক্ষ রুবল টাকা পুঞ্জীভূত হওয়া সেখানে কোন মতেই আইন বিরোধী নয়, যেখানে সাধারণ শ্রমিক মাসিক বেতন পায় মাত্র ৪ শত রুবল।

কমিউনিস্ট চীন দেশের অবস্থাও ইহা হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কিছু নয়। সেখানকার শ্রমিকরা মর্মান্তিকভাবে দরিদ্র। ছেঁড়া-ফাটা কাপড় তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারে না। অথচ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে সেখানে শ্রমিকদিগকে দৈনিক আট ঘন্টা নয়, বারো ঘন্টা করিয়া হাড়ভাংগা পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। কিন্তু মজুরী দেওয়া হইয়াছে খুবই কম পরিমাণ।

জাতীয়করণ নীতির চরম ব্যর্থতার এই মর্মান্তিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও কি কেহ উহা সমর্থন করিতে এবং সাম্যবাদের শ্লোগান শুনিয়া অন্ধের ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অনির্দিষ্টের পানে ছুটিতে পারে?[১]

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থা যদি এই হয়, সেখানেও যদি শ্রমিক কৃষকদের মাঝে চরম অসাম্য বিরাজ করে, এমনকি শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের অপেক্ষাও অনেক বেশী অসাম্য থাকে—নাই তাহা বলিবার সাহস কাহারো আছে কি?—তাহা হইলে পুঁজিবাদের ন্যায় সমাজতন্ত্রকেও মানবতার জন্য মারাত্মক শোষণ ও অসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা মনে করা হইবে না কেন? এবং বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদের ন্যায় সমাজতন্ত্রকেও খতম করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো হইবে না কোন্ কারণে?....... এক ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়া তদপেক্ষাও অধিকতর ধ্বংসে নিরীহ মানবতাকে নিক্ষেপ করা কি কখনো মানবতাবাদী কাজ হইতে পারে?

## রাষ্ট্রীয়করণ নীতির ব্যর্থতা

মূলত রাষ্ট্রীয়করণ নীতির পশ্চাতে কোন বাস্তব যুক্তির অস্তিত্ব বর্তমান নাই। ব্যক্তিকে ব্যবহারিকভাবে মালিকানা অধিকার দান করিলে সে সকল অবস্থায় কেবল শোষণ (Exploitation)-ই করিবে, কখনই উহার সুবিচারপূর্ণ ব্যয় ও বন্টন করিবে না বলিয়া

১. Soviet communism-A New Civili-ation, 12.70 P.

পুঁজিবাদ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হইবে এবং ব্যক্তি-মালিকানা নির্মূল করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করিলেই অসাম্য ও শোষণের সব পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে,—রাষ্ট্রীয়করণ নীতির যৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য সাধারণত ইহাই বলা হয়। কিন্তু এই কথা যে কতখানি হাস্যকর ও ভিত্তিহীন, তাহা বলাই বাহুল্য। জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যক্তির হাত হইতে মালিকানা অধিকার কাড়িয়া লইয়া উহার কর্তৃত্ব কাহার হাতে সোপর্দ করা হইবে? কোনও মানুষের হাতে, না কোনও অলৌকিক শক্তির হাতে? মানুষের হাতেই উহা সোপর্দ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনগণের লক্ষ কোটি স্বতন্ত্র হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া মুষ্টিমেয় রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে ন্যাস্ত করা হইবে। এই লোক ফেরেশতাজগত হইতে নামিয়া আসিবে না; এই জনগণের মধ্য হইতেই তাহারা নির্বাচিত হইয়া কিংবা বল প্রয়োগ অথবা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়া ক্ষমতাসীন হইবে এবং সমগ্র দেশের সর্ববিধ সম্পদ-বৈভব, উপায়-উপাদান এবং শক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ ও ব্যবহার করার নিরংকুশ কর্তৃত্ব কেবল ইহাদের করায়ত্ত থাকিবে। কিন্তু তখন এই লোকগণই যে শোষণ ও জুলুম পীড়ন করিবে না; বরং উহার সদ্ব্যবহার ও সুবিচারপূর্ণ বন্টন করিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। গতকল্য যে সব ব্যক্তির হাতে স্বল্প পরিমাণ অর্থ সম্পদ ও উপায়-উপাদান ছিল বলিয়া শোষণ করিত, সেই সব লোক আজ ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইয়াও একদিকে রাষ্ট্র পরিচালনার সীমাহীন সুযোগ ও কর্তৃত্ব লাভ করিয়া এবং অন্যদিকেও সেই সাথে অর্থ সম্পদের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব লাভ করিয়া শোষণ পরিহার ও জাতীয় সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টন করিতে শুরু করিবে—তাহার প্রমাণ কি আছে? ব্যক্তিমালিকানাই হউক, কি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা, উভয় ক্ষেত্রেই অবাধ শোষণের পথ উন্মুক্ত থাকে। অন্য কথায়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ই শোষণমূলক অর্থ ব্যবস্থা। ইহার কোনটিই সাধারণ ও দুর্বল মানুষকে শোষণ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। যদি বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালকগণ খুবই সৎ প্রকৃতির এবং ন্যায়পরায়ণ লোক হইবে বলিয়া তাহারা কোনরূপ শোষণ করিবে না, অতএব জাতীয় বা রাষ্ট্রীয়করণে কোন আশংকারই কারণ নাই; তাহা হইলে আমি বলিতে চাইঃ প্রথমত সৎ লোকদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া সমাজতান্ত্রিক নীতিতে জরুরী নয়; দ্বিতীয়, নৈতিকতার কোন বালাই থাকে না বলিয়া সেখানে সদস্যদের মধ্যে কোন তারতম্য বিচারও থাকিতে পারে না। আর তাহা যদি হয়ও তবুও তখন কোনরূপ শোষণ হইবে না বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা এ কথা কেন বিশ্বাস করিতে পারে না যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের জনগণকে অনিবার্যভাবে সৎ, দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন এবং আল্লাহভীরু ও আল্লাহ প্রদত্ত আইনের অনুসারীরূপে গড়িয়া তোলা হইবে, ফলে তাহাদের নিকট ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ন্যাস্ত হইলে সেখানে কোনরূপ শোষণ ও জুলুমের আশংকা কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। তাই সমাজতন্ত্র অপেক্ষা ইসলামী সমাজের সীমিত ব্যক্তিমালিকানা অধিক নির্ভরযোগ্য, ন্যয়পরায়ণ ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থাপক বলিয়া মানিয়া লওয়াই কি অধিক যুক্তিসঙ্গত নয়?

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীয়করণ করার পূর্ব ও পরের অবস্থার মধ্যে বস্তুতই কোন মৌলিক পার্থক্য সুচিত হয় না; বরং উন্নতির পরিবর্তে তখন অবস্থার অবনিতই ঘটে বেশী। রাষ্ট্রীয়করণের পূর্বে একটি দেশে যদি দুই শত তিন শত পুঁজিদার থাকে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার আশ্রয়ে থাকিয়া যাহারা নিরীহ জনগণকে অবাধে শোষণ-পীড়ন করিতে থাকে, তবে রাষ্ট্রীয়করণের পর স্বয়ং রাষ্ট্রই সমগ্র পুঁজিদারকে খতম করিয়া 'অন্যন্য' ও 'সর্বপ্রধান পুঁজিদার হইয়া বসে। এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজিদারের নিকট পুলিশ, সি,আই,ডি. প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের সামরিক শক্তি ও জাতীয় উপায়-উৎপাদনও একমাত্র তাহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ফলে এই রাষ্ট্রের হাতে এত অসংখ্য পুঁজিবাদী শক্তি ও উপায়-উপাদানের সামাবেশ ঘটে, যাহার তুলনা ভূপৃষ্ঠের অপর কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সময় এহেন 'সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র' জনগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার-নিস্পেষণ ও শোষণ-পীড়ন করিবে না—চূড়ান্ত রকমের নির্বুদ্ধিতা না থাকিলে তাহা বিশ্বাস করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। বরং পৃথিবীর ইতিহাস অনুরূপ শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্র-সম্রাটদেরই সংঘটিত জুলুম-শোষণের নির্মম কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও এবং কোন কালেই এইরূপ শাসন বা শোষণক্ষমতা মানুষকে বিন্দুমাত্র শান্তি দিতে সমর্থ হয় নাই।

বস্তুত রাষ্ট্রশক্তি ও জাতীয় ধন-সম্পদ—এই দুইটিই এক একটি জাতির শক্তি-উৎস। রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং সরকার ও জনগণ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তি ও ধন-সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। কোন দেশে এই উভয় শক্তি সরকারের কুক্ষিগত হইলে সেখানকার জনগণ যে নিস্পেষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বর্তমান পৃথিবীর কমিউনিস্ট দেশগুলির জনগণের অবস্থাই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সম্পদ-সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ নীতির ধ্বংসকারিতা কেবল রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণেই প্রকটিত হয় না, নিতান্ত অর্থনীতির দৃষ্টিতেও ইহা একান্তই অযৌক্তিক, গ্রহণ-অযোগ্য এবং সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। বৃটেনের শ্রমিক সরকারের জাতীয়করণ নীতিই এতদঞ্চলের একশ্রেণীর লোককে জাতীয়করণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ভুলিয়া যান যে, বহু বৎসরের বেসরকারী শৈল্পিক প্রচেষ্টার পরই বৃটিশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান ও পুঁজিবাদী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সেখানে জাতীয়করণ নীতির পরীক্ষা করা হইয়াছে বেসরকারী শৈল্পিক প্রচেষ্টার দানে সমুন্নত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু যে দেশের অবস্থা অনুরূপ নহে, সেখানে এইরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য একেবারেই অনিশ্চিত। বৃটেনের পূর্বতন শ্রমিক সরকার তাহাদের পাঁচ বৎসরের রাজত্বে যে সমগ্র অর্থনীতির ২০ ভাগ জাতীয়করণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাও জনগণের বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই; বরং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র। তদুপরি শ্রমিক সরকার যে সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছিল, তাহা পূর্বে বেসরকারী পরিচালনায় যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিল। জাতীয়করণ নীতির ব্যর্থতা

শ্রমিক সরকার স্বীকার না করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। এক ঘোষণায় প্রকাশ, বৃটিশ সরকার আর জাতীয়করণের চেষ্টা করিবে না। ইহা প্রকারান্তরে জাতীয়করণের ব্যর্থতারই অকপট স্বীকৃতি মাত্র।[১]

বস্তুত, নীতি হিসাবে জাতীয়করণ যতই জনপ্রিয় হউক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে উহার সার্থকতার সম্ভাবনা মোটেই নাই। বৃটেনের শ্রমিক সরকার এই নীতি অনুসারে কয়লার খনি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, বেসরকারী পরিচালনায় যখন উত্তোলিত কয়লার হিসাবে প্রতি টনে ২ শিলিং করিয়া মুনাফা হইত, সরকারী আমলে তাহাতে হইতে লাগিল গড়ে ১ শিলিং করিয়া লোকসান। উপরন্তু সরকারী আমলে আগের তুলনায় গড়ে বৎসরে ২ কোটি টন কয়লা কম উত্তোলিত হইতে লাগিল।

কানাডায় বেসরকারী পরিচালনাধীনে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানী এবং সরকারী পরিচালনাধীনে কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ে—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ১৯৩৬ সনে যখন সরকারী প্রতিষ্ঠানটির ৯০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়, সেই বৎসরই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিতে মুনাফা হয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার।

জাতীয়করণ নীতির সর্ব শ্রেষ্ঠ হোতা হইতেছে সোভিয়েত রাশিয়া। সেই সোভিয়েত রাশিয়াতেও এই নীতির চরম ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রচারিত The New Ecomomic Upsowing of the U. S.S.R নামক রিপোর্টে (১৯৫০) দেখানো হইয়াছেঃ রাষ্ট্রীয়করণের ফলে চাষাবাদের কাজে শ্রমিকরা ফাঁকি দেয়, চুরিও করে। এই কারণে রাষ্ট্রকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি বহন করিতে হয়। রিপোর্ট বলা হয়ঃ ১,৮২,০০০ জন লোক কাজ না করিয়াই বেতন গ্রহণ করে। ১,৪০,০০০ টি পশু ও প্রায় ১,৫০,০০,০০০ রুবল মূল্যের দ্রব্য বেআইনীভাবে কুলখজ হইতে অপহৃত হয়।

শুধু তাহাই নয়, ঐ রিপোর্টের ১৭৭ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় সমষ্টিগত দায়িত্বে উৎপাদন হ্রাস পায় বলিয়া ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর এবং 'খন্ড কার্য প্রণালীর' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।[২] দীর্ঘ ও একটানা পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও রাশিয়া এখন পর্যন্ত ক্রমাগত ব্যর্থতারই মুখ দেখিয়া আসিয়াছে। সেখানকার সরকার করায়ত্ত কৃষ-ব্যবস্থা সর্বাধিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। কৃষি ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ ও সমধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও সেখানকার ফসল উৎপাদন অত্যন্ত নিম্নস্তরের ও নিম্নমানের রহিয়াছে। ১৯৬৩সনে প্রায় শতকরা ৭০টি কৃষি ফার্মের বিরাট রকমের খেসারত দিতে হইয়াছে। ১৯৬৫ সনের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, সরকারী কৃষি ফার্মে সামগ্রিকভাবে শতকরা ৪০ কোটি পাউন্ড ক্ষতি হইয়াছে। —(সাপ্তাহিক আইন, ২৩ শে মে, ১৯৭৬ সন)

১. বাংলাদেশেও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতি যে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে এবং এখানকার জাতীয় অর্থনীতিতে নৈতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক বিপর্যয় ও সংকট টানিয়া আনিয়াছে, তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না।

২. একুশ দফার রূপায়ণ—অধ্যাপক আবুল কাসেম।

সমাজতান্ত্রিক চীনের কৃষি জাতীয়করণেরও এই নির্মম পরিণতিই দেখা গিয়াছে। তথায় ১৯৫৫ সনে সর্বপ্রথম জমিক্ষেতকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কৃষকদের নিকট হইতে নানা প্রকারের কৌশল ও ধোঁকাবাজির সাহায্যে সমস্ত জমি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু ইহার পর কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ তীব্রভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তখনকার চীনা পত্র-পত্রিকায়ও ব্যাপক খাদ্যাভাব ও কঠিন রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। শহর অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা ক্রমশ কঠোর মূর্তি পরিগ্রহ করে। গ্রামাঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকারকে যেসব সমস্যা অসুবিধার সম্মুখিন হইতে হয়, তাহারও রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল যে জমি জাতীয়করণের ফলে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাধীন উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় অনেকখানি হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, কৃষকদের জমি, ক্ষেত সরকার কর্তৃক কাড়িয়া লওয়ার ফলে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা রাজনৈতিক উপায়ে প্রকাশ পাইবার পথ না থাকার দরুন তাহাদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছি। ফলে তাহারা চাষের জন্তু ধ্বংস করিয়া এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। এই কারণে সেখানে কৃষির জন্তু বহুলাংশে কমিয়া যায়। চীনের পত্রিকা JEN-MIN JEN-POO-তে ১৯৫৭ সনের ২০ শে এপ্রিল সংখ্যায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছেল।

বাংলাদেশেও জাতীরকরণ নীতির চরম ও মারাত্মক ব্যর্থতার সহিত আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়াছে। যাবতীয় বৃহৎ শিল্পকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে জাতীয়করণ নীতি অর্থনীতির দিক দিয়াই শুধু দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করে নাই, বরং জাতীয় নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

এইসব বাস্তব ও প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তিসমূহ সম্মুখে রাখিয়া জাতীয়করণের ফলে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইবার কোন আশা কি কেহই করিতে পারে?

## ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ

পূর্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনীয়। ব্যক্তিগত ভোগাধিকার ভিত্তিক মালিকান মানুষের স্বভাব ও মনস্তত্ত্বের সহিত পুরা-পুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যক্তির এই অধিকার হরণ করা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেখানেই ইহা কার্যকর করা হইয়াছে, সেখানেই মানুষের প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—সে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দরুন যত বিলম্বেই ঘটুক না কেন। এই কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তির এই অধিকার গোটা অর্থব্যবস্থার অন্যতম বুনিয়াদ। ইহাকে অস্বীকার করা হইলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার গোটা প্রাসাদই ধূলিস্সাৎ হইতে বাধ্য। যাকাত, হজ্জ, মীরাস, আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয়, সাদকা, পারস্পরিক করয দিয়া সাহায্য করা, ক্রয়-বিক্রয়ে সমতা রক্ষা এবং এই পর্যায়ের কুরআন-হাদীসের যাবতীয় ঘোষণাবলী অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকান অধিকারের সহিত নিবিড়ভাবে

সম্পৃক্ত। ইহাকে অস্বীকার করার অর্থ জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এবং ইসলাম নির্ধারিত জীবন-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। পক্ষান্তরে, ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে ব্যক্তিগত ভোগাধিকার ভিত্তিক মালিকানা অধিকারকেও অনিবার্যভাবে মানিয়া লইতে হইবে। কেননা একদিকে উহা মানিয়া লওয়া এবং অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে অস্বীকার করা মৌলিকভাবেই পরস্পর বিরোধী । শুধু তাহাই নয়, এই ব্যক্তিগত মালিকানা কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং এক অনস্বীকার্য সত্যও বটে।

বস্তুত, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন, মানুষ যে পূর্বোক্ত অর্থে উহার মালিক হইতে পারে, নিম্নলিখিত আয়াত হইতে তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ- (يسن ٧٢-٧١)

তাহারা কি ভাবিয়া দেখে নাই যে, আমিই আমার নিজস্ব ক্ষমতায় তাহাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার (প্রভৃতি নিয়ামত ও যাবতীয় ধন-সম্পদ) সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহারা-ই সেই সবের মালিক হইয়াছে। এবং এইগুলিকে তাহাদের জন্য অনুগত, অনুকূল ও অধীন বানাইয়া দিয়াছি। ইহার দরুন-ই তাহারা উহা হইতে যানবাহন ও খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছে।

অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিলোক ও উহার যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, জন্তু জানোয়ার—সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্র সৃষ্টি। মানুষ এই সবের উপর আল্লাহ্র নিয়োজিত খলীফা। তাহারা এইসব সৃষ্টি জিনিস আল্লাহ্র দেওয়া আইন-বিধান মুতাবিক উপার্জন করিবে, ভোগ ও ব্যবহার করিবে, খাইবে, পান করিবে, যানবাহন রূপে কাজে লাগাইবে ও ইহা হইতে সত্যকার কল্যাণ লাভ করিবে। আল্লাহ্র সৃষ্ট জিনিসকে এইরূপ উপার্জন ও ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার দেওয়া অধিকার এবং এই হিসাবেই মানুষ এইসবের মালিক। সে মালিক সামষ্টিকভাবে এবং ব্যক্তি সমাজেরই একজন হিসাবে ব্যক্তিগতভাবেও।

কুরআনের সর্বজনমান্য তাফসীরকারগণও উপরোক্ত আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়াছেন। ইমাম খাজেন এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেনঃ

اَىْ خَلَقْنٰهَا لِاَجْلِهِمْ فَمَلَّكْنَاهُمْ اِيَّاهَا فَيَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهَا

تَصَرُّفَ اَلْمَلَّاكِ- (تفسير الخازن ٦ ص ١٦)

আল্লাহ্ বলেন, আমরা এই সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে এই সবকিছুর মালিক বানাইয়া দিয়াছি। অতএব তাহারা মালিকানা অধিকারের ভিত্তিতে এইসবে ভোগ ও ব্যবহার করিতে থাকিবে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

اِشَارَةٌ اِلَى اِتْمَامِ الْاَنْعَامِ فِىْ خَلْقٍ فَاِنَّهُ تَعَالَى لَوْ خَلَقَهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْاِنْسَانُ مَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهَا- (تفسير الرازي جص ٣)

জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিয়ামত দানের কাজ পূর্ণ করার কথাই এই আয়াতে বলা হইয়োছে। কেননা আল্লাহ্ যদি এইসব সৃষ্টি করিতেন আর মানুষ যদি এই সবের ব্যবহারাধিকার হিসাবে মালিক না হইত তাহা হইলে মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধারা হইতে কিছুমাত্র উপকৃত হইতে পারিত না।

অন্য কথায়, আল্লাহ্ হইলেন এইসবের একমাত্র নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা, আর মানুষ আল্লাহ্ দেওয়া আমানতী মালিকানা অধিকারের ভিত্তিতে এই সবের ভোগ-ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিবে। ইহাই হইল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-নিরংকুশতার মুকাবিলায় মানুষের মালিকানা তত্ত্বের সঠিক তাৎপর্য।

## ব্যবহারাধিকার হিসাবে মালিকানা লাভের উপায়

প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত যখনই মানুষের পরিশ্রমের যোগ হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে তখনই হয় ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারের সূচনা। স্বভাব জাত কোন উপাদানকে যদি কেহ নিজের পরিশ্রমের সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলে —কেহ যদি কোন কাঁচা মালকে নিজের শ্রমের বদৌলতে শিল্পপণ্যে পরিণত করে, তবে সে উহার মালিক হইবে। সে উহাকে নিজের দখলে ও অধিকারে রাখিয় তাহা ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারিবে, উহাকে দান করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবে, উহার সাহায্যে আরও অধিক অর্থ উপার্জন ও উৎপাদন করিতে পারিবে। ইসলামের নির্দিষ্ট সীমা ও আইনের মধ্যে থাকিয়া এই অধিকারসমূহ সে ভোগ করিতে পারিবে। বস্তুত, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ ও সম্পত্তির উপর মানুষের খিলাফত অধিকারের আওতার মধ্যে ইহাই মালিকানা অধিকার। ইহার অধিক অন্য কোন প্রকারের মানবীয় মালিকানা ইসলামে স্বীকৃত নয়। মালিকানার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার ভাষ্য হইলঃ

Common property and common enjoyment of it, common property and private enjoyment, private property and private enjoyment. 'সমষ্টিগত মালিকানা এবং ইহার সমষ্টিগত ভোগ ও ব্যবহার; সমষ্টিগত মালিকানা ও ব্যাক্তিগত ভোগ-ব্যবহার; আর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত ভোগাধিকার'। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানার এই সবকয়টি পন্থাই ত্রুটিপূর্ণ ও মারাত্মক । ইহার শেষেরটি বর্তমানের পুঁজিবাদ, দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রথমটির কোন বাস্তব রূপ কোথাও আছে কিনা জানা নাই। তবে ইসলামের নীতির সহিত ইহার কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পদের ক্ষেত্রে সকলেই উহার খলীফা। তবে ভোগ-ব্যবহারের ব্যক্তিগত অধিকার সকলের জন্যই স্বীকৃত।

ব্যক্তির নিকট রক্ষিত সম্পদে যেমন সকলেরই অধিকার, তেমনি সমষ্টির নিকট রক্ষিত সম্পদে সম্পদেও ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত। তবে তাহা ব্যক্তি ও সমষ্টির অনুমতিক্রমেই লাভ করা সম্ভব। ইসলামের এই মালিকানা-দর্শনের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের এই আদর্শের দরুন-ই স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই উপার্জনের ও উপার্জিত সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যদিও উহা সমষ্টির নিকট হইতে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ীই পাইতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ- (النساء ٣٢)

পুরুষগণ যাহা উপার্জন করে তাহা তাহাদের মালিকানা এবং স্ত্রী-লোকেরা যাহা উপার্জন করে তাহার মালিক তাহারাই।

নদীর পানি প্রাকৃতিক অবদান, ইহা সকল মানুষের জন্য সমান অধিকারের বস্তু; কিন্তু সেই পানি যদি কেহ মশকে ভরিয়া বাজারে বা ঘরে ঘরে বিক্রয়ার্থে লইয়া যায়, তবে সে উহার মালিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই পানি বিক্রয় করার—ইহার বিনিময়ে মূল্যে আদায় করার—তাহার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। কারণ, সে উহাতে নিজের শ্রমের যোগ করিয়া উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, মানুষের পরিশ্রমের সংযোগেই হইয়াছে উহার ব্যবহারিক মূল্য Use Value। ঠিক এইজন্যই পড়ো ও অনাবাদী জমিকে যে ব্যক্তি নিজ শ্রমের দ্বারা উর্বর, আবাদ ও শস্যোৎপাদনের উপযোগী করিয়া তুলিবে, ইতিপূর্বে সে জমির কেহ মালিক না থাকিলে সেই ব্যক্তিই ইহার মালিক হইবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

পড়ো জমি—যাহার কেহ মালিক নাই, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই উহার মালিক। অতঃপর তাহা সকল মানুষেরই সমানাধিকারের বস্তু। কিন্তু উহার ভোগ ও ব্যবহারাধিকার সেই ব্যক্তিই লাভ করিতে পারিবে যে উহা আবাদ করিবে—চাষোপযোগী ও শস্যোৎপাদক করিয়া তুলিবে।

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ سَبَقَ اِلٰى سَاءٍ لَمْ يَسْبَقْهُ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَلَهُ (ابوداؤد)

যদি কেহ এমন কোন 'পানি'র নিকট পৌছায় যেখানে ইতিপূর্বে আর কেহই পৌঁছায় নাই, তবে উক্ত 'পানি'র উপর তাহারই মালিকানা স্থাপিত হইবে।

এখানে 'পানি' অর্থ কূপ ও জলাশয় সমন্বিত জমি-ক্ষেত। কারণ শুধু পানির উপর কাহারোই ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হইতে পারে না।

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানা লাভ করার জন্য শ্রমই একমাত্র উপায় নয়। 'মানুষ পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিবে একমাত্র উহার উপর তাহার মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইবে, এতদ্ব্যতীত মালিকানা লাভ করার আর

কোনই উপায় নাই' ইসলামী অর্থনীতিতে এই কথাটি মোটেই সত্য নয়। Labour can make value—'একমাত্র শ্রমই মূল্য উৎপাদন করিতে পারে'—কথাটি কার্ল মার্কসের। আর এই কথাটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব, তাহা বহু পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ এই কথাটি সত্য হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন একমাত্র নিজের শ্রমের দ্বারাই পূর্ণ করিতে হয়: কিন্তু মানব সমাজের ঐতিহাসিক যুগে ইহা কোনদিনই সম্ভবপর ছিল না, আর কোনদিন তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে না। মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় এই জন্য যে, তাহার কোন প্রয়োজনই সে একাকী পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কার্ল মার্কসের এই উক্তির অবৈজ্ঞানিকতা সুস্পষ্ট। আর ইসলাম এই মত কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কারণ, তাহাকে ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময়, দান-উপহার-উপঢৌকন, ভাড়া দেওয়া ও নেওয়া, মূলধন ও মুনাফায় অংশীদারিত্বে ব্যবসায়, মীরাস বন্টন ও অসীয়ত প্রভৃতি মানব সমাজের হাজার হাজার কাজ একেবারে হারাম হইয়া পড়ে, অথচ ইসলাম এই সকল কাজকে সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কাজেই 'শ্রম' ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানা লাভের একমাত্র সূত্র নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের সঙ্গত উপায় মোটমুটিভাবে সাতটিঃ

১. **প্রথম দখলঃ** প্রাকৃতির উপায়-উপাদানের মধ্যে যে যে দ্রব্য ও উপাদানের উপর এখনো কাহারো মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি দখল করিয়া লইবে উহার উপর তাহারই মালিকানা স্বীকৃত হইবে। অবশ্য এই মালিকানা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইতে হইবে। বস্তুত মালিকবিহীন জমি বন্টনের অধিকার সরকারেরই রহিয়াছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বলিয়াছেনঃ

وَلِلْاِمَامِ اَنْ يُّقْطِعَ كُلَّ مَوَاتٍ وَكُلَّ مَا كَانَ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ مِلْكٌ وَلَيْسَ فِىْ يَدِاَحَدٍ-

পড়ো জমি কিংবা যাহা কাহারো মালিকানাধীন নয়, যাহার উপর কাহারোই দখল নাই সেই জমি লোকদের মধ্যে বন্টন করার একমাত্র অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের( অর্থাৎ সরকারের)

২. **আবিষ্কার-উদ্ভাবনঃ** মানসিক শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে কোন জিনিস অবিষ্কার করা, কোন যন্ত্র প্রস্তুত করা—তাহা কোন আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া হইলেও—ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের দ্বিতীয় উপায়। এই উপায়ে উদ্ভাবিত সকল জিনিসই উহার মালিক। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে সে উহা বিক্রয় করিতে ও হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩. **ইসলামী রাষ্ট্র সরকারের অনুসৃত বন্টননীতি অনুযায়ী অংশ লাভঃ** সরকার কর্তৃক কাহাকেও কোন সম্পত্তি দান। ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানা লাভের ইহাও একটি উপায়। ইহা শুধু একটি উপায়ই নয়। ইহা অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তবে শর্ত এই যে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে তাহা দেওয়া হইবে তাহা তাহাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

৪. **শ্রমঃ** ব্যক্তির পরিশ্রমও মালিকানা লাভের একটি উপায়। অতএব মানুষ পরিশ্রম করিয়া এমন সব কাচামাল দ্বারা কোন জিনিস প্রস্তুত করিলে—যাহার উপর ইতিপূর্বে কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হয় নাই—মেহনতী ব্যক্তি উহার মালিক হইবে। এই কারণে শ্রম ও (Labour) মানুষের ক্রয় ও বিক্রয় যোগ্য একটি সম্পদ। তাই পরিশ্রমলব্ধ অর্থ বা সম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হইবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

أَطْيَبُ الْكَسَبِ عَـمَلُ الرَّجُلِ بِيَـدِهِ- (احمد،حاكم)

ব্যক্তির নিজের কাজের ফলে যাহা উপার্জিত হয় তাহা তাহার অতীব উত্তম ও পবিত্রতম উপার্জন।

অপর হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

مَنْ اَحْـيَـاىَ اَرْضًـا مَـيْـتَـةً فَـهِيَ لَهُ- (ترمذى)

কোন অনাবাদী জমি যে আবাদ করিবে, উহার উপর তাহারই মালিকানা স্থাপিত হইবে'—সে-ই হইবে উহার মালিক।[১]

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

مَنْ عَـمَّـرَ اَرْضًـا لَيْـسَتْ لِاَحَـدٍ فَـهُـوَ اَحَقُّ لَهَـا- (بخارى، احمد)

যে লোক কোন জমি আবাদ করিবে, তাহা কাহারও মালিকানা নয়, তাহা পাইবার বেশী অধিকার তাহার।

৫. **উত্তরাধিকার নীতিঃ** উত্তরাধিকার সূত্রে এক এক ব্যক্তি যে সম্পদ ও সম্পত্তি লাভ করে, তাহার উপর সেই ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হইবে। শ্রম-মেহনতই যে মালিকানা লাভের একমাত্র উপায় নয়—ইসলামের এই উত্তরাধিকার নীতিই উহার অকাট্য প্রমাণ।

৬. **ক্রয় বা বিনিময়ঃ** উপযুক্ত মূল্য দিয়া কোন কিছু ক্রয় করা এবং দুইটি পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় করাও—এক কথায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করাও মালিকানা লাভের সঙ্গত উপায়। ইসলামী ফিকাহ্ ইহার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

اَلْبَيْعُ اِسْمُ لِتَمْلِيْك عَيْنِ الْمَالِ بِعَوْضٍ فِيْ حَلَة آلْحَيَاة-

---

১. সাধারণ ফিকহ্‌বিদদের মতে পড়ো ও মালিকবিহীন জমি যে লোকই দখল করিয়া আবাদ করিবে, রাষ্ট্র-সরকার অনুমতি দান করুক আন না-ই করুক, সে উহার মালিক হইবে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফার মতে সরকারের অনুমতি অবশ্যই পাইতে হইবে। অন্যথায় কাহারো মালিকানা স্বীকৃত হইবে না। তিনি ইহার দলীলরূপে এই হাদীসটির উল্লেখ করিয়াছেনঃ

مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ اذَا اَجَازَهُ الْاَمَامُ- (كتاب الخراج ص ٩٤)

যে লোক কোন পড়ো জমি আবাদ করিবে সে উহার মালিক হইবে—যদি রাষ্ট্র উহার অনুমতি দেয়।

কোন বস্তুকে জীবিতাবস্থায় কোন কিছুর বিনিময়ে অপরের মালিকানায় হস্তান্তরিত করাকেই ক্রয়-বিক্রয় বলে।

৭. **উপহার-উপঢৌকনঃ** ইসলামী সমাজে পরস্পরের মধ্যে অর্থ ও উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান এবং ভালবাসার উপহারও মালিকানা লাভের অন্যতম উপায়। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

تَـهَـادُوْا تَـحَـابُّـوْا- (بخاری،نسائ،ترمذی)

তোমরা পরস্পর উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদান কর। ইহার ফলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে।

ফিকাহর পরিভাষায় এই ধরনের দান ও উপঢৌকনকে বলা হয় 'হেবা'। যাহার জন্য 'হেবা' করা হইবে সে উহার মালিক হইবে।

অসীয়ত সূত্রে পাওয়া সম্পদ ও সম্পত্তিতেও ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত এবং মালিকানা লাভের ইহাও একটি উপায়। কেননা 'অসীয়ত' বলা হয় অন্য লোককে কোন কিছুর মালিক বানাইয়া দেওয়াকে। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী মালিক তাহার মোট সম্পদ ও সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পর্কে অসীয়ত করিতে পারে। কাজেই যাহার জন্য অসীয়ত করা হইবে সে উহার মালিক হইবে। ফিকাহ্র কিতাবে অসীয়তের সংজ্ঞা বলা হইয়াছেঃ

اَلْوَصِـيَّـةُ اِسْمٌ لِتَـمْلِيْكِ الْمَـالِ بَعْـدَ لْمَـوْتِ بِطَرِيْقِ التَّـبَـرُّعِ فِى الرَّعَـيْنِ وَالْمَنَافِعِ جَمِيْعًا- (تحفة طلفقها ج ٣ ص٢٨٤)

মালিকের মৃত্যুর পর তাহার নিজের কোন সম্পদ বা সম্পত্তিকে অপর কাহাকেও দিয়া দেওয়ার কথা মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া যাওয়া ও সেই হিসাবে তাহাকে মালিক বানাইয়া দেওয়াই অসীয়ত। ইহার ফলে মূল সম্পদ ও সম্পত্তি এবং উহার মুনাফা সবকিছুর-ই মালিক হইবে সে, যাহাকে উহার মালিক বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অতএব এইসব উপায়ে এক ব্যক্তি যে যে জিনিস লাভ করিবে, তাহা সবই তাহার সঙ্গত মালিকানাভুক্ত হইবে।

حُكْمُ الْهِـبَـةِ ثُبُـوْتُ الْـمِلْكِ لِلْمَـوْهُـوْبِ لَهُ- (تفحة الفقها ج ٣ ص ٢٦١)

হেবা যাহার জন্য করা হইবে হেবার জিনিসের উপর তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

## ব্যক্তি-মালিকানার নিরাপত্তা

ইসলামী বিধান অনুসারে অর্জিত উল্লিখিত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করা বা উহা হরণ করার অধিকার রাষ্ট্র, সরকার ও আইন-পরিষদ—কাহারো নাই। মানুষের রক্ত,

মান ও সম্মান—ইহা সবই সংরক্ষিত ও সম্মানার্হ। নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের দিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষাণা করিয়াছেনঃ

فَاِنَّ دِمَا ئَكُمْ وَاَمْوَا لَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا-

তোমাদের রক্ত তোমাদের ধন-মাল এবং তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তোমাদের পরস্পরের প্রতি আজিকার দিনের মতই সম্মানার্হ ও হারাম।

অপর এক হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ- (مسلم)

প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত, ধন-সম্পত্তি হরণ ও মান-সম্মানের হানি করা সম্পূর্ণ হারাম।

এই হাদীসের নির্দেশ অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) ‘কিতাবুল খারাজ’ গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

وَلَيْسَ لِلْاِمَامِ اَنْ يُّخْرِجَ شَيْئاً مِنْ يَدِ اَحَدٍ اِلاَّبِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ-
(ص ٦٥-٦٦)

কোন প্রমাণিত সর্বপরিচিত ও আইনসম্মত কারণ ছাড়া কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র প্রধানের নাই।

কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য অপরিহার্য ‘প্রমাণিত ও আইনসম্মত কারণ’ কি হইতে পারে? এ সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতি ঘোষণা করিয়াছে যে, মানুষের শ্রমার্জিত সম্পদ বা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ঠিক ততদিন পর্যন্ত স্থাপিত থাকিবে, যতদিন সে উহাকে কাজে ব্যবহার করিবে, আবাদ করিবে, চাষবাস করিয়া উহা হইতে ফসল উৎপাদন করিতে থাকিবে। কিংবা কারখানা স্থাপন করিয়া উহাকে পূর্ণ মাত্রায় চালু রাখিবে ও উহা হইতে পণ্যোৎপাদন করিবে। উপার্জিত অর্থ সদ্ভাবে ব্যয় করিবে এবং উহার উপর সরকারের প্রাপ্যসমূহ ‘আল্লাহ নির্ধারিত অধিকার’ মনে করিয়া যথারীতি আদায় করিতে থাকিবে। কিন্তু যদি কেহ তাহার মালিকানা-সম্পত্তি অকেজো করিয়া ফেলিয়া রাখে, জমি চাষবাস না করে এবং তাহা হইতে শস্যোৎপাদন না করে, দোকান কিংবা কারখানা স্থাপন করিয়া উহাকে বন্ধ করিয়া রাখে অথবা কারখানা ও জমি হইতে যথারীতি উৎপাদন চালু রাখিয়া মুনাফা অর্জন করে কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ধারিত অধিকার আদায় করিতে অস্বীকার করে, তাবে তাহার মালিকানা অধিকার বিলুপ্ত হইবে। কারণ প্রকৃতিজাত কিংবা সাধারণ জনকল্যাণে নিয়োগযোগ্য এই সব সম্পদকে অকেজো করিয়া রাখার কাহারো কোন অধিকার নাই। কিন্তু তবুও যদি কেহ তাহা করে তবে উপযুক্ত কারণ বর্তমান থাকিলে খুব বেশী হইলেও তিন বৎসর পর [illegible]

রাখিলে তাহার নিকট হইতে উহা অবশ্যই কাড়িয়া লইতে হইবে। নবী করীম (স) অনাবাদী জমি আবাদ করার অধিকারে মালিকানা লাভের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলেনঃ

وَلَيْسَ لِمُحْتَرِجٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلٰثَ سِنِيْنَ- (كتاب الخراج ص٦٥)

যে লোক কোন জমি অকেজো করিয়া রাখিবে তিন বৎসর পর এই জমির উপর তাহার কোনই অধিকার থাকিতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্র তাহার নিকট হইতে এই জমি—অতএব উহাতে স্থাপিত যে কোন উপাদান-উপায়—কাড়িয়া লইবে। এই জন্য যে, সরকার প্রদত্ত কিংবা অন্য কোন উপায়ে লব্ধ কোন এটি উৎপাদন উপায়কে এইরূপ অকেজো করিয়া রাখার ফলে মূলতঃ সমগ্র জাতিরই মারাত্মক ক্ষতি হইয়া থাকে।

হযরত উমর (রা) এইরূপ একটি মুকদ্দমার রায় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেনঃ

مَنْ عَطَّلَ اَرْضًا ثَلٰثَ سِنِيْنَ لَمْ يُعَمِّرْهَا فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَّرَهَا فَهِىَ لَهُ-

(كتاب الخراج محيى بن ادم ص ٩١،عينى ، شراح البخارى)

কেহ যদি তিন বৎসরকাল পর্যন্ত জমি বেকার ফেলিয়া রাখে, অতঃপর সরকারের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা চাষাবাদ করে, তবে এই জমির উপর এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মালিকানা স্থাপিত হইবে।

ইহার কারণ এই যে, কোন জমি কেবল দখল করিয়া রাখিলেই উহার মালিকানা স্থায়ী হয় না। বরং কার্যত উহা আবাদ করা এই মালিকানার জন্য অবশ্য জরুরী শর্ত। বিশেষতঃ কাহাকেও এই জমির মালিক হইতে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হইল এই যে, সে উহা চাষাবাদ করিয়া ও উহাতে ফসল ফলাইয়া নিজে উপকৃত হইবে ও গোটা সমাজের কল্যাণের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু ইহা যদি সে না করে তবে সে আল্লাহর নিয়ামতের অপমান করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামত হইতে নিজেকে ও জাতিকে বঞ্চিত করিতেছে। এইরূপ যাহারা করে এবং ইহার ফলে যাহারা ধন-সম্পদের অপচয় করে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা নির্বোধ, তাহারা একদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এই উৎপাদন উপায়ের গুরুত্ব বুঝে না এবং অন্যদিকে ইহাকে অকেজো রাখিয়া নিজের, জাতির, ইসলামী রাষ্ট্রের তথা বিশ্ব-মানবের যে কত মারাত্মক ক্ষতি করে, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মনীতি যাহা হওয়া উচিত তাহা নিম্নলিখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ

وَلَاتُؤْتُواالسُّفَهَاءَ اَمْوَا لَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوْهُمْ وَاكْسُوْهُمْ فِيْهَاوَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا- (النسء- ٥٠)

নির্বোধ ও অবুঝ লোকদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পত্তি কখনো ছাড়িয়া দিও না। কারণ এই ধন-সম্পত্তি মানুষের [illegible] উপায় [illegible]

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই এইরূপ মালিকদের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লও। অবশ্য তাহাদিগকে জীবিকার খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে প্রকৃত সত্য নীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

উৎপাদন-উপায়কে যাহারা অকেজো করিয়া রাখিবে ইসলামী রাষ্ট্র তাহা ক্রোক করিয়া লইয়া এমন ব্যক্তিদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দিবে যাহারা উহাকে আবাদ করিবে এবং উহাকে বাস্তবিকই উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করিবে। নবী করীম (স) 'আকীক' নামক স্থানের জমির সমস্ত এলাকা বিলাল ইবনে হারিস (রা) কে চাষাবাদের জন্য দান করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) তাহার খিলাফতকালে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم لَمْ يُقْطِعْكَ لِتُحْجِرَهُ عَنِ لنَّاسِ اِنَّمَا اَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ فَخُذْ مِنْهَا مَاقَدَرْتَ عَلٰى عِمَارَتِهِ وَرَدَّالْبَاقِيْ- (كتاب الاموال-٢٩)

নবী করীম (স) তোমাকে এই জমি বেকার ফেলিয়া রাখিবার ও জনগণকে উহা হইতে উপকৃত হইতে না দিবার জন্য দান করেন নাই। বরং দিয়াছেন এইজন্য যে, তুমি উহাকে আবাদ করিবে। (কিন্তু দেখা যায় যে, তুমি তাহা করিতে পার নাই) অতএব যে পরিমাণ জমি আবাদ করিবার সার্মথ্য তোমার আছে, তুমি তাহাই রাখ। আর অবশিষ্ট জমি সরকারের নিকট প্রত্যর্পণ কর।

ইহা হইতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম যে ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করে, তাহা নিরংকুশ নয়, শর্তহীন নয়, পুঁজিবাদী মালিকানাও তাহা নয়। বরং ইসলাম উল্লিখিত শর্তের অধীন সীমাবদ্ধ মালিকানাই সমর্থন করিয়া থাকে ঠিক ততদিন পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত উক্ত শর্ত যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে থাকিবে। এই শর্ত যখনই লংঘন করা হইবে, তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এই মালিকানা হরণ করা শুধু সঙ্গতই নয়, অবশ্য কর্তব্যও বটে। অতএব কুরআন মজীদের এইরূপ মালিকানাকে 'আমানতদারী' বা 'খিলাফত' বলিয়া অভিহিত করা যথার্থ হইয়াছে।

## ব্যক্তিগত মালিকানায় সরকারী হস্তক্ষেপ

জাতীয়করণ পর্যায়ে ইসলমের নীতি কি? শিল্প-কারখানা, সাধারণ জনকল্যাণমূলক জিনিস, জমি এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিসকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যপারে ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা কি হইবে?

এই পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পর্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে এক তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা জরুরী বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান আলোচনা এই উদ্দেশ্যেই এখানে সংযোজিত হইতেছে।

মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি। হাদীসটি এইঃ

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلَاثٍ اَلْمَاءُ وَالْكَلَاءُ وَالنَّارُ-

পানি, ঘাস ও আগুন—এই তিনটি জিনিসে সব মানুষ সমান অধিকার সম্পন্ন ।

এই হাদীসটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই তিনটি স্বভাবজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করার ও উহা হইতে উপকৃত হওয়ার নির্বিশেষ সব মানুষেরই অধিকার রহিয়াছে। কেননা ওইগুলি সকল পর্যায়ের মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য। এই কারণেই ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক পর্যায়ে এই তিনটি জিনিসের কোন একটিকেও কোন মানুষ অন্য লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া একাকী করায়ত্ত করিয়া লইতে পারে না। কেননা ইহা মানুষের মধ্যে কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হইয়া গেলে অন্যান্য সাধারণ মানুষ তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইবে। আর ইহা মানবতার অধিকার ও মার্যাদার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের এই অধিকার স্বীকৃতব্য।

এই পর্যায়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে হাদীসে উল্লিখিত মাত্র তিনটি জিনিসের মধ্যেই রাষ্ট্রের এই অধিকার সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনুরূপ ধরনের সাধারণ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য যাবতীয় জিনিসের ক্ষেত্রেও ইসলামী রাষ্ট্রের এই অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

ইসলামী শরীয়াতে সমাজ-মানুষের প্রয়োজন পূরণ উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করার বিধান রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে শরীয়াতে যথেষ্ট উৎসাহও দান করা হইয়াছে। ফিকহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ওয়াক্ফ' হইলঃ

اِخْرَاجُ الْعَيْنِ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا اِلَى مِلْكِ اللّٰهِ اَنْ تَكُوْنَ غَيْرَ مَمْلُوْكَةٍ لِاَحَدٍ

بَلْ تَكُوْنُ مَنْفِعَتُهَا مُخَصَّصَةً لِلْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِمْ- (للمصطفى السباعى)

কোন নির্দিষ্ট জিনিসকে উহার মালিকের মালিকানা হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর মালিকানায় অর্পণ করা।..........অর্থাৎ মানব সমাজের কেহই এককভাবে উহার মালিক হইবে না, যাহাদের জন্য উহা ওয়াক্ফ করা হইবে কেবল মাত্র তাহারাই উহার যাবতীয় মুনাফা লাভ করিবে।

বস্তুত, ইহাকে এক প্রকার সম্পত্তির সামাজীকরণ বলা যায়। নবী করীম (স) মদীনার একটি স্থানকে জনগণের গৃহপালিত পশুর চারণভূমি হিসাবে র্নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। উহার নাম ছিল 'নাকী' ( نقيع )। এইরূপে কোন স্থানকে জনসাধারণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'হিমা' ( حمى )। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 'জুবদা ও উমর ফারূক (রা) রবজা' নামক

স্থানকে নিজ নিজ খিলাফতকালে সাধারণ মানুষের জন্য উম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ স্থানের উপর কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানা বা কাহারো একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হইত না। ইহা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীন সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল। সর্বসাধারণ মানুষ-ই ইহা ব্যবহার করার অধিকারী ছিল।

হযরত উমর ফারূক (রা) 'রব্জা' নামক স্থানকে সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত ঘোষণা করিলেন, তখন সেই স্থানের অধিবাসী ও মালিকরা উহার প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি ইহা কি করিলেন? ইহা তো আমাদের বসবাসের স্থান। জাহিলিয়াতের জামানায় উহার জন্য আমরা কত মারপিট ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছি। আর এই জমীনের অধিবাসী থাকা অবস্থায়ই আমরা ইসলাম কবুল করিয়াছি। এইরূপ অবস্থায় আপনি আমাদের মালিকানা হরণ করিয়া আমাদের জমিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইলেন এবং সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত ঘোষণা করিলেন কিভাবে?

হযরত উমর (রা) ইহার সহসা কোন জওয়াব দিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া কিছু সময় নিশ্চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ

اَلْمَالُ مَالُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْلَا مَا اَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا حَمَّيْتُ مِنَالْاَرْضِ شَيْرًا فِىْ شَبْرٍ- (كتاب الاموال لابى عبيد، الماوردى)

সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃত মালিকতো আল্লাহ। আর সব মানুষ হইল একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর নামে শপথ, আমি যদি জমীনকে আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দিষ্ট না করিতাম তাহা হইলে আমি তাহাদের এক বিঘত পরিমাণ জমিও 'হিমা' বা সাধারণের জন্য উম্মুক্ত করিয়া দিতাম না।

অতঃপর হযরত উমর (রা) এই জমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিলেন। এই সময় তিনি তাহাকে যে নসীহত করিয়াছিলেন তাহা ইসলামী অর্থনীতিতে চিরস্মরণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেনঃ

জনসাধারণের উপর অত্যচার, অনাচার করিও না, নিপীড়িতের মর্মবিদারী ফরিয়াদকে ভয় করিও। কেননা সে ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট কবুল হইয়া থাকে। উট ও ছাগল-ভেড়া পালকদিগকে এই স্থানে প্রবেশ করিতে দাও; কিন্তু ইবনে আফ্ফান ও ইবনে আওফের পশুগুলিকে প্রবেশ করিতে দিও না। কেননা তাহাদের পশুগুলি যদি খাদ্যাভাবে মরিয়াও যায় তাহা হইলে তাহারা খেজুর বাগান ও ফসলের ক্ষেত দ্বারা উহার প্রতিকার ও ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবে। কিন্তু এই গরীব অল্পসংখ্যক পশুর মালিকদের জন্তুগুলি ধ্বংস হইয়া গেলে তাহারা নিজেদের সন্তানাদিসহ আমার নিকট আসিয়া 'আমীরুল মু'মিনীন' বলিয়া চিৎকার করিবে অর্থাৎ তাহারা রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দাবি করিবে। কেননা অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলে বায়তুলমালে তাহাদের অধিকার [illegible] এইরূপ অবস্থায় কি আমি তাহাদিগকে এমনি অসহায় [illegible]

পশুগুলির জন্য ঘাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে সহজ। আর তাহাদের জন্য-ও ইহাই খুশীর বিষয় হইয়া থাকে। তাহারা ইহার জন্য ইসলামে লড়াই করিয়াছে। অথচ তাহারা দেখিতে পাইবে, আমি তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছি। আর বস্তুত আল্লাহর পথে ভার বহনকারী এই জন্তুগুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে আমি লোকদের নিকট হইতে তাহাদের বসবাস এলাকার জমি গ্রহণ করিয়া সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এলাকা বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতাম না।

উমর ফারূকের এই দীর্ঘ ঘোষণা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সরকার ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি দখল করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ও উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। ধনীদের নিকট হইতে সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত সম্পত্তি ভোগ-ব্যবহার করার অভাবগ্রস্ত ও কম সম্পদশালী লোকদেরই সর্বপেক্ষা বেশী অধিকার রহিয়াছে। সমাজে এই ব্যবস্থানা থাকিলে দরিদ্র লোকেরা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিপতিত হইতে বাধ্য হইত।

ইসলামী ফিকাহ্য় এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য বা শিল্পপণ্য অধিক মূল্য আদায়ের জন্য মওজুদ করিয়া রাখা নিষিদ্ধ। যে লোক তাহা করিবে তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা, তাহা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতে সরকার তাহাকে বাধ্য করিবে। কিংবা যদি কেহ অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা ন্যায্য-দামে বিক্রয় করিতে তাহাকে বাধ্য করা হইবে। এই উভয় অবস্থায় পণ্যমালিক যদি সরকারী নির্দেশ মানিয়া লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে তাহার পণ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং উহাকে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা এই উভয় অবস্থাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। এই দৃষ্টিতে বলা যায়, কোন জমি বা সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা যদি কখনও সাধারণ জন-মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় কিংবা সাধারণ জনস্বার্থে কোন জমির ব্যক্তিগত মালিকানা হরণ করিয়া উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহা অবশ্যই করা যাইবে।

একজন আনসারীর বাগানে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুবের একটি খেজুর গাছ ছিল। সেখানে তিনি এবং তাহার পরিবারবর্গের লোকেরা যাতায়াত করিতেন বিধায় আনসারীর বিশেষ অসুবিধা হইত। আনসারী তাহার এই অসুবিধার জন্য নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ করিলেন। তখন নবী করীম (স) সামুরাকে উহা বিক্রয় করিতে কিংবা দান করিয়া দিতে অথবা উহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে বলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইহা নবী করীমের উপদেশ মাত্র, কোন নির্দেশ নয়। তাই তিনি ইহার কোন একটি কথাও মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না। তখন নবী করীম (স) আনসারীকে বলিলেনঃ

[illegible]

নবী করীমের এই নির্দেশ বৈধ ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপের অকাট্য প্রমাণ। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মালিকানা যখন উহার প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা পীড়া দেয়, তখন ব্যক্তিগত মালিকানা হরণ করা যাইতে পারে এবং ইহাই যখন সংগত, তখন কোন মালিকানা যদি সমাজ ও সমষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়ে তাহা সমষ্টির কল্যাণের জন্য হরণ করা যাইবে না কেন?

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারূক (রা) তাহার কতিপয় রাজ্য শাসকের অর্জিত ধন-মালের অর্ধেক পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই রাজ্য শাসকগণ ছিলেন হযরত আবূ হুরায়রা, আমরা ইবনুল আ'স, ইবনে আব্বাস ও সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী। সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ দৃষ্টিতে প্রয়োজন বোধ হইলে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করার অবকাশ ইসলামী শরীয়াতে রহিয়াছে, পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

ইসলামী শরীয়াত জুলুম প্রতিরোধক ইনসাফ প্রতিষ্ঠাতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপক এবং সেজন্য দায়িত্বশীল। উহাতে যেমন ব্যক্তির কল্যাণের প্রতি নজর রাখা হইয়াছে, তেমনি সমাজ ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতিও। এই দুইয়ের মাঝে যদি কোন দিক দিয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ইসলামী শরীয়াত উহার প্রতিরোধ করিয়া সেখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ-পরিকর। অতএব, ব্যক্তিগত মালিকানা যদি সমাজ-সমষ্টির কিংবা সমাজের অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে সামাজিক ইনসাফের ভারসাম্য রক্ষার্থে এই মালিকানা হরণ কিংবা উহাকে নিয়ন্ত্রিত করাও ইসলামী শরীয়াতের দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র শরীয়াতের এই বিধানের ভিত্তিতেই এইরূপ করার অধিকারী।

বস্তুত, ব্যক্তিগত মালিকানায় সরকারী হস্তক্ষেপ—অন্য কথায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—ইসলামী শরীয়াত সমর্থিত, ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। নবী করীম (স) আদালতী ফয়সালা হিসাবে এইরূপ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এইরূপ করা অপরিহার্য হইলে তাহা অবশ্যই করা যাইবে। অনেক সময় কেবল এই উপায়েই সামাজিক জুলুম ও সামগ্রিক ক্ষতির প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কাজ করা ওয়াজিবও হইতে পারে।

তবে এই ব্যাপারে কাহারো স্বেচ্ছাচারিতা করিবার অধিকার নাই। কেননা তাহাতে একটি জুলুম ও সামান্য ক্ষতির প্রতিরোধ করিতে গিয়া আর একটি জুলুম ও বিরাট ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সরকারকে অবশ্যই নিরপেক্ষ আদালতী ফয়সালা গ্রহণ করিতে হইবে।

কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত মালিকানা পুরাপুরিভাবে সম্মনার্হ এবং সরকার উহার নিরাপত্তা বিধানের জন্য দায়ী। কেবলমাত্র শরীয়াতের বিধানের ভিত্তিতেই এবং ইনসাফের তাকিদেই ন্যায়সংগত পন্থায় উহা হরণ করা যাইতে পারে, স্বেচ্ছাচারিতা করিয়া নয়।

## ব্যক্তিগত মালিকানা সীমিতকরণ

পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা চির সম্মানার্হ, তাহাতে পরিমাণ বা সংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সে মালিকানাকে কোন সময় নিয়ন্ত্রিত কিংবা সীমিত করিয়া দেওয়ার অবকাশ আছে কি?

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের খিলাফতকালে ইরাক, সিরিয়া ও জজীরা মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত হইলে এই দেশের কৃষিজমি কি করা হইবে, উহা বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হইবে, কি উহার মালিকদের নিকটেই উহা থাকিতে দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা দেয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের পর উহাকে উহার পুরাতন মালিকদের নিকটই থাকিতে দেওয়া হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ফলে জমিসমূহের পুরাতন মালিকরাই উহা ভোগ-দখল করিতে থাকে, নূতন কাহাকেও উহার মালিক হইতে দেওয়া হয় না। অবশ্য তাহাদের উপর 'খারাজ' (ভূমিকর) ধার্য করা হয়। এই ভূমিকর নির্ধারণ করা হয় এভাবে যে, জমির ফসলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইত, উহা হইতে প্রথমে কৃষিজীবীদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফসল ভাগ করিয়া সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখা হইত। এই বন্টনে তাহাদের পরিবারবর্গ এবং তাহাদের সারা বছরের যাবতীয় প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। এতদ্ব্যতীত বিপদ-আপদে প্রতিরোধের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেও অতিরিক্ত একটা পরিমাণ শস্য তাহাদিগকে দিয়া দেওয়া হইত। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, সরকার তাহাই ভূমিকর বাবদ গ্রহণ করিতেন।

হযরত উমর (রা) হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামানকে দজ্‌লা নদীর অপর পাড়ে পাঠাইয়াছিলেন এবং উসমান ইবনে হানীফকে পাঠাইয়াছিলেন অন্য এক অঞ্চলে। তাঁহারা দুইজন তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

كَيْفَ وَضَعْتُمَا عَلَى لْأَرْضِ لَعَلَّكُمَا كَلَّفْتُمَا اَهْلَ عَمَلِكُمَا اَىِ الْفَلَاحِيْنَ مَا لَاَ يُطِيْقُوْنَ؟

জমির ব্যাপারে তোমরা কি নীতি অবলম্বন করিয়াছ? সম্ভবত তোমরা কৃষিজীবীদের উপর তাহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে খুব বেশী কষ্ট দিয়াছ?

জওয়াবে হুযায়ফা বলিলেনঃ لَقَدْ تَرَكْتُ فَضْلاً অতিরিক্ত যাহা ছিল, তাহা সব তাহাদের জন্যই রাখিয়া আসিয়াছি।' আর উসমান বলিলেনঃ

لَقَدْ تَرَكْتُ الضِّعْفَ وَلَوْشِئْتُ لَاَخَذْتُهُ–

দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল তাহাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। অবশ্য ইচ্ছা করিলে তাহাও লইয়া আসিতে পারিতাম।

তখন হযরত উমর (রা) বলিলেনঃ

اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ بَقِيْتُ لِاَرَامِلِ اَهْلِ الْعِرَاقِ لَاَدَعَنَّهُمْ لَايَفْتَقِرُوْنَ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ-

(الخراج لابى يوسف، الاموال لابى عبيد)

সাবধান! তোমাদের কৃষিজীবীদের উপর তাহাদের সামর্থ্যের অধিক কর ভার চাপাইয়া দিও না। আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যদি ইরাকের বিধবাদের খেদমতের জন্য জীবিত থাকি, তাহা হইলে তাহাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়ে যাইব যে, আমার পরে তাহারা কাহারো মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হইবে না।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর ও অন্যান্য সাহাবী (রা) ইরাক, সিরিয়া, জজীর ও মিসরের বিজিত অঞ্চলের জমিকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীন রাখিয়াছিলেন এবং কোন ব্যক্তিকেই ইহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া লইবার সুযোগ দেন নাই। ইহা এবং পূর্ব অধ্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা করিয়াছি তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, প্রয়োজন হইলে কৃষি-জমির মালিকানা সীমিত করা সম্পূর্ণ জায়েয। বিশেষ করিয়া বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশে যে বিরাট কৃষি-জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা রহিয়াছে এবং সেখানে জনস্বার্থ যেভাবে বিপন্ন ও ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে, তাহা নানা দিক দিয়াই অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক।

সামন্তবাদী ভূমি মালিকানায় এক-একজন লোক বিরাট বিশাল এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষি-জমির মালিক হইয়া বসিত। তাহার একার পক্ষে সেই সমস্ত জমির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, আবাদকরণ ও উহার ফসল সংগ্রহ সংরক্ষণ স্বাভাবিকভাবে খুবই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাড়াইত। এখানে যে সব শ্রমিক মজুর কাজ করিত তাহাদের প্রতিও সুবিচার হওয়ার পরিবর্তে জুলুম ও শোষণ হওয়াই স্বভাবিক ছিল। এমন কি অনেক জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকাও অস্বাভাবিক ছিল না। ইহাতে জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ব্যাহত হইতে এবং তাহার ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়াও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইত। এই কারণে উত্তরকালে একজন ব্যক্তির মালিকানায় বিরাট বিশাল অঞ্চলের কৃষি-জমি ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্তে উহার একটি বিশেষ অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা হইতে মুক্ত করিয়া তাহা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া-ই সমীচীন বিবেচিত হইতে থাকে। ইসলামের ইনসাফগার দৃষ্টিতে এইভাবে ব্যক্তি-মালিকানা সীমিত করিয়া দেওয়া কিছু মাত্র অন্যায় হইতে পারে না।

ইসলামী ফিকাহয় এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণকে বলা হয় سدالذرائع 'ক্ষতিকর কাজের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া'। পণ্য মওজুদকারীর অধিক মুনাফা লুণ্ঠনের পথ বন্ধ করা এবং অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করার পথে বাধার সৃষ্টি করা সম্পর্কে ইসলামী ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণ রূপে একমত। কেননা এইরূপ করিয়া সমাজ ও জাতির সার্বিক ক্ষতির প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর ইসলামী বিধানের লক্ষ্যই হইল সার্বিক কল্যাণ। একারণে বলা যায়, মুনাফা সীমিতকরণ ও মালিকানা সীমিতকরণে মূলত কোনই পার্থক্য নাই। আর একটি যখন শরীয়াতে জায়েয তখন অপরটি অনিবার্যভাবেই জায়েয হইবে।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তির পক্ষে জমির কিছু অংশের মালিক হওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সমাজ ও সরকার যখন লক্ষ্য করিবে যে, তাহাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক সম্পত্তির মালিক হইতে দিলে সমাজ ও সমষ্টির পক্ষে ক্ষতি হওয়ার এবং বিপুল সংখ্যক ভূমিহীনদের বেকার ও উপার্জন বঞ্চিত হইয়া থাকার আশংকা রহিয়াছে, তখন তাহার অতিরিক্ত জমি সংগ্রহ চেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করা কোন প্রকারেই জুলুম হইতে পারে না। ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই রূপ বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

যে অঞ্চলের লোকেরা আঙুর চাষ করিয়া উহা দ্বারা শরাব তৈয়ার করিতে অভ্যস্ত, মালিকী মাযহাবের ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে সেখানে আঙুর চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা উহার অবকাশ সীমিতকরণের অধিকার সরকারের রহিয়াছে। স্থানান্তরে গমন করার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা) খলীফাতুল-মুসলিমীন হিসাবে একবার বড় বড় সাহাবীগণকে মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ইহাও এক প্রকারের হস্তক্ষেপ। কিন্তু জাতীয় কল্যাণের দৃষ্টিতে খলীফাতুল-মুসলিমীনকে তাহা সাময়িকভাবে করিতে হইয়াছিল। তাই স্থানান্তরে গমনের স্বাধীনতা হরণ, মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি, কৃষি কাজের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মালিকানাকে সীমিতকরণের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কি?

আমাদের প্রতিপাদ্য হইল, সমষ্টির কল্যাণ যখন ব্যক্তি মালিকানা সীমিত করার উপর নির্ভরশীল হইবে তখন—কেবলমাত্র তখনি সেই মালিকানাকে হরণ বা নিয়ন্ত্রিত কিংবা সীমিত করা ইসলামী শরীয়াতে জায়ে হইবে। আর অনেক সময় শুধু জায়েযই নয়, একান্ত কর্তব্যও হইতে পারে। ইসলামী বিধানে ইহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ কিছুমাত্র বিরল নয়। আমানতী তাৎপর্যে ব্যক্তি মালিকানা ইসলামে সাধারণ স্বীকৃত এক সত্য, এ কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু এই কথা-ই চূড়ান্ত নয়। এই মালিকানা কখনও শর্তহীন নিরংকুশ নয় এবং কোন অবস্থায়ই তাহার ব্যতিক্রম করা যাইবে না এমন কথাও নয়। বরং এই ব্যক্তি-মালিকানা সমাজে ও সমষ্টির কল্যাণের শর্তাধীন। সমাজ ও সমষ্টির কল্যাণের জন্য অপরিহার্য হইয়া দেখা দিলেও ব্যক্তি-মালিকানা হরণ বা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না, কোন মানুষের জন্যই এমন মালিকানা ইসলামে কোন কালেই স্বীকার করা হয় নাই। কেননা ইহা ব্যক্তির নিকট আল্লাহর অর্পিত আমানত মাত্র। তাই আল্লাহ-তা'আলার বিধানেই যখন উহা হরণ বা নিয়ন্ত্রণের দাবি করিবে তখন তাহা অবশ্যই কার্যকর হইবে।

কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তি-মালিকানা নিয়ন্ত্রণ বা সীমিতকরণের এইসব কাজই কেবলমাত্র সমাজস্বার্থ ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যই করা সম্ভব। ইসলামে ইহা কোন সাধারণ ও স্থায়ী নীতি বা আদর্শরূপে স্বীকৃত নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইলে সে জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের নিকট হইতে রায় গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইনসাফ মত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে সে জন্য কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা করার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

# শিল্পনীতি

বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নানাবিধ শক্তি, সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রী মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার নাম হইতেছে শিল্প। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে উহার সহিত মানুষের শ্রম-মেহনতকে, বুদ্ধি-প্রতিভাকে যোগ করিয়া পণ্যোৎপাদন করার কাজ আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে ইহা ক্ষুদ্রায়তন এবং হস্তশিল্পের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মানববুদ্ধির ক্রমবিকাশ ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের জন্য মানুষ নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছে। এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বৃহদায়তন উৎপাদন কার্য শুরু করা হইয়াছে। সংক্ষেপে শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের ইহাই হইল গোড়ার কথা।

প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করিবার জন্য এক দিকে যেমন শ্রমের আবশ্যক, অন্যদিকে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধনও একান্ত অপরিহার্য। কাজেই প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের শ্রম এবং মূলধন—এই তিনটিই হইল শিল্পের বুনিয়াদ। ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পোৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অত্যধিক মুনাফা লুণ্ঠন নয়, নিরীহ শ্রমিক-মজুরদিগকে শোষণ করাও নয়, বরং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করা, জীবন যাপনের চাহিদা মিটানো, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন সাধনই হইতেছে উহার মূল লক্ষ্য। কাজেই শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে সর্ব প্রথম লক্ষ্য দিতে হইবে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার দিকে—মানুষের চাহিদা মিটানোর দিকে। যেসব পণ্যের উৎপাদনে মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে, ইসলামী সমাজে সর্বপ্রথম সেই সব শিল্পের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে—যেন কোন মানুষই জীবনের মৌলিক প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত না থাকে।

## শিল্পের দুই দিক

শিল্পের প্রধানত দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রথমত, কাঁচামাল হইতে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন এবং দ্বিতীয় হইতেছে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মারফত উৎপন্ন পণ্যের বন্টন। উৎপাদন-শিল্প দুইভাবে কার্যকর হইয়া থাকে। প্রচুর যন্ত্রপাতি লইয়া যেসব কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইগুলিতে পণ্য উৎপন্ন হয় বহুল পরিমাণে এবং এইসব কারখানা বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কুটির শিল্প এই প্রকার যন্ত্র শিল্পের ঠিক বিপরীত । কুটির শিল্পে কারিগর ও যন্ত্রপাতি লাগে কম, মূলধন লাগে যৎসামান্য এবং উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণও হয় অপেক্ষকৃত অল্প। সাধারণত গ্রাম্য

কারিগর তাহার নিজের বাড়িতে পরিবারভুক্ত লোকজনের সহায়তায়ই কুটির শিল্প পরিচালনা করিয়া থাকে।

ইসলাম অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য এই উভয় প্রকার শিল্পের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কুরআন মজীদে সাধারণ হস্তশিল্প হইতে শুরু করিয়া বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম দেশীয় অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য হস্তশিল্প—তথা কুটির শিল্পের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য আরোপ করিয়াছে। সমাজের সকলের পক্ষেই বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প সংস্থাপন সম্ভব হয় না, সে জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। অথচ হস্তশিল্প ও ছোটখাটো যন্ত্রের সাহায্যে কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। হস্তনির্মিত তাত চালাইয়া কাপড় বোনা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সহজসাধ্য, কিন্তু কাপড়ের একটি মিল স্থাপন করার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, যা অনেক লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এতদসত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোন প্রকার শিল্পোৎপাদনই কিছু মূলধন বিনিয়োগ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। মূলধনের সাহায্যেই সকল প্রকার শিল্পকার্য সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও প্রচুর পরিমাণ মূলধন আবশ্যক।

মূলধন প্রয়োগ করিয়া কুটির শিল্পের সূচনা করা হউক, কি বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প কিংবা ছোটখাটো আকারের বাণিজ্য, সকল ক্ষেত্রেই মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কর্মচারী ও শ্রমিক বিনিয়োগ একান্তভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

এখানে আমরা ইসলামের অর্থনীতি অনুযায়ী মূলধনের বিভিন্ন প্রয়োগ, পুঁজি ও শ্রমিকের বিবিধ সমস্যা এবং অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করিব।

## মূলধন বিনিয়োগের পন্থা

ইসলামী সমাজে ব্যক্তির হাতে মূলধন সঞ্চিত হইতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে উহার প্রয়োগ ও বিনিয়োগ হইতে পারে, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করা চলে না। ব্যক্তিগতভাবে মূলধন বিনিয়োগের প্রথম পন্থা এই যে, ব্যক্তি নিজেই নিজের মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায় করিবে, বাণিজ্য করিবে, শিল্পোৎপাদনের কাজে টাকা খাটাইয়া কারখানা স্থাপন করিবে এবং সেজন্য শ্রমিক নিযুক্ত করিবে। বস্তুত, ব্যবসায় বাণিজ্য ইসলামী সমাজে চিরদিনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আজিও ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রে ব্যবসায় কিংবা শিল্পোৎপাদনের কাজে মূলধন বিনিয়োগ হইতে পারে, তাহা হইতে মুনাফা লাভ কিংবা প্রচুর পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজ ও জাতি তাহা হইতে উপকৃত ও লাভবান হইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষ নিজের তত্ত্বাবধানে মজুর শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইতে পারে। এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসংখ্য কারখানা ও পণ্যোৎপাদকারী যন্ত্র সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে

পারে। ইসলামী সমাজ-ইতিহাসের স্বর্ণযুগে এইরূপ কাজ করাইতে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছিল না, আজও থাকিতে পারে না।

ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের আর একটি পন্থা হইতেছে, একজনের মূলধন অপরজনের শ্রমের সহিত যুক্ত হইয়া কোন অর্থকরী কাজের সূচনা করা। আরবী ভাষার এইরূপ কাজকে 'কিরাজ' বা 'মুজারিবাত' مضاربت বলা হয়, আর ইংরেজীতে বলা হয় Sleeping Partnership. এইরূপ কাজে একজন মূলধন দেয়, অপর জন সেই মূলধন লইয়া শ্রম করে, অর্থোৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে। এইভাবে কাজ করার পর যে সম্পদ মুনাফা হিসাবে লাভ হয়, তাহা পূর্বনির্ধারিত অংশ ও হার অনুযায়ী নিয়মিতভাবে উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হয়। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে 'কিরাজের' ইহাই সর্ববাদী সম্মত সংজ্ঞা।

মূলধন বিনিয়োগের উল্লিখিত দুইটি পন্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথম প্রকার পন্থায় শ্রমিকের নির্দিষ্ট মজুরী যথাসময় আদায় করা পুঁজি মালিকের দায়িত্ব। তাহার নিজের লাভ হউক, লোকসান হউক, কম লাভ হউক কি বেশী হউক, শ্রমিকের মজুরী নির্দিষ্ট পরিমাণে তাহাকে অবশ্যই দিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার কাজে—'কিরাজ' বা 'মুজারিবাত এ-শ্রমিকের মজুরীর পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় না, নির্দিষ্ট হয় লভ্যাংশের হার, কাজেই তাহাতে মুনাফা হইলেই শ্রমিক ও পুঁজি-মালিকগণ লভ্যাংশ পাইতে পারে। মুনাফার পরিমাণ অনুপাতে পূর্বনির্দিষ্ট হার অনুসারেই তাহারা তাহা পাইবে: আর লাভ না হইলে কিছুই পাইবে না।

মূল্লধন বলিতে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না, প্রত্যেক উৎপাদক শক্তি ও যন্ত্রই মুলধন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অতএব চাষের জমি, কারখানা ও কোন যন্ত্রপাতিকে কেন্দ্র করিয়াও অর্থোৎপাদনের উল্লিখিত পন্থায় কাজ হইতে পারে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা নাজায়েয হইবে না।

খয়বর বিজয়ের পর নবী করীম (স) তথাকার বিজিত জমি-ক্ষেত স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীদের নিকট এই শর্তে রাখিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা এই জমিতে চাষাবাদ করিবে, ফসল উৎপাদ করিবে এবং ফসলের অর্ধেক তাহারা মজুরী হিসাবে গ্রহণ করিবে।

এই কর্মনীতির আলোকে বর্তমান যুগের ইসলামী সমাজে একটি প্রেস, একটি কারখানা, একটি আড়ত, একটি মোটরগাড়ী ইত্যাদিকে ভিত্তি করিয়া অনুরূপভাবে অর্থোৎপাদনের কাজ হইতে পারে এবং তৎলব্ধ মুনাফা উৎপানে যন্ত্রের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বন্টনও হইতে পারে।

নবী করীম (স)-এর সাহাবায়ে কিরামও অনুরূপভাবে কাজ করিয়াছেন। হযরত উসমান (রা) কোন কোন লোককে নগদ টাকা বা কোন উৎপাদন যন্ত্র উক্তরূপ নিয়ম অনুযায়ী দিয়াছিলেন এবং নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

এই ধরনের পুঁজি-বিনিয়োগ ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ সংগত। ইসলামের ইতিহাসে এই ব্যাপারে কোনদিনই কোন দ্বিমত দেখা দেয় নাই। কারণ মূলত ইহা দুই

ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যে এক প্রকারের স্বেচ্ছামূলক চুক্তি বিশেষ। এক ব্যক্তি পুঁজি সংগ্রহ করে, অপরজন তাহাতে নিজের শ্রম, মেহনত, কর্মক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা প্রয়োগ করে। এইজন্য উভয়ই তাহা হইতে মুনাফা লাভ করিবার অধিকারী। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যবসায়ে যত শোষণ ও জুলুমের অবকাশ থাকে, ইসলামী সমাজে তাহার কোন সুযোগই থাকিতে পারে না। কাজেই ইসলামী সমাজে এইরূপ ব্যবসায় নাজায়েয হওয়ার কোনই কারণ নাই।

সমাজে এমন লোক থাকিতে পারে—থাকা অপরাধ নয়—যাহাদের নিকট মূলধন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রয়োগ করিবার মত অপরিহার্য শ্রমশক্তি নাই—ব্যবসায়ী বুদ্ধির অভাব কিংবা কোন শরীয়তী প্রতিবন্ধকতার কারণে এই কাজ করার তাহার সুযোগ অথবা সাধ্য নাই (যথা স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, পংগু, অক্ষম) অন্যদিকে মূলধনবিহীন অথচ প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি এবং শ্রম করিয়া অর্থোৎপাদনের মত বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সম্পন্ন বহুলোক সমাজে থাকিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের লোকদেরও কোন অপরাধ নাই। যেমন একজন চিন্তাবিদ মনীষী একখানি মহামূল্য গন্থ রচনা করিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার মত মূলধন ও ব্যবস্থাপনা তাঁহার নাই। তখন অপর একজন মূলধন ও ব্যবস্থাপনা নিয়োগ করিয়া উহা প্রকাশ করিতে পারে। ইহাতে জনগণের বিপুল কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং গ্রন্থকার ও মূলধন বিনিয়োগকারী উভয়ই হার মত কিংবা ইনসাফভিত্তিক রেওয়াজ অনুযায়ী মুনাফা ভাগ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে শুধু মূলধনের যেমন কোন ব্যবহারিক মূল্য হইতে পারে না, অনুরূপভাবে নিছক শ্রমশক্তিও এককভাবে কিছুমাত্র অর্থোৎপাদন করিতে সমর্থ নয়। এমতাবস্থায় শ্রম ও মূলধনের সংমিশ্রণ বা সম্মিলনের মাধ্যমে মানবসমাজে কোন বৃহত্তর কল্যাণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা অন্যায় তো নয়ই—বরং ইহা একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই সমাজতান্ত্রিক চীনেও মজুর ও মূলধনের এইরূপ সম্মিলনের মাধ্যমে উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন করা হইতেছে। ফলে প্রত্যেক শ্রমিকই সরকারী কারখানা বা পারিবারিক চাকুরী—সকল ক্ষেত্রেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত কাজ করিতেছে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।[১]

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মূলধনবিহীন কোটি কোটি লোক নিছক মজুরীর বিনিময়ে কাজ করিতেছে। ইহারা অসহায় দিন-মজুর মাত্র; অপরের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদিগকে মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় ফলে একসিকে যেমন সকল শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায় নড়—বেকার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে, অপরদিকে(যাহারা কোন কারখানায় নিযুক্ত হয়, তাহারা শেমনি নিজেদের সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিওহয়। এই দিক দিয়াও একজনের মূলধন লইয়া অপর জনের শ্রম-বিনিয়োগের ইসলাম-সম্মত পন্থার সুযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে এবং মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিয়া নিজের প্রয়োজন পূরণ করিতে সমর্থ হয়। ইসলামী সমাজে মূলধন বিনিয়োগের এই পন্থার শ্রমিক ও মালিকের অধিকার পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। শ্রমিক

১. চীনা কমিউনিজম, অধিকৃত এলাকার অবস্থা-আল্‌স্‌ ও নিংটন।

নিজের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী লাভ করিতে পারিবে। একজন মূলধন দিবে, অপরজন উহা লইয়া ব্যবসায় ও ব্যাণিজ্য করিবে এবং মুনাফার পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুযায়ী অংশ গ্রহণ করিবে। ফিক্‌াহর পরিভাষায় ইহাকে قراض কিরাজ বলা হয়। ইমাম কুরতবী বলিয়াছেনঃ

لَاخِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ جَوَازِ الْقِرَاضِ- (بداية المحتهد ج ٢ ص ٢١٦)

কিরাজ ব্যবসায় জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য নাই।

এইরূপ ব্যবসায়ে শ্রমদানকারীর নিকট ব্যবসায়ের পুঁজি আমানত স্বরূপ থাকিবে। কোন বাহ্যিক কারণে তাহা নষ্ট হইয়া গেলে শ্রমিক সেজন্য কিছু মাত্র দায়ী হইবে না। বস্তুত, এই ক্ষেত্রে মজুরের প্রতি কোন প্রকার জুলুম ও শোষণ হওয়ার কোন সুযোগও থাকিতে পারিবে না।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلَّذِىْ يَسْتَاجِرُ مُدَّةً فَلَاضِمَانَ عَلَيْهِ مَالَمْ يَتَعَمَّدْ

নির্দিষ্ট বেতনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত মজুরের হাতে কোন জিনিস নষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে সেজন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাইবে না—যদি না তাহা ইচ্ছাপূর্বক হইয়া থাকে।

ইমাম কুরতুবি লিখিয়াছেনঃ

وَاِنَّهُ لَاضِمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيْمَا تَلَفَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اِذَالَمْ يَتَعَمَّدْ-

(بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٣٦)

নির্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত কর্মচারী যদি ইচ্ছাপূর্বক মূলধনের ক্ষতি না করিয়া থাকে, উহা অন্য কোন কারণে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে কর্মচারীকে বাধ্য করা যাইবে না।

মূলধন বিনিয়োগের আর একটি পন্থা কমিশনের বিনিময়ে কাজ করিবার সুযোগ দান। পণ্য–মালিক যদি কাহাকেও এই শর্তে পণ্য দেয় যে, সে নির্দিষ্ট পাইকারী মূল্যের অধিক যে কোন মূল্যে যত পণ্যই বিক্রয় করিবে, তাহা তাহার প্রাপ্য হইবে, অথবা শতকরা বা টাকা প্রতি সে এত কমিশন পাইবে; তবে ইহা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ শরীয়াত–সম্মত কারবার। এইরূপ কারবারে মূলধন-বিহীন শ্রমজীবীদের পক্ষে অর্থোৎপাদনের বিশেষ সুযোগ ঘটে। ইসলামী সমাজে এইরূপ কাজের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেঃ 'আমার এই কাপড় বিক্রয় করিয়া দাও, ইহাতে আমার নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক যাহাই পাইবে, তাহা তোমার হইবে—এইরূপ শর্তে কোন ব্যক্তিকে কমিশন এজেন্ট নিযুক্ত করায় ইসলামী অর্থনীতিতে কোনই বাধা নাই'।[১]

১. বুখারী শরীফ।

## যৌথ কারবার

যৌথ কারবার মূলধন বিনিয়োগের এক গরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুনিয়ার মানব সমাজে চিরদিনই এই যৌথ কারবার (Partnership of Contract) প্রচলিত ছিল। বিরাট কোন ব্যবসায় বা শিল্প কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধন সঞ্চয় করা এক ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় সম্ভব নাও হইতে পারে। এইজন্য একাধিক লোকের মিলিত পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক মিলনে এই কাজ সম্পন্ন করা খুবই সঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। বর্তমান দুনিয়ার অর্থনীতিতে ইহা পারস্পরিক ব্যবসায়ের এক সুদৃঢ় ভিত্তি হইয়া দাড়াইয়াছে।[১] ইহাতে একাধিক লোক মিলিত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং সকলেই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়। এইরূপ ব্যবসায় ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে বিধিসম্মত।

যৌথ কারবার পারস্পরিক চুক্তির ফলেই সম্ভব হয়। কাজেই ইহার অংশীদার হইতে ইচ্ছুক এমন সকল লোকেরই তাহাতে সম্মত হওয়া অপরিহার্য এবং এই চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের যাবতীয় শর্তাদি সকলের সম্মুখে স্পষ্টভাবে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ইহা পরস্পরের মধ্যে কোন এক সময় এবং কোন খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া ঝগড়া-বিবাদ, মত-বিরোধ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র নির্দেশ উক্ত হইয়াছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ– (البقره ٢٨٢)

হে মুসলমানগণ, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যখন তোমরা কোন লেনদেন বা কারবার করিবার চুক্তি করিবে, তখন তাহা অবশ্যই লিখিয়া লইবে।

বস্তুত কাহার কত মূলধন নিয়োগ (Invest) করা হইল এবং এই ব্যাপারে কি কি শর্ত নির্ধারিত হইল তাহা সবই সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত না হইলে ভয়ানক অসুবিধা ও গন্ডগোলের কারণ হইতে পারে। এইজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী পৃষ্টপোষকতা লাভের উদ্দেশ্যে তাহা রেজিষ্ট্রিও করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যৌথ কারবার কেবল নগদ টাকার মূলধনের ভিত্তিতেই হয় না, নিছক শ্রম-মেহনতকে কেন্দ্র করিয়াও একাধিক লোক যৌথ নীতিতে কারবার ও আয়-উপার্জনের কাজ করিতে পারে। বিশেষতঃ নগদ মূলধনহীন শ্রমজীবী লোকদের পক্ষে ইহাই হইতেছে অর্থোৎপাদনের উত্তম পন্থা। এই নিয়ম অনুসারে সকলেই মিলিতভাবে কাজ করিবে এবং লব্ধ মুনাফা বা মজুরী নির্দিষ্ট হারে সকলেই ভাগ করিয়া লইবে।

যৌথ নীতিতে খনিজ সম্পদ উদ্ধার করা এবং তাহা লইয়া কারবার করাও ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয। পরিবহণ বা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীও যৌথ নীতিতে স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারে।

---

১. মার্শালঃ প্রিন্সিপাল্‌স্ অব ইকনমিক্স, ৩০১ পৃঃ

মূলধনের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করতঃ তাহাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা এবং তাহা লোকদের মধ্যে বন্টন ও বিক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট মূলধন সংগ্রহ করার নীতি বর্তমান যুগে খুব বেশী প্রচলন লাভ করিয়াছে। বিরাটাকারে কোন ব্যবসায় বা শিল্প-সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ পুঁজির আবশ্যক, তাহা ব্যক্তিগতভাবে কেবল একজন লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। অথচ এই সব কাজ ব্যতীত জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব এবং জাতীয় পূণর্গঠন ও শিল্পায়নের প্রচেষ্টা কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই জন্য অসংখ্য লোকের অংশীদারিত্বে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এইরূপে যেসব শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার প্রতি অন্ততঃ অংশীদারদের আন্তরিক আগ্রহ ও মনের টান বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। ফলে ইহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভও সহজ হইয়া পড়ে। এইভাবে শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় এবং অন্যান্য নানাবিধ কারবার শুরু করা এবং উহার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সম্ভব হয়।

এইরূপ লিমিটেড কোম্পানীর পুঁজি মালিক—অন্য কথায় উহার অংশীদারগণ—প্রত্যেকেই তাহার নিজ অংশের মূলধনের এবং এই মূলধন ব্যবহারকারী বা ব্যবসায় পরিচালকগণ তাহাদের সংগঠনকার্য ও দক্ষতা প্রয়োগের জন্য লভ্যাংশ পাইতে পারে। অপরদিকে মজুর-শ্রমিকগণ—উহার নানা কার্যে নিযুক্ত অসংখ্য কর্মচারীগণও—মজুরী ও বেতন পাইবার অধিকারী হইবে।

কোম্পানীর পরিচালক বা সংগঠকগণ প্রত্যেক অংশীদারের পক্ষ হইতে আমানতদার ও প্রতিনিধি হিসাবে কারবার পরিচালনা এবং উহার দেখাশুনা ও সংরক্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য নিছক সাংগঠনিক কাজের দরুন মুনাফার অংশ এবং বেতন লাভ করার তাহাদের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

এই ধরনের কোম্পানীতে একশ্রেণীর লোকের পক্ষে অত্যধিক পুঁজির বলে সর্বাধিক মুনাফা লুটিবার সুযোগ থাকা কিছুতেই সঙ্গত নয়। এইরূপ সুযোগ প্রথম দিকেই বন্ধ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কোম্পানীর সর্বাত্মক অংশীদার হইতে বা সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ খরিদ করিতে কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। সেজন্য কম মূল্যের অংশ প্রচুর পরিমাণে জনগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাহাতে অধিকসংখ্যক লোকের পক্ষে উহার অংশ খরিদ করার এবং তাহা হইতে লভ্যাংশ লাভ করার সুযোগ হইতে পারে। ইসলামী অর্থনীতিতে যে সম্পদ এককেন্দ্রীভূত হওয়া (Accumulation of wealth) নিষিদ্ধ তাহা এই উপায়েই কার্যকর হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, অর্থোৎপাদনের জন্য যে কোন সৎব্যবসায় হউক না কেন তাহাতে যদি লভ্যাংশ কাহারো জন্য পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট না হয়,—এইভাবে যে, তাহাকে শতকরা এত টাকা মুনাফা দেওয়া হইবে, তাবে ইসলামী অর্থনীতি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার দরুন এই হালাল উপার্জনকেই—জাতীয় পুণর্গঠনমূলক এই সৎব্যবসায়কে একটু সামান্য কারণে হারাম করিয়া তুলিয়াছে। অসংখ্য লোকের পুঁজি মিলিত হইয়া বিশেষ কোন কাজ নিয়োগ

হইলেই যে তাহাতে মুনাফা হইবে এবং পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে তাহা বন্টন করা যাইবে এ কথা কোন কালের কোন দেশের মানুষই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিলেই এবং শতকরা নির্দিষ্ট হারে 'মুনাফা' (সুদ) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেই সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে অবৈধ ও শোষনমূলক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ যদি তাহাতে মোটেই লাভ না হয়—যদি লোকসান হয়, তবে সুদ বাবদ দেয় টাকা কোথা হইতে আসিবে? যদি মুনাফা হয়, কিন্তু দেয় সুদের সমান পরিমাণে না হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট টাকা যে কোন রকমেই হউক, সংগ্রহ তো করিতে হইবে; কিন্তু তাহা কিরূপে এবং কোথা হইতে আসিবে? আর তাহাতে যদি প্রচুর লাভ হয় তবে প্রত্যেকের অংশ মূল্যের মাথাপিছু যাহা লাভ হইল, তাহার বাবদ সেই পরিমাণ লাভ না দিয়া দেওয়া হইবে নির্দিষ্ট হারে সুদ—যাহা লভ্যাংশের অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে শোষণ, ইহাই হইতেছে পরস্বাপহরণ এবং ইহাই হইতেছে সর্বগ্রাসী পুজিবাদের মূল ভিত্তি। উপরন্তু এউ ধরনের কারবারের প্রতি জনগণের একবিন্দু সহানুভূতি ও সহৃদয়তা থাকিতে পারে না।

ইসলামী অর্থনীতি এই সকল জুলুম-শোষণ ও পুঁজিবাদের এই পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই ধরনের মূলধনভিত্তিক কারাবারে কাহাকেও নির্দিষ্ট মুনাফার নামে 'সুদ' দেওয়া যাইতে পারে না—ইহা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বরং ইসলামী সমাজে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়ার শর্তেই এই ধরনের কারবার হইতে পারে—আর তাহাতে জুলুম ও শোষণমূলক কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথম পুঁজির অংশ অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন করা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র সহজ পন্থা। ইহার প্রতি জনগণের আন্তরিক অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ এই উপায়েই সম্ভব হইতে পারে। কারণ, জনগণ মনে করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে বিপুল অর্থসম্পদ উপার্জিত হইবে, তাহা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির পকেটে কুক্ষিগত হইয়া যাইবে না, তাহা অসংখ্য লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়ত এইরূপ প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শ্রমিক ও মজুরের কাজ করার সুযোগ হয় এবং তাহারা ইহা হইতে নিজেদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় লাভ করিতে পারে। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্মোক্ত হাদীসটি স্মরণীয়, তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ-

(ترمذى)

ব্যবসায়ী মাত্রই কিয়ামতের দিন অপরাধী হিসাবে পুনরুত্থিত হইবে। তবে তাহারা নয়, যাহারা ব্যবসায় কার্যে আল্লাহ্কে পূর্ণমাত্রায় ভয় করিয়াছে, সংশ্লিষ্ট জনগণের প্রতি কল্যাণপূর্ণ ব্যবহার এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা রক্ষা করিয়াছে।

## অর্থনৈতিক সংগঠন

সংগঠন বা ' অর্গানাইজেশন' এক প্রকার মানসিক শ্রম। কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা বা সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত কোন দেশেই বিরাট আকারে ও প্রচুর পরিমাণে

অর্থোৎপাদন হইতে পারে না। ঠিক এই কারণেই অর্থনীতিবিদগণ সংগঠনকেও স্বতন্ত্রভাবে অর্থোৎপাদনের একটি উপায় (Factor) হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। কারণ 'মূলধন' ব্যতীত যেমন অর্থোৎপাদন সম্ভব নয়, এই সংগঠন ব্যতীতও অর্থোৎপাদন কার্য বর্তমান সময়ে প্রায় অসম্ভব। কুরআন মজীদেও এই সংগঠন-শক্তি বা পরিশ্রমযোগ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরাধিপতি যখন রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বভার হযরত ইউসুফ (আ)-এর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেনঃ

اِنَّكَ الْيَــوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِــيْنٌ- (يوسف-٥٤)

আজ হইতে আপনি আমাদের নিকট বড়ই সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠালব্ধ ও সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত।

তখন হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেনঃ

اَجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ- (يوسف-٥٥)

দেশের অর্থভান্ডার (ব্যবস্থাপনা ও বন্টনের) দায়িত্ব আমার নিকট সোপর্দ করুন। আমি নিশ্চতভাবে উহার হিফাযতকারী এবং আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানেরও অধিকারী।

বস্তুত, এখানে দৈহিক শক্তির কথা না বলিয়া মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা এবং সংগঠন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, মূলত ইহা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় এক নিগূঢ় সত্য কথা। ইসলাম আগাগোড়াই একটি অখন্ড সংগঠন। ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ সংগঠনের মাধ্যমেই সম্পন্ন করিতে হয়। সাধারণভাবে সমাজ-জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নবী করীম (স) সংগঠনকে অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইসলামী হুকুমাতের খলীফাকে রাজনৈতিক সংগঠনকারী হিসাবেই প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেওয়া সংগত বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

## কর্মসংস্থান

বেকার, বে-রোজগার ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য কর্মসংস্থান করা—জীবিকা উপার্জনের উপায় সংগ্রহ করিয়া দেওয়া—অর্থনীতির ইতিহাসের এক চিরন্তনী সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। বহু কর্মক্ষম শ্রমজীবী এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও বেকার সমস্যার সর্বগ্রাসী বিপদে নিমজ্জিত হইয়া তিলে তিলে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। অথচ ইহারা কাজ পাইলে একদিকে নিজেদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার বাস্তব স্ফুরণ সাধনের সুযোগ পাইত, অন্যদিকে জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট কার্য সমাধা করিতে পারিত। একদিকে তাহারা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিত, অপরদিকে তাহারা প্রচুর অর্থোৎপাদন করিয়া অর্থনৈতিক আবর্তন-সৃষ্টির সাহায্যে সমাজক্ষেত্র হইতে দারিদ্র ও

আর্থিক অসাম্য দূর করিতে সমর্থ হইত। তখন ইহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বোঝা না হইয়া সমাজ ও জাতির একনিষ্ঠ খাদেম হইতে পারিত।

কাজেই বেকার-সমস্যা সমাধান করা, কর্মক্ষম লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করা, মানব-কল্যাণকামী প্রত্যেক সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অর্থনীতিতে নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বেকার লোকদের জন্য এইরূপ কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইতে পারে মানুষের জন্য কল্যাণকর অর্থনীতি। আর যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা নাই, তাহা কোনদিন মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। দুনিয়ায় চিরদিনই এমন এক অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল এবং এখনো রহিয়াছে, যাহার অধীন কেহ বেকার ও বে-রোজগার থাকিবে না; প্রত্যেকেরই জন্য সেখানে কর্মের সংস্থান করা হইবে। নিতান্ত অসহায় ও উপায়হীন করিয়া কাহাকেও উপেক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইবে না; বরং এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হাত ধরিয়া উপরে তোলা হইবে। কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মত বাঁচিবার ও মাথা তুলিয়া দাড়াইবার উপযুক্ত করিয়া তোলা হইবে।

এই দিক দিয়া ইসলামী অর্থনীতিই মানুষের অভাব মোচনকারী ও বেকার সমস্যার সমাধানকারী একমাত্র অর্থব্যবস্থা। হযরত নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্টপ্রধান হিসাবে রোজগারহীন লোকদের জন্য কর্মের সংস্থান করার দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি নিজে বেকার লোকদিগকে কাজে নিযুক্ত করিতেন। জীবিকা উপার্জনের কার্যকর পন্থা লোকদের বলিয়া দিতেন। উদারহণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা একজন সাহাবী নবী করীম (স)-এর নিকট কিছু খাদ্যের প্রার্থনা করিলেন। নবী করীম (স) তাহার ঘরে কোন জিনিস আছে কিনা তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "তাহার একখানা কম্বল আছে, উহার একাংশ তিনি পরিধান করেন ও অপর অংশ শয্যা ও গাত্রাচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করেন। এতদ্ব্যতীত পানি পান করার জন্য একটি পাত্রও তাহার আছে।" নবী করীম (স) তাহাকে এই দুইটি জিনিসই তাহার নিকট উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন। তিনি জিনিস দুইটি লইয়া আসিলে নবী করীম (স) নিজেই উহার নীলাম ডাকিয়া তাহা দুই 'দিরহাম' মূল্যে বিক্রয় করিলেন এবং এক দিরহামের বিনিময়ে তাহাকে একখানি কুঠার ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। কুঠার লইযা আসিলে পর দেখা গেল, শ্রেষ্ট মানব—সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজেই উহার হাতল লাগাইয়া দিলেন এবং জঙ্গলে গিয়া উহার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করার জন্য উক্ত সাহাবীকে আদেশ করিলেন। সেই সঙ্গে ক্রমাগত পনের দিবস পর্যন্ত এই কাজে লিপ্ত থাকিতেও তাহাকে তাগিদ করিলেন। ফলে পনের দিন পর তাহার আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তখন নবী করীম (স) ইরশাদ করিলেনঃ 'অপরের সম্মুখে ভিক্ষার হাত দরাজ করা এবং তার পরিণামে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়া অপেক্ষা জীবিকার্জনের ইহাই অনেক বেশী উত্তম পন্থা'।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবী করীম (স) উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষাবৃত্তির উৎসাহ দান করেন নাই, বরং পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাহার কার্যকর উপায় ও পন্থাও নির্ধারণ এবং আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকটি মানুষই যতদূর সম্ভব নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবে, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও সচ্ছলতা লাভ করিবে—ইহাই তিনি অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। তাঁহার গৃহীত কর্মপন্থা ইসলামী সমাজের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য সুনিশ্চিত পথ নির্দেশ করে। এজন্যই প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নবী করীম (স) প্রায়ই বলিতেনঃ

لَئِنْ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ اَحْبَلَهُ ثُمَّ يَاْتِى الْجَبَلَ فَيَاْتِى بِحَزَمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيُبِيْعُهَا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اُعْطُوْهُ اَوْ مَنعُوْهُ– (بخارى)

যিনি আমার প্রাণের মালিক, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের একজনের রশি লইয়া জঙ্গলে যাওয়া, কাষ্ঠ আহরণ করা, তাহা পিঠের উপর রাখিয়া বহন করিয়া আনা এবং বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করা অপরের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। বিশেষতঃ এই অবস্থায় যে, সেই অপর ব্যক্তি তাহাকে দিবে কি দিবে না তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। (বুখারী শরীফ)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে একজন স্বাস্থ্যবান ও শক্তি সম্পন্ন যুবক মসজিদে প্রবশ করিয়া জনগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। উমর ফারূক (রা) তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেনঃ নিজের জমিতে কাজ করাইবার জন্য এই যুবককে মজুর হিসাবে নিয়োগ করিতে কে প্রস্তুত আছে? একজন আনসার তাহাকে মজুর রাখিতে রাযী হইলেন। খলীফা তাহার মজুরী নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

হযরত উমর (রা) যখনি কোন উপার্জনক্ষণ বেকার পুরুষ দেখিতে পাইতেন, তখনি তিনি বলিতেনঃ

لَاتَكُوْنُوْ اَعْيَا لًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ–

মুসলমানের সমাজের গলগ্রহ ও অন্য লোকের উপর নির্ভরশীল হইও না।

মোট কথা, সমাজের বেকার লোকদের জন্য কর্ম-সংস্থানের চেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাধন কর্তব্য। ইহার কারণ এই যে, সমাজের লোকদের মাত্র একাংশ যদি উপার্জন করে আর অপর অংশ বেকার বসিয়া থাকে, তবে এ দিকে যেমন উপার্জনকারীদের উপর অর্থনৈতিক চাপ তীব্র হইয়া পড়িবে, অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইবে। ফলে জাতীয় অর্থসম্পদ মারাত্মকরূপে হ্রাস পাইয়া যাইবে।[১]

১. কারওয়ার এ্যান্ড কারমাইকেল ঃ ইলেমেন্টস অব ইকনমিকা।

তাই ইসলামী অর্থনীতিতে দুনিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করা—উপার্জন পরিহার করিয়া বেকার হইয়া বসা এবং অন্য লোকদের গলগ্রহ হইয়া থাকা যেমন নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও অতিশয় হীন ও ঘৃণ্য কাজ। ভিক্ষালব্ধ খাদ্যকে নবী করীম (স) 'জাহান্নামের অগ্নিদগ্ধ পাথর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন

নবী করীম (স) বলিতেনঃ

مَنْ سَاَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْاَ لَتُهُ فِى وَجْهِهِ خُمُوْسٌ اَوْ خَدُوْشٌ اَوْ كُدَاحٌ- (ترمذى)

তোমাদের মধ্য যাহারা ভিক্ষা করে—অথচ ইহা হইতে মুক্ত থাকার মত সম্পদ বা শক্তি-সামর্থ্য তাহাদের রহিয়াছে—তাহারা যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে, তখন তাহাদের মুখমন্ডল একেবারে মাংসহীন ও বীভৎস হইয়া যাইবে।

অপর হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

لَاتَزَالُ الْمَسَالَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ بِوَجْهِهِ مَزْعَةُ لَحْمٍ- (بخارى، مسلم، نسائى)

যে লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাত করিবে যে, তাহার মুখমন্ডল মাংসহীন হইয়া যাইবে।

এইভাবে বিশ্বমানবের একমাত্র বন্ধু ও কল্যাণ ব্যবস্থাপক হযরত নবী করীম (স) তাঁহার সাহাবাদের মন-মস্তিস্ক ও চিন্তাধারায়—তথা স্বভাবে ও প্রকৃতিতে—আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। ফলে ইসলামী সমাজের লোকগণ সর্বহারা হওয়া সত্ত্বেও কখনো ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই।

ভিক্ষাবৃত্তি তো দূরের কথা, সাহাবায়ে কিরাম কাহারো নিকট কিছু চাওয়া পর্যন্ত অপমানকর মনে করিতেন। নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মহান আদর্শের ভিত্তিতে অতি সহজেই তাহাদের জীবনে এইরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সেজন্য কাহারো উপর কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি বা শাস্তি প্রয়োগ করিতে হয় নাই! কিন্তু ইংলন্ডের ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের ব্যাপারে মানুষের উপর যে অমানুষিক জুলুম ও পীড়ন চালানো হইয়াছিল, পাশবিকতার দিক দিয়া তাহার কোনই তুলনা পাওয়া যায় না। ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরী কর্মক্ষম ভিক্ষকদের জন্য কর্মের সংস্থান না করিয়া তাহাদিগকে মোটরের পিছনে উলঙ্গ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া বিদ্যুৎগতিতে মোটর চালাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। কখনো কখনো ভিক্ষুকদের চাবুক মারিতেও বলা হইত।[১] ১৫৪৭ সনে আইনের বলে ভিক্ষুকদের উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে

১. ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড, ১৩৪ পৃঃ।

বড়লোকদের দাসানুদাস বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক সময় তাহাদিগকে শিকল দিয়া বাধিয়াও রাখা হইত। কিন্তু ইসলামের অর্থনীতি ভিক্ষুক সমস্যার সমাধান করিয়াছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। একদিকে ভিক্ষা কার্য হইতে মানুষকে বিরত রাখিবার জন্য নিষেধ বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে, অপরদিকে উপার্জনে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাদের জন্য কর্মসংস্থানের অনুকূলে ব্যাপক চেষ্টা চালানো হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলামী সমাজে বেকার সমস্যার সমাধান করা গরীব-দুঃখীদের দুর্দশা ও অভাব দূর করা এবং মুহাজিরদের পূণর্বাসন প্রভৃতি সমস্যাবলীর সমাধান করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। হযরত নবী করীম (স) এর আদেশ অনুসরণ করিলে ইহা অতি সহজেই কার্যকর হওয়া সম্ভব।

## শ্রম, শ্রমিক ও মজুরী সমস্যা

উপরে একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিপুল নৈসর্গিক উপাদান এবং মূলধন একক ও বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কোন কল্যাণই করিতে পারে না, মানুষের ব্যবহারোপযোগী কোন পণ্যও কেহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না—যতক্ষণ না উহার সহিত মানুষের শ্রমের যোগ হইবে। কিন্তু যেখানেই শ্রম ও মূলধনের যোগ হয়, সেখানেই শ্রম, শ্রমিক ও মূলধনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দিক দিয়া এবং শ্রমের অধিকার ও মজুরী এবং মূলধন ও পুঁজি-মালিকের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিরাট বিরাট সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। শিল্পোৎপাদন যেহেতু মানব সমাজের একটি মৌলিক প্রয়োজন, সেই জন্যই এই ব্যাপারে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে মানব সমাজের পক্ষে ইহা এক মারাত্মক সমস্যা হইয়া দেখা দেয়। এইরূপ সমস্যা এক একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিকে পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারে। তাই, পুঁজিবাদী সমাজে যে সমস্যা মানুষকে তিল তিল করিয়া নিঃশেষে ধ্বংস করে, আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সমস্যার সমাধান করার গাল ভরা দাবি করা সত্ত্বেও কোন সমাধান করা সম্ভব হয় না, ইসলামী অর্থনীতিই তাহার চূড়ান্ত সমাধান করিয়া দিয়াছে।

## শ্রমিকের মর্যাদা

শ্রম ও শ্রমিকের প্রথম সমস্যা হইল তাহাদের সামাজিক মর্যাদা। আধুনিক সমাজে—বর্তমানের বিজ্ঞানোজ্জ্বল শিক্ষিত সমাজেও—শ্রম করা নিতান্ত অপমানকর কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে শ্রমিকদিগকে সাধারণত কোনরূপ সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত বলিয়া মনে করা হয়। ইসলাম সর্বপ্রথম কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ ও সামাজিক বৈষম্যের উপর চরম আঘাত হানিয়াছে। ইসলাম মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধই শুধু জাগ্রত করে নাই, কার্যকরভাবে শ্রমজীবী ও মজুরদের সম্মান ও মর্যাদা সমাজক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইসলামের

দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে শ্রম এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও জীবিকা উপার্জন করা কিছুমাত্র লজ্জার ব্যপার নহে। তাহা করিলে কাহাকেও সামাজিকতার দিক দিয়া মর্যদাহীন প্রতিপন্ন হইতে হয় না। ইসলামের প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া দ্বীনি গ্রন্থাবলীতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। কুরআন মজীদ এই উপার্জনের জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিয়াছে।

## মজুরী-সমস্যা

এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক জটিল বিষয় হইতেছে শ্রমিকদের মজুরী সমস্যা এবং ইহারই সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত সর্বাগ্রে। কেননা ইহারই উপর কেবল শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাত্রা নহে, গোটা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে।

অধ্যাপক বেনহাম মজুরীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ এমন পরিমাণ অর্থকে মজুরী বলা যাইতে পারে, যাহা পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে মজুর তাহার কাজের বিনিময়ে লাভ করিয়া থাকে।

মজুরের পক্ষে এই মজুরী লাভই হইতেছে জীবন-ধারণের একমাত্র উপায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মজুরেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ঠিক মধুমক্ষিকার ন্যায়। শ্রমের নিঃশব্দ আঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের মেরুদন্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, বুকের রক্ত পানি হইয়া যায়। কিন্তু ইহার পরও যদি তাহাদের বাঁচিবার জন্য অপরিহার্য পরিমাণ মজুরী তাহারা লাভ করিতে না পারে, যদি তাহাদের কর্মক্ষমতা অপেক্ষা অধিক খাটিতে হয়, খাটিতে খাটিতে যদি তাহাদের স্বাস্থ্য চিরতরে ভাঙিয়া পড়ে, যদি কোন অঙ্গহানি ঘটে—সারা দিনের শ্রম-মেহনতের পর সন্ধ্যাকালে আশ্রয় লইবার মত—হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার মত উন্মুক্ত বায়ু সমন্বিত কোন ঘরবাড়ি যদি তাহারা না পায়, রোগব্যাধি হইলে যদি উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা না হয়, যদি তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের আর অবধি থাকে না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা স্বাধীন মানুষের মত মেরুদন্ড খাড়া করিতে ও মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে কোনদিনই সমর্থ হয় না। বস্তুত ইহাই বর্তমান দুনিয়ার শ্রমিক-মজুরদের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। এই সমস্যা কেবল পুঁজিবাদী সমাজেই বর্তমান আছে তাহা নয়, সোভিয়েত দুনিয়ার শ্রমিকদেরও ইহাই প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যাবলীর একটিও কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নাই—না সোভিয়েত দুনিয়ায়, না কোন পুঁজবাদী দেশে।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। এমন কি, অর্থনীতির দুনিয়ায় এই সমস্যাবলীর ন্যায়সঙ্গত ও স্বভাব-সম্মত সমাধান করার কৃতিত্ব একমাত্র ইসলামেরই প্রাপ্য। নবী করীম (স) এর নিম্নোদ্ধৃত হাদীসে ইসলামী সমাজে

শ্রমিকদের সঠিক মর্যাদা ও অধিকারের কথা উদাত্ত কন্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ

هُمْ اَخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اَخَاءُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَ لِيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ- (بخارى، كتاب الايمان)

তাহারা (মজুর, শ্রমিক ও অধীনস্থ বেতনভোগী কর্মচারীরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাহাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই আল্লাহ যাহাদের উপর এইরূপ দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের কর্তব্য এই যে, তাহারা যেরকম খাদ্য খাইবে তাহাদিগকে সেই রকম খাইতে দিবে, যাহা তাহারা পরিধান করিবে, তাহাদিগকে সেই ধরনের পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আর যে কাজ করা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর, সাধ্যাতীত, তাহা করিবার জন্য তাহাদিগকে কখনো বাধ্য করিবে না। আর সেই কাজ যদি তাহাদের দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়, তবে সেজন্য তাহাদের প্রয়োজন অনুপাতে সাহায্য অবশ্যই করিবে।

এই হাদীস হইতে নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ আমরা জানিতে পারিঃ

১. মালিক ও পুঁজিদার মজুর ও শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মত মনে করিবে। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেমন মৌলিক কোন পার্থক্য থাকে না এবং যেরূপ সম্পর্কও সম্বন্ধ বর্তমান থাকে বা থাকা উচিৎ, তাহাদের সহিতও অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিবে।

২. খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন-পুরণের মান মালিক ও শ্রমিকের উভয়েরই সমান-হইতে হইবে। মালিক ও পুঁজিদার নিজে যাহা খাইবে ও পরিবে, মজুর-শ্রমিককে তাহাই খাইতে পরিতে দিবার ব্যবস্থা করিবে; কিংবা অনুরূপ মানের (Standard) পরিমাণ অর্থ মজুরিস্বরুপ দান করিবে।

৩. সময় এবং কাজ উভয় দিক দিয়াই সাধ্যাতীত পরিমাণ দায়িত্ব মজুরের উপর চাপান যাইতে পারে—প্রাণান্তকর ও সাধ্যাতীত মাত্রার কিছু নয়। এমন কাজ নয় যাহাতে মজুর ও শ্রমিক শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও একাধারে মেহনত করিতে বাধ্য করা যাইতে পারেনা, যাহা করিলে শ্রমিক অক্ষম হইয়া পড়ে। বস্তুত সময় এবং মজুরী লইয়া মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও মতবৈষম্য বর্তমান পৃথিবীকে বিড়ম্বিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় বিধান ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মতাদর্শই করিতে পারে না।

৪. যে কাজ সম্পন্ন করা শ্রমিকের পক্ষে অসাধ্য, সে কাজ অকৃত থাকিয়া যাইবে, ইসলাম এমন কথা বলে না। পক্ষান্তরে, বাঁচুক কি মরুক, সে কাজ তাহার দ্বারাই করাইতে হইবে—এমন কথা ও হইতে পারে না। এমতাবস্থায় উক্ত কাজ সম্পন্ন করার

জন্য প্রয়োজনানুসারে মজুরকে সাহায্য করিতে হইবে। অধিক সময়ের প্রয়োজন হইলে দীর্ঘ সময়ের অবকাশ দিতে হইবে; অধিক মজুর শ্রমিকের সহযোগিতার প্রয়োজন হইলে তাহা দিয়াই তাহার সাহায্য করিতে হইবে।'

প্রত্যেক মজুরকে দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করিতে হইবে, তাহাও একটি কম সমস্যা নয়। নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন ধরনের কাজ উত্তম'? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেনঃ ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন কাজ—যদিও তাহা পরিমাণে কম হউক না কেন! তিনি আরো বলিয়াছিলেনঃ 'যে পরিমাণ কাজ তোমরা সহজে সম্পন্ন করিতে পার, সেই পরিমাণ কাজেরই দায়িত্ব গ্রহণ কর।

মজুরের কাজের সময় এবং উহার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপরে নবী করীম (স)-এর এই নির্দেশ মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দৈনিক একসঙ্গে যত ঘন্টা কাজ করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব, যত ঘন্টা কাজ করিলে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতার উপর কোনরূপ আঘাত পড়ে না, একজন মজুর ঠিক তত ঘন্টা এক সঙ্গে ঠিক সেই পরিমাণ কাজই করিবে, তাহার বেশী নয়।

وَيَسْتَعْمِلُهُمَا فِيْمَا يُحْسِنَانِهِ وَيُطِيقَانِهِ بِلاَضِرَارٍ بِهِمَا- (محلى، ابن حزم)

মজুরগণ যে পরিমাণ কাজ সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে, যে পরিমাণ কাজ করা তাহাদের সাধ্য ও শক্তিতে কুলাইবে, তাহাদিগকে সেই পরিমাণ কাজেই নিযুক্ত করিবে।

বর্তমানে দৈনিক ৮ ঘন্টা সময় এক সঙ্গে কাজ করার কথা কার্যকালের এক স্থায়ী মান হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হইয়া আছে। অতএব উহাকেই স্থায়ী কার্যমানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অধিক সময় (Overtime) কাজ করাইতে হইলে সেই সময়ের জন্য বাড়তি মজুরী দিতে হইবে। ইহা নবী করীম (স)-এর এই বাক্যাংশ হইতেই প্রমাণিত (فاذا كلفتمو هم فاعينو هم) তোমরা যদি তাহাদের উপর অধিক কাজ করার দায়িত্ব চাপাও, তবে সেই হিসাবে বাড়তি মজুরী দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য কর।

মজুর শ্রমিকদের দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট করার মত কোন কাজ কিছুতেই করাইবে না। অর্থনীতিবিদগণ বলেনঃ সাধারণত দেখা যায় যে, কোন স্থানে কাজের পরিমাণ অপেক্ষা মজুরীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া যায়। মজুরের পক্ষে জীবন ধারণের প্রয়োজন পরিমাণ মজুরী লাভ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। মজুর ও শ্রমজীবীদের জীবনে এইরূপ পরিস্থিতি বড়ই সংকটজনক হইয়া থাকে। কুরআন মজীদ এই সম্পর্কে বলে যে, এমতাবস্থায় মজুরদের দেশ বিদেশে আসা-যাওয়া এবং মজুরীর সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে—যেন প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তির সঠিক মূল্য লাভের অনুকূল ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে পারে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ للهِ يَجِدْفِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسِعَةً- (النساء-١٠٠)

আল্লাহর পথে যে হিজরাত করিবে, সে দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুল প্রাচুর্য লাভ করিবে।

দেশ-বিদেশে শ্রমের সন্ধানে যাতায়াত করার পথ উন্মুক্ত থাকিলে এক স্থানে অধিক মজুরের সমাবেশ হওয়া এবং অনুরূপ সংখ্যায় কর্মসংস্থান না হওয়ার দরুন মজুরী হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দূর হইতে পারে।

যদি এমতাবস্থায়ও মজুর শ্রমিকের অভাব ও দারিদ্র্য পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রকে তৎপর হইতে হইবে এবং মজুরদের প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাদের জীবন মান উন্নত করিবার জন্য যাকাত-ভান্ডারকে বিশেষভাবে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা হইতে মজুর ও শ্রমজীবী, তথা—দেশের জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। মজুরদের জন্য ইসলামের এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্যার উইলিয়াম বেভারিজ উপস্থাপিত পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক এবং নিঃসন্দেহে কল্যাণকর।

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের রিযিক ও যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীকেই জীবিকাদানের ভার, রিযিক-দাতা আল্লাহ তা'আলা নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - (هود-٦)

দুনিয়ার সকল প্রকার জীবজন্তু ও প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আল্লাহর কাজ।

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ - (بني اسرائيل-٣١)

তাহাদের জৈব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রিযিক আমিই দেই এবং পরে যাহারা আসবে তাহাদিগকেও আমিই দিব।

আর মানব সমাজে আল্লাহর তরফ হইতে এই দায়িত্ব পালনের ভার অর্পিত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের উপর। এইজন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া বলা হইয়াছেঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - (التوبة-١٠٣)

তাহাদের (ধনীদের) ধনমাল হইতে যাকাত আদায় কর। ইহা তাহাদের মন-আত্মা ও জীবনকে পবিত্র করিবে, ক্রমশঃ উন্নত ও বিকশিত করিবে।

যাকাতের সম্পদ বন্টন করা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ -

যাকাত সমাজের ধনীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং সেই সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে তাহা বন্টন করা হইবে।

বস্তুত যাকাত ইসলামী সমাজের মালিক ও পুঁজিদারদের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে একটি অন্যতম প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাহারা মজুরদের প্রতি কোন শোষণমূলক আচরণ করিলে, তাহাদিগকে ছাঁটাই বা পদচ্যুত করার ভয় দেখাইয়া কম মজুরী দিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে কিংবা কারখানা বন্ধ করিয়া মজুরদের বেকার করিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইলে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাই তাহাদের নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে ধনী ও মালিকদের উপর কর ধার্য করিবে, অন্যদিকে কারখানা যাহাতে বন্ধ না হয় ও মজুর শ্রমিকগণ বেকার হইয়া না পড়ে, তাহারও আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

মেহনতী জনতা—মেহনত দৈহিক হউক কি মানসিক—সকল প্রকার শ্রমিকদের পেট ভরা খাদ্য দিতেই হইবে। অন্যথায় তাহাদের কর্মক্ষমতা লোপ পাইবে, যোগ্যতার মান নিম্নগতি ধারণ করিবে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না। ফলে গোটাজাতি দারিদ্র্য ও অভাবের গভীর পংকে নিমজ্জিত হইবে।

## মজুর ও মালিকের সম্পর্ক

মজুর ও মালিকের মধ্যে কিরূপ সম্পর্কে হওয়া উচিত উল্লিখিত দীর্ঘ হাদীস হইতে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মালিকের সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছেঃ

هُمْ اَخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ-

মজুর শ্রমিকগণ তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনা ও সংস্থার অধীন করিয়া দিয়াছেন।

কুরআন মজিদে দুইজন নবীর একজনকে মালিক ও মুনীব এবং অন্যজনকে মজুর-শ্রমিক হিসাবে পেশ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থিত সম্পর্ক ও প্রয়োজনীয় গুণাগুণ ওজন করিয়া সকলের সমক্ষে পেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

اِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ- (القصص-٢٦)

তুমি যাহাকেই মজুর হিসাবে নিযুক্ত করিবে, তন্মধ্যে শক্তিমান ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

ইহা হইতে জানা গেল যে, ইসলামী সমাজের মজুরদের মধ্যে দুইটি গুণ অপরিহার্য। প্রথম—শক্তিমান, কর্মক্ষম ও সুদক্ষ হওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বাস পরায়ণ ও আস্থাভাজন হওয়া। মজুরদের মধ্যে এই দুইটি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান না থাকিলে কোনরূপ পণ্যোৎপাদন যে সম্ভব নয়, তাহা অতি সুস্পষ্ট কথা। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মজুরদের মধ্যে উল্লিখিত উভয় প্রকার গুণের সঞ্চার করার উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

মালিক (নবী), মজুর (নবী) কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেনঃ

وَمَا أُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى اِنْ شَاءَاللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

(القصص-٢٧)

আমি তোমার উপর কোনরূপ কঠোরতা করিতে চাহি না, কোন কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ তোমার উপর চাপাইতেও চাহি না, আল্লাহ চাহিলে তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসাবেই দেখিতে পাইবে।

অন্য কথায় ইসলামী সমাজে মালিক ও পুঁজিদারকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, জনদরদী, সততাপূর্ণ ও সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। সে মজুরকে যেমন শোষণ করিবে না, কোন দুঃসহ কষ্টকর ও সাধ্যাতীত বা স্বাস্থ্যহানিকর কাজে নির্দয়ভাবে নিযুক্ত করিবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্তকাল কাজ করিতেও বাধ্য করিবে না। অনুরূপ সে তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দিয়া অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্বের মুখে ঠেলিয়া দিয়া সমাজ-শৃংখলা চূর্ণ করিবে না।

নবী করীম (স) মজুরদের সহিত সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ।' তিনি নিজেও তাহাদের প্রতি মধুর ব্যবহার করিতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে খাদেম হিসাবে ছায়ার মত রহিয়াছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে নবী করীম(স) তাহার নিকট কোন কৈফিয়ত চাহেন নাই, কোন কাজের দরুন তাহাকে ভর্ৎসনাও করেন নাই।

## মজুর ও মালিকের সাম্য

ইসলামী অর্থনীতি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। পূর্বোল্লিখিত মূল নীতির ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে এই সাম্য পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সমাজের আমীরুল মুমিনীন বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং দেশের জনগণের সাধারণ জীবন ধারায় জীবনযাত্রার মানে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

উতবা ইবনে ফরকাদ্ আজার বাইজান (বর্তমানে রুশীয় তুর্কীস্থানে অন্তর্ভুক্ত) জয় করিয়া তথা হইতে উত্তম মিষ্টদ্রব্য আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-এর জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। এই মিষ্টদ্রব্য সকল মুহাজিরও খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে চাহিলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইহা কেবল আমীরুল মুমিনীনের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে, অন্য কাহাকেও ইহা দেওয়া হয় নাই। এই কথা শুনিয়া খলীফা উমর (রা) উতবাকে লিখিয়া পাঠাইলেনঃ 'এই মিষ্টিদ্রব্য তোমার নিজের শ্রম ও মেহনতের ফল নয়, তোমার মা-বাবার চেষ্টাও ইহাও তৈরী হয় নাই। যে বস্তু সর্বসাধারণ মুসলমান খাইতে পায় না, আমরা তাহা কিছুতেই আহার করিতে পারি না।

পরবর্তীকালে এই উতবাই কোন এক দেশের শাসনকর্তা থাকাকালে হযরত উমর (রা) কে অতি সাধারণ খাদ্য আহার করিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমিরুল মুমিনীন কি ময়দা নামক কোন বস্তু খাদ্য- হিসাবে গ্রহণ করেন না? খলীফা বলিলেন—'আমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এখানে কেহ নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ময়দা কি সব মুসলমানই খাইতে পায়'?

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসাধারণ প্রয়োজন পরিমাণ গোশত পাইত না বলিয়া খলীফাও গোশ্‌ত খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঘৃতের বদলে তৈল ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইহাতে খলীফার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ইরানের যুদ্ধে সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা বিন জররাহ্ (রা) ইরানীদের জাকজমকপূর্ণ নিমন্ত্রণ শুধু এই জন্যই প্রত্যাখান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাধারণ সৈনিকদের অনুরূপ ভোজ দেওয়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলনঃ আল্লাহর শপথ, আল্লাহর দেওয়া দ্রব্য-সামগ্রী হইতে আবূ উবায়দা কেবল সেই জিনিসই আহার করিতে পারে, যাহা সর্বসাধারণ মুসলমান খাইতে পায়।

উল্লেখযোগ্য যে, হযরত উমর (রা) দুর্ভিক্ষের সময় রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্য-বরাদ্দ করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেকেই প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিত। সেখানে কাহাকেও কালোবাজারী করিতে হইত না, গরীবদের শোষণ করিয়া ধন লুটিতে হইত না। আর ভুয়া ও অতিরিক্ত রেশন কার্ডও রাখিতে হইতে না।

ইসলামী সমাজের লোকদের মধ্যে এইরূপ সাম্য কেবল খাদ্যের ব্যাপারেই কার্যকর ছিল না, পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়াও তথায় পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হইত। এইজন্যই সেখানে কে মজুর আর কে মালিক, তাহার বিশেষ কোন ব্যাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া যাইত না। ইহা শ্রেণী-পার্থক্যের মূল কারণকে চূর্ণ করিয়াছে, কাজেই তথায় কোন দিনই শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয় নাই।

শ্রমিক ও মজুরগণ মজুরী উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যেই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের পরিবারবর্গের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য এই মজুরীই হইতেছে তাহাদের একমাত্র উপায়। কিন্তু পরিশ্রম করিয়াও যদি মজুরী না পায়, যদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায়, কিংবা নির্দিষ্ট সময়-মত প্রাপ্য না পায়, তবে মজুরের দুঃখের অবধি থাকে না। দুঃখ এবং হতাশায় তাহাদের হৃদয়-মন চূর্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের অপরিহার্য প্রয়োজন পূর্ণ না হইলে জীবন ও সমাজের প্রতি তাহাদের মন বীতশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি হওয়া এবং নিজেদের জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য জাগিয়া ওঠা স্বাভাবিক। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এই ধরনের সকল সমস্যার নির্দিষ্ট ও স্থায়ী সমাধান করিয়া দিয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করিবেন, তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছেঃ

وَرَجُلُ اِسْتَا جَرَاَجِيرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ– (بخارى، مسند احمد)

একজনকে মজুর হিসাবে খাটাইয়া ও তাহার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করিয়াও যে লোক তাহার পারিশ্রমিক আদায় করে নাই......

অপর একটি হাদীস হইতে জানা যায়, নবী করীম (স) নিজেও এই তিন জনের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হইয়া দাড়াইবেন। (ইবনে মাযাহ)

এ সম্পর্কে কেবল পরকালীন শাস্তির ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত করা হয় নাই। বরং কাজ সম্পন্ন হওয়ার বা নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মজুরের মজুরী আদায় করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্র এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করিবার জন্য সম্পূর্ণত দায়ী থাকিবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

أُعْطُوْ الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرْقُهُ– (ابن ماجه، وبيهقى)

মজুরের মজুরী তাহার গায়ের ঘাম শুষ্ক হইবার পূর্বেই আদায় কর।

অপর হাদীসের শেষ অংশ এইরূপঃ

وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوْفٰى اَجْرَهُ اِذَا قَضٰى عَمَلَهُ– (مسند احمد)

শ্রমিকের কাজ বা কাজের মেয়াদ শেষ হইলেই তাহার মজুরী পুরাপুরি আদায় করিয়া দিতে হইবে।

ইমাম শাওকানী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَالِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْاُجْرَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ وَ اَمَّا الْمِلْكُ...... اِنَّمَا تَمْلِكُ بِالْقِطْعِ– (فيه الاوتار)

এই হাদীসে এ কথার দলীল রহিয়াছে যে, মজুরী পাওয়ার অধিকার জন্মে কাজ করা সম্পন্ন হইয়া গেলে এবং মালিকানা নির্দিষ্ট হয় সরকারী বিলি-বন্টনের সাহায্যে।

শ্রমিক ও (কারখানা) মালিকদের মধ্যে দৈনন্দিন যেসব ঝগড়া-বিবাদ হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ হয় মজুরী লইয়া। এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরকে কাজে নিযুক্ত করার পূর্বেই তাহার মজুরী নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রমিক-মজুরের মজুরী দানের ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর নীতি ছিল স্পষ্ট। হাদীসে বলা হইয়াছে।

وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ– (بخاري عن انس رض)

নবী করীম (স) মজুর-শ্রমিকের মজুরী দানের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম করিতেন না, জুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ اِسْتِجَارَةِ الْاَجِيْرِ حَتّٰى بَيَّنَ لَهُ اَجْرُهُ- (بيهقى، كتاب السنن)

মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করিয়া তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِذَا اسْتَأْ اجَرْتَ اَجِيْرًا فَاعْلِمْهُ اَجْرَهُ- (نسائى)

তুমি যখন কোন মজুর নিয়োগ করিবে তখন তাহাকে তাহার মজুরী কত হইবে অবশ্যই জানাইয়া দিবে।

বস্তুত এই সব মূলনীতির ভিত্তিতেই আজিকার শ্রমিক-মালিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে মধুর ও সুবিচারপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

## শ্রমিকদের অধিকার

মজুর-শ্রমিকদের শ্রমের বদলে শুধু মজুরী পাইবার অধিকারীই নয়, তাহাদের নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণের অধিকারও ইসলামে স্বীকৃত। নবী করীম (স)-এর হাদীস হইতে ইহা প্রমাণিত। তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا- (بخارى و غيره)

তোমার নিজের উপর তোমার একটা অধিকার আছে। তোমার দেহের একটা অধিকার আছে তোমার উপর, তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে তোমার উপর, তোমার চক্ষুরও অধিকার রহিয়াছে তোমার উপর।

এই অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করিতে বাধ্য প্রত্যকটি মানুষ। শ্রমিকরাও মানুষ। অতএব তাহারা যাহাতে এই অধিকারগুলির সঠিকভাবে আদায় করিতে পারে, পারে এই দায়িত্বসমূহ পুরাপুরিভাবে পালন করিতে, সমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকিতেই হইবে। কাজেই শ্রমিক-মজুরদের জন্য ছুটি ও অবসর যাপনের যথেষ্ট সময় থাকিতে হইবে, যেন তাহারা এই অধিকারসমূহ যথারীতি আদায় করিতে সক্ষম হয়। যে শ্রমনীতি শ্রমিকদের জন্য এইরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে না, তাহা ইসলামী অর্থনীতি-সম্মত নীতি হইতে পারে না। উহাকে মানুষের উপযোগী অর্থনীতিও মনে করা যায় না।

## শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে কোন কাজে শ্রমিক নিযুক্ত হইলে কাজ বা কাজের নির্দিষ্ট মেয়াদ পরিসমাপ্তির পর যেমন সেই পূর্ব-নির্ধারিত মজুরী পাওয়ার শ্রমিকের অধিকার রহিয়াছে এবং শ্রমের মালিকের যেমন তাহা যথারীতি আদায় করিয়া দেওয়া কর্তব্য, অনুরূপভাবে শ্রমিকের উপরও এই ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে।

এই পর্যায়ে শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল, তাহাকে বিশেষ আন্তরিকতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় পুরাপুরি কাজের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত করিতে হইবে। কাজে অমনোযোগিতা বা উপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন কিংবা কাজ না করিয়া যেন–তেন প্রকার নির্দিষ্ট সময় কাটাইয়া দেওয়া ইসলামের শ্রম-আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এইরূপ করা হইলে তাহাতে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হইবে এবং এজন্য তাহাকে আল্লাহর নিকট দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। কেননা সে যখন একটি কাজের জন্য দায়িত্বশীল হইয়াছে, তখন সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিতেই তাহার প্রতি এই আশা পোষণ করা হয় যে, সে পূর্ণ সততা ও বিশ্বাসপারায়ণতা সহকারে শ্রম করিবে ও দায়িত্ব পালন করিবে। এই কাজের জন্য তাহাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট জাওয়াবদিহি করিতে হইবে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– (النحل–٩٤)

এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছিলে সে বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করিব।

নবী করীম (স) এইজন্য উত্তমভাবে কাজ সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন এবং মূল কাজ কোনরূপ ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ اِذَا عَمَلَ اَنْ يُّحْسِنَ– (بيهقى)

শিল্পী-মজুর যখন কাজ করিবে তখন সে উত্তমভাবে কাজ করিবে, আল্লাহ তা'আলা ইহাই ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

অপর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يَّتْقِنَهُ– (بيهقى)

তোমাদের কেহ যখন কোন শ্রমের কাজ করিবে তখন তাহা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করিবে, ইহাই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, শ্রমিকের কাজ অনুপাতে সেই কাজে আল্লাহর সাহায্য বর্ষিত হইয়া থাকে। লিখিয়াছেনঃ

فَكُلُّ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ اَكْمَلَ وَ اَتْقَنَ فَالْحَسَنَاتُ تَضَاعَفُ لَهُ اَكْثَرَ–

(السراج المنير ج ١٠–ص ٢٣)

যাহার কাজ পূর্ণাঙ্গ, উত্তম, নিখুঁত ও মজবুত হইবে তাহার নেকী কয়েক গুণ বেশী হইবে।

এই প্রসঙ্গে কাজে 'সাবোটাজ' করার ব্যাপারটিও উল্লেখ্য। শ্রমিক অনেক সময় কাজ করিতে করিতে মূল কাজের বা কাজের যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। অনেক শ্রমিক এইভাবে মালিকের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে উদ্ধত হয়। কিন্তু নৈতিকতা ও জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিতে ইহার মত মারাত্মক কাজ আর কিছু হইতে পারে না। কুরআনের ভাষায় ইহাকে খিয়ানত বলা হইয়াছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا– (النسا–١٠٧)

যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে—অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে—আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না।

নবী করীম (স) এই ধরনের খিয়ানতকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতারণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। বলিয়াছেনঃ

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا– (مسلم، ابن ماجه)

যে লোক আমার সহিত ধোঁকাবাজী করিবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হইবে না।

এইসব কারণে শিল্প-কাখানায় এই ধরনের কাজের প্রতিরোধ করা সরকারী দায়িত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এইরূপ কাজ যে করিবে তাহাকে কঠোর শাস্তি দানেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ– (بخارى، مسلم)

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। কর্মচারী তাহার মনিবের মালের জন্য দায়িত্বশীল এবং সেজন্য তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

অতএব শ্রমিক যদি ইচ্ছাপূর্বক কাজ নষ্ট করে অথবা কাজের যন্ত্রপাতি বিকল বা বিনষ্ট করে তাহা হইলে সেজন্য তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে। অবশ্য তাহার পূর্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হইতে হইবে যে, সে ইচ্ছা করিয়াই এই কাজ করিয়াছে এবং ইহার মাধ্যমে শিল্পের মালিককে

ক্ষতিগ্রস্ত করা বা মূল শিল্পকেই বিনষ্ট করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ইসলামী ফিক্‌হার কিতাবে মূলনীতি স্বরূপ বলা হইয়াছেঃ

اَلضَّــرَارُ يُدْفَعُ بِقَــدْرِ الْاِمْكَانِ- (احكام العمل وحقوق العمال -ص ٢٦)

ক্ষতি যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও পূরণ হইতে হইবে।

আর যদি ক্ষতি ও বিনষ্ট হওয়ার মূলে শ্রমিকের নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অসদুদ্দেশ্য প্রসূত চেষ্টা না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

## পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সরকারী হস্তক্ষেপ

শ্রমিক ও কারখানা মালিকের মধ্যে কোন ব্যাপারে মত-বৈষম্য ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে উহার মীমাংসার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রহিয়াছে। শুধু অধিকারই নয়, রাষ্ট্র সরকারের তাহা অন্যতম কর্তব্যও। মজুর-শ্রমিকের উপর কোন প্রকার অযথা বাড়াবাড়ি করা, মজুরী কম দেওয়া, অধিক কাজের চাপ দেওয়া, কিংবা শ্রমিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া, দায়িত্ব পালন না করা বা কম কাজ করিয়া বেশী মজুরী লওয়ার চেষ্টা করা প্রভৃতি যে সমস্যাই হউক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাহাতে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া বিবাদ-মীমাংসা করিয়া দিবে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী লোকদের পারস্পরিক সকল প্রকার বিবাদ মীমাংসা করার সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা এবং প্রত্যেকেরই হক যথাযথরূপে আদায় করিয়া দেওয়াই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্তব্য।

মালিকের বিরুদ্ধে মজুরের সাধারণত দুই প্রকার অভিযোগ হইতে পারে, মজুরী কম দেওয়ার অভিযোগ বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাধ্যাতীত কাজের চাপ দেওয়ার অভিযোগ। ইসলামী অর্থনীতি এই উভয় প্রকার অভিযোগই দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথম প্রকার অভিযোগ দূর করিয়া নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لِلْمَلُوْكِ طَعَـامُـهُ وَكِـسْـوَتُـهُ بِالْمَـعْـرُوْفِ- (موطا مالك، مسلم)

মজুর-শ্রমিক-ভৃত্যদিগকে যথারীত খাদ্য ও পোশাক দিতে হইবে।

মনে রাখা দরকার যে, এখানে নির্দিষ্টভাবে শুধু খাদ্য ও পোশাকই লক্ষ্য নয়—মূল লক্ষ্য হইতেছে মজুরের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত 'যথারীতি' শব্দটির অর্থ হইতেছে, যে পরিমাণ মজুরীর দ্বারা অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয় সেই পরিমাণ এবং দেশের সাধারণ জীবন মান রক্ষার হয় যে পরিমাণ মজুরীতে সেই পরিমাণ। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (স) তাঁহার কর্মচারী ও শ্রমিকদের মজুরী দানের ব্যাপারে এই তারতম্য করিতেন যে, পরিবার বহনকারীকে দ্বিগুণ দিতেন এবং পারিবারিক দায়িত্বমুক্ত ব্যক্তিকে একগুণ। (বুখারী, আবূ উবাইদ)

মজুর ও কর্মচারীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যদি ন্যায্য ও সুবিচারপূর্ণ ভাবে নির্ধারিত পরিমাণ মজুরী অপেক্ষা বেশী দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তাহাও সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক পক্ষ দিতে বাধ্য হইবে, এমন কথা জোর দিয়া বলা যায় না। তবে ইহা লাভ করার যে তাহার অধিকার আছে এবং এই অধিকার পরিপূরণে রাষ্ট্র সরকারই যে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রকার অভিযোগ দূর করিয়া নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ الَّا مَا يُطِيْقُ- (موطا امام مالك، مسلم)

তাহাদের উপর অতখানি কাজেরই চাপ দেওয়া যাইতে পারে, যতখানি তাহার সামর্থে কুলায়; সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না।

অপর হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يُغْلِبُهُ- (ترمذى)

শ্রমিককে এমন কাজ করিতে বাধ্য করা যাইবে না যাহা তাহাকে উহার দুঃসাধ্যতার কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানাইয়া দিবে।

এই কারণে মজুর-শ্রমিকদের বিশ্রাম গ্রহণ করার অধিকার অনস্বীকার্য। অতএব এই অধিকার আদায় করার জন্য মজুর-শ্রমিকরা যথেষ্ট ছুটি ও বিশ্রামের সুযোগ পাইবার অধিকারী। ইবাদাতের কাজের অবসর পাওয়ার অধিকারও ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

## সরকারী নিয়ন্ত্রণ

শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসা করা যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য, শ্রমিক ও মালিক—প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিতেছে কিনা, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখাও ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

আবূ মাসউদ (রা) নামক এক সাহাবী একদা তাঁহার ক্রীতদাসকে প্রহার করিতেছিলেন। পশ্চাদ্দিক হইতে সহসা আওয়াজ উঠিলঃ 'হে আবূ মাসউদ জানিয়া রাখ, আল্লাহ তোমার অপেক্ষাও শক্তিমান। আবূ মাসউদ মুখ ফিরাইয়া নবী করীম (স) কে দেখিতে পাইলেন। তখনি বলিলেনঃ 'আমি এই দাসকে মুক্ত করিয়া দিলাম। নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি যদি ইহা না করিতে তাহা হইলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিত।

হযরত উমর ফারূক (রা) প্রত্যেক শনিবার মদীনার নিকটে ও দূরবর্তী অঞ্চলে ঘুরিয়া লোকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হইতে চেষ্টা করিতেন। কোথায়ও কোন মজুর-দাসকে নির্যাতিত হইতে দেখিলে কিংবা কোন প্রাণান্তকর শ্রমে নিযুক্ত দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেন।[১]

১. তারীখ-ই তাবারী

অতএব ভৃত্য, দাস-মজুর কাহারো উপর জুলুম, শোষণ, পীড়ন হইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ তাহাতে সরাসরি ও অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবে, ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

হযরত উমর ফারূক (রা) এক জিম্মিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেনঃ 'এক ব্যক্তির যৌবনকালে তাহাদ্বারা (ট্যাক্স, কাজ ইত্যাদি দিক দিয়া) উপকৃত হওয়ার পর তাহার বার্ধক্য অবস্থায় তাহাকে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।' ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোন শ্রমিক বা কর্মচারী যদি বার্ধক্য বা অপর কোন কারণে কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তবে তাহাকে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া সুস্পষ্ট রূপে জুলুম। বরং এইরূপ অবস্থায় ভরণ পোষণ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ 'পেনশানের' ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

মজুর-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও ইসলামী হুকুমাতের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। নবী করীম (স) নিজে ভৃত্য-কর্মচারীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, কেহ অসুস্থ্য বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহার খিলাফতের বিভিন্ন বিভাগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত অফিসারগণ তাঁহাদের কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিয়াছেন কিনা, তাহা জনসাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন। এমন কি অসুস্থ্য কর্মচারীদের শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিনা, তাহাও তিনি জানিতে চাহিতেন। কোন অফিসার তাহার এই কর্তব্যে অবহেলা করিতেছেন জানিতে পারিলে তাহাকে পদচ্যুত করিতেন। হযরত উমর (রা) সৈনিকদের জন্য চিকিৎসকও নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

## মুনাফা ও শিল্পপণ্যে মজুরের অংশ

উল্লিখিত অধিকার ছাড়াও ইসলামী অর্থনীতি মজুর শ্রমিককে শিল্পোৎপাদনে, উৎপন্ন শিল্পপণ্যে এবং উহার মুনাফার অংশীদার হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। বস্তুত মালিক-মজুর সমস্যা সমাধানের ইহা একটি অন্যতম প্রধান উপায়। সম্ভবত মালিক-মজুরের দ্বন্দ্ব সমাধানে ইহাপেক্ষা অধিক সাফল্যপূর্ণ ও কার্যকর পন্থা আর কিছুই হইতে পারে না। শিল্পোৎপাদনে যে বাড়তি মূল্য লাভ হয়, পুঁজিবাদী-সমাজে একমাত্র মালিকই তাহা নিরংকুশভাবে করায়ত্ত ও ভোগ করিয়া থাকে। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রই কাড়িয়া নেয় কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির এই পন্থার উদ্দেশ্য হইতেছে, বাড়তি মূল্যকে মজুর ও মালিক উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া উভয়কেই শিল্পপণ্য হইতে ইনসাফের ভিত্তিতে লাভবান হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক মজুরকে মূল ব্যবসায়ের মুনাফা এবং শিল্পপণ্যে অংশীদাররূপে স্বীকার করিয়া লইবার অবকাশ রহিয়াছে তাহাই নয়, নবী করীম (স)-এর একটি হাদীস স্পষ্টভাবে ইহারই নির্দেশ পাওয়া যায়।

اِذَا كَفَا اَحَدَ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيَهْ خُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَا خُذْلُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ اِيَّاهَا- (ترمذى)

তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য করিয়া লইয়া আসে তখন তাহাকে হাতে ধরিয়া নিজের সঙ্গে বসাও, সে যদি বসিতে অস্বীকার করে তবু দুই-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাহাকে অবশ্যই খাইতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করিয়াছে।

অন্য একটি হাদীসের শেষাংশে ইহার কারণ বলা হইয়াছে—'সে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আন্তরিক যত্ন গ্রহণ করিয়াছে।'[১]

একটি হাদীস খাদেমকে তাহার রান্না করা খাবার খাওয়ায় শরীক করিবার জন্য নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২]

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

أُعْطُوا الْعَمِلَ مِنْ عَمَلِهٖ فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهِ لَايُخَيْبُ-

শ্রমিককে তাহার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হইতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যাইতে পার না।

এই হাদীসসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক-মজুরকে তাহার মজুরী ছাড়াও ব্যবসায়ের মূল মুনাফা এবং উৎপন্ন দ্রব্যেও অংশীদার করিতে হইবে।

বস্তুত শ্রমিক-মজুরদিগকে লভ্যাংশ দান এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ দেওয়ার নীতি যদি কার্যকর করা যায় তাহা হইলে বর্তমান কালের সর্ব প্রকারের জটিল শ্রমিক–সমস্যার অতি সহজেই সমাধান হইতে পার। ইহার ফলে মজুরদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মশীলতা এবং শ্রম ও পণ্যোৎপাদনের ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। আর্থিক লাভ ছাড়াও জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধির দিক দিয়া ইহার মূল্য কোন অংশেই কম নয়। শ্রমিক ও মজুর যখন নিঃসন্দেহে জানিতে পারিবে যে, মূল ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা হইতেও তাহাকে অংশ দেওয়া হইবে, তখন তাহার কর্মপ্রেরণা শ্রমে

---

১. এই পর্যায়ের হাদীসসমূহের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

فى هذا الحديث الحث على مكارم الاخلاق والمواساة فى الطعام لاسيما فى حق من صنعه اوحمله لانه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته- (النووى وتحفة الاحودى)

এই হাদীসে শ্রমিকদের প্রতি উত্তম ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের—বিশেষ করিয়া তাহার ব্যাপারে, যে লোক উহা প্রস্তুত করিয়াছে কিংবা উহা বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার প্রতি উৎসাহ দান করা হইয়াছে। কেননা সে এইজন্য আগুনের উত্তাপ ও ধুয়া-জ্বালা সহ্য করিয়াছে, উহার সহিত তাহার মন সম্পর্কিত হইয়াছে এবং সে উহার গন্ধ লইয়াছে।

২. تحفة الاحوذ شرح الترمذى

উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিশেষ সর্তকতার সহিত ব্যবহার করিবে। ফলে মূল লাভ হইতে মজুরকে যে পরিমাণ অংশ দেওয়া হইবে তাহার এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তিত ভাবধারার দরুণ মূল শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ ততোধিক বর্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে শিল্প-মালিকও এই ব্যবস্থায় নিজের সমূহ ক্ষতি মনে করিবে না। শ্রমিকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ কায়িক ও মানসিক সহযোগিতা লাভ করায় তাহারও মনোবল বৃদ্ধি পাইবে। পরিণামে শিল্প ও শ্রম-ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক নির্মল পবিত্র ফল্গুধারার সৃষ্টি হইবে।

উক্ত আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১. মজুর-শ্রমিকদিগকে এমন পরিমাণ মজুরী দিতে হইবে, যাহা তাহাদের কেবল জীবন রক্ষা করার পক্ষেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের স্বাস্থ্য ও দেহের শক্তি এবং সজীবতাও তাহা দ্বারা যথাযথরূপে রক্ষিত হইবে। এইজন্য তাহাদের নিম্নতম ব্যয়-হিসাবে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

২, বসবাসের জন্য তাহাদের ঘরবাড়ি স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন একটি পরিবার সংশ্লিষ্ট সকল লোকজনসহ তাহাদের হাত-পা ছড়াইয়া তথায় বসবাস করিতে পারে।

৩. মজুরদের স্বাস্থ্য-ভংগকারী কোন কাজ তাহাদের দ্বারা করানো যাইতে পারে না। একাধারে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও কাজ করানো যাইতে পারে না, যাহার ফলে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে, তাহাদের কর্মদক্ষতা বিলুপ্ত হইতে পারে। উপরন্তু মানবিকতার দৃষ্টিতে কাজের সময় নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতে বিশ্রামের যথেষ্ট অবকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪. শ্রমিক-মজুরদের কাজে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে তাহাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার ও পাশবিক নির্যাতন করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। বরং যথাসম্ভব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করাই কর্তব্য হইবে।

৫. কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তাহারা বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাদের জন্য 'পেনশন'-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর কর্মচ্যুত করিবার প্রয়োজন হইলেও এমনভাবে তাহাদিগকে বেকার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না, যাহার ফলে তাহাদিগকে অনশনের সম্মুখীন হইতে হয় বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। অতএব অকারণ ছাঁটাই করাও চলিবে না।

৬. মজুর-শ্রমিকদিগকে বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পারিমাণের বিনিময়ে কাজ করিতে জবরদস্তিভাবে বাধ্য করা যাইতে পারে না। বরং তাহাদের কাজ বাছাই করার এবং মজুরীর পরিমাণ লইয়া দরকষাকষি (Bargaining) করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার থাকিতে হইবে। আর মজুরীও পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে।

৭. কাজ সম্পন্ন হইলেই কিংবা নির্দিষ্ট মাস-পক্ষ-সপ্তাহ অতীত হইলেই অনতিবিলম্বে মজুরী বা বেতন আদায় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোন রূপ উপেক্ষা বা গাফিলতি; কিংবা টালবাহানা করা চলিবে না।

৮. মজুর-শ্রমিকদের এবং তাহাদের সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করা করাখানা-মালিকের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য হইবে।

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক-মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হইয়াছে এবং মূল শিল্পে এই উভয় পক্ষের স্বার্থ ও লক্ষ্যকে যেভাবে একীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এখানে শ্রমিক ও মালিকের মনে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অবকাশ থাকিতে পারে না। বরং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভই স্বাভাবিক। এখানে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার এবং মালিক পক্ষের লক-আউট ঘোষণা করার কোন প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না।

## সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে পার্থক্য

সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা

প্রসঙ্গত এখানের উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতি মজুর শ্রমিকদিগকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকারও দেয়, সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দান করে, জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ করা এবং সরকারী অব্যবস্থার সমালোচনা করারও পূর্ণ অধিকার দেয়, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের ছায়ার তলে শ্রমিকদের জীবন বড়ই দুঃসহ, তাহাদের অবস্থা অতিশয় মর্মান্তিক। সেখানে মজুর-শ্রমিক ও চাষীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ গ্রহণ করার কোন অধিকারও তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। কেহ তাহা করিলে—২৬শে জুন ১৯৪০ সনের গৃহীত একটি আইন অনুযারী—তাহাকে চার মাসের কারদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সামরিক রেলওয়ে এবং পানি-সরবরাহকারী বিভাগসমূহের মজুরগণ বিনা অনুমতিতে কাজ পরিবর্তন করিলে তাহাকে পাঁচ হইতে আট বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া যাইতে পারে। কোন মজুর যদি একমাসে তিনবার কিংবা দুইমাসে চার বার কাজে ২০ মিনিট সময় দেরী করিয়া আসে, তবে উপরোক্ত আইনের বলে তাহাকে সেই স্থানেই ছয়মাস কালের শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হয় এবং এক চতুর্থাংশ বেতন কাটিয়া লওয়া হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার মজুরগণ সরকারের হস্তে নিষ্প্রাণ কাঁচামালের মতই ব্যবহৃত হয়। সেখানে মজুরের বাসস্থানের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সরকারের ইচ্ছামতই যেখানে সেখানে মজুরকে বদলি করা হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কাজে নিযুক্ত হইতে মজুরকে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু এইরূপ রাষ্ট্রের নির্মম অক্টোপাসে বাধা কলুর বলদ—মজুর-শ্রমিকগণ—সেখানে কিরূপ মজুরী পাইয়া থাকে? ইহার উত্তরে শোনা যায়ঃ অনেক, তুলনাহীন এবং তাহা

হইতেছে দুই-দুইশ, চার-চারশ রুবল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন মজুর হয়ত মাত্র ৬০.১ রুবলেরও কম এবং অন্য একজন ১১০,০.১ রুবলেরও বেশী বেতন পাইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই রুবলের আন্তর্জাতিক মূল্য বাংলাদেশী টাকার অপেক্ষাও অনেক কম। আর দেশের অভ্যন্তরে উহার ক্রয়-ক্ষমতা আরো অনেক কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রশিয়ার একজন মজুরকে এক কিলোগ্রাম [২.২] পরিমাণ মাখন খরিদ করার জন্য যেখানে ২৩ ঘন্টা ২৩ মিনিটের অর্থাৎ তিন দিনের শ্রমোপার্জিত অর্থের আবশ্যক, সেখানে একজন ইংরেজ মজুর মাত্র এক ঘন্টা ১৩ মিনিটের মজুরী দ্বারাই অত পরিমান মাখন খরিদ করিতে পারে।[১]

## বাধ্যতামূলক শ্রম

এতদ্ব্যতীত বাধ্যতামূলক শ্রম (Forced Labour System) প্রথা রাশিয়ার জনগণের জীবনে এক মারাত্মক অভিশাপ হইয়া দেখা দিয়াছে। দাসশ্রমের এই প্রথা রাশিয়ার যাবতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক কমিউনিস্ট সমাজেরই ইহা অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া রহিয়াছে। যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি মিলন জিলাস তাঁহার The New Class নামক বইতে লিখিয়াছেন, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই বাধ্যতামূলক দাসশ্রম ব্যবস্থা। (১০৬ পৃঃ) তিনি আরো লিখিয়াছেনঃ সমাজতন্ত্রে যে নূতন শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা শ্রমিক ও কৃষক উভয়েরই রক্ত শোষণ করিয়া।

স্বরণীয় যে, এই বই লেখার অপরাধে গ্রন্থকারকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকিতে হইয়াছিল। বস্তুত এই প্রথা ব্যতীত রাশিয়ার কোন পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত কার্যকর হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার পাশ্চাতে যে রাজনৈতিক কার্যকারণ রহিয়াছে, তাহা আরো মারাত্মক।

রাশিয়ার হাটে-বাজারে দাস ক্রয়-বিক্রয় হয় না একথা ঠিক, কিন্তু সেখানে যে বিশাল বিরাট জেল ও সুপ্রশস্ত Concentration camps মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে কয়েদীগণ মধ্যযুগের ক্রীতদাসদের অপেক্ষাও মর্মান্তিক অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। এই সব ক্যাম্পের একচেটিয়া ঠিকাদার হইতেছে ক্রেমলিন। ইহা অতীত কালের সকল 'আড়তদার' কে খতম করিয়া মানুষকে শ্রম করিতে বাধ্য করার এই লাভজনক ব্যবসায়ের আড়তদারির উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে। এই ঠিকাদার দাস-শ্রমিকদিগকে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে না এ কথা সত্য; কিন্তু উহা প্রাদেশিক সরকার এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঠিকা-হিসাবে শ্রমিক সরবরাহ করিয়া করে। সেখানে এই দাস-শ্রমিকগণ রুটি-কাপড়ের বিনিময়ে সরকারী পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর থাকে। ১৯৪১ সনের বাজেটের ছয় শত কোটি রুবল অর্থোৎপাদনের দায়িত্ব দাস-শ্রমিক পরিবারের পরিচালক রাশিয়ার গোস্টাপ পুলিশ

১. Sovie Trade Union by Maurice Dobb

বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়। এই পরিমাণ অর্থ হইল সেখানকার মোট বাজেটের শতকরা চৌদ্দ ভাগ। এই সময় এই শিবিরে ২৫-৩৫ লক্ষ লোক দাস-শ্রমিক হিসাবেই কাজ করিতেছিল।

এই সব ক্যাম্পের অধিবাসী দাস-শ্রমিকগণ বাধ্যতামূলক শ্রম হইতে কোনমতেই রেহাই পাইতে পারে না। অসুস্থ হইলেও তাহাকে কাজ করিতে হয় ঠিক জন্তু জানোয়ারের মত। অন্যদিকে তাহাদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন পুরণের খাতে যথাসম্ভব কম খরচ করা হয়। এই ভাবে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা লাভ করার সর্বাত্মক পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণ করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়া। সেখান মনুষ্যত্বকে চিরদিনের তরে কবর দিয়া চলিয়াছে পণ্যোৎপাদনের যন্ত্র-দানব।

রাশিয়ার রক্ত বিপ্লব মানুষকে যে কোন্ মহা সম্পদ দান করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বুঝা গেল না। বস্তুত যে শ্রমিক শোষণের মর্মান্তিক বিবরণ দিয়া রাশিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করা হইল জার শাসিত রাশিয়ায়,তাহাতে প্রাচীন জারের পতন হইলেও নির্মম জারতন্ত্রের অবসান তো হয়-ই নায়,বরং পূর্বের তুলনায় উহা আরো কঠিন ও কঠোর হইয়া দাড়াইয়াছে। দুনিয়ার অন্যান্য পুঁজিবাদী সমাজে তাহার বহু কারণ বর্তমান থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইসলামী সমাজে তাহার কোন কারণই কোথায়ও থাকিতে পারে না। তথায় শ্রমিকদের শোষণ করার, বঞ্চিত করার কোন উপায়ই বর্তমান থাকা সম্ভবপর নয়। মজুরগণ ইসলামী সমাজে দাস-শ্রমিক নয়—স্বাধীন মর্যদাসম্পন্ন ও স্বেচ্ছাপূর্ণ দেশকর্মী নাগরিক, দেশের সম্পদ উৎপাদনকারী শীক্তমান বাহু। ইসলামী সমাজের মজুর-শ্রমিককে নিঃস্ব সর্বস্ব হইয়া থাকিতে হয় না, উৎপাদন উপায় ও উৎপাদন যন্ত্রের উপর তাহারও মালিকানা অধিকার থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, সে যে জিনিসের মালিক স্বীকৃত হইবে, উপযুক্ত কোন কারণ ব্যতীত তাহা তাহার নিকট হইতে হরণ করার অধিকার সমাজ তথা রাষ্ট্র কাহারো নাই। উপরন্তু ইসলামী সমাজের মজুর পেটের দায়ে ক্ষুধার জ্বালায় পড়িয়া পুঁজিমালিকের ইচ্ছামত কোন শ্রম করিতে ও উহার বিনিময়ে মালিক পক্ষের ইচ্ছামূলকভাবে নির্দিষ্ট করা মজুরী গ্রহণ করিতে এবং নিজের শ্রমশক্তি কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় না। ইসলামী অর্থনীতিই মানুষকে—মজুর-শ্রমিক ও জনগণকে—ইসলামী বিধানের অধীন পূর্ণ-স্বাধীনতা দান করে, যাহা দুনিয়ার আর কোন সমাজ-বিধানে লক্ষ্য করা যায় না, তাহা অন্য কোথাও সম্ভবও নয়।

## কমিউনিস্ট চীন

কমিউনিস্ট চীনে মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা আরো মর্মান্তিক। ভারতীয় শ্রমিক নেতা ব্রজকিশোর শাস্ত্রী সরকারী আমন্ত্রণে চীন সফর করিয়া তথাকার শ্রমিকদের চরম দুর্দশা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ

> এখানে আমরা হাল চাষে গরু-মহিষের পরিবর্তে মেয়েলোকদিগকে লাঙ্গল টানিতে দেখিয়াছি।.......... সে দৃশ্য কতই না মর্মন্তুদ, কতই না শিক্ষাপ্রদ.......... গরু-মহিষের স্থান গ্রহণ করিয়াছে নারী!

নির্মীয়মাণ একটি প্রোজেক্টে নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

এই প্রেজেক্টের নিকটেই অফিসারদের বসবাসের জন্য বাংলো নির্মিত হইয়াছে। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করে। সব রকমের কাজ পাথর ভাঙ্গা হইতে শুরু করিয়া সুরঙ্গ খোদাই কিংবা বড় বড় পাথর স্থানান্তর পর্যন্ত সব কাজই শ্রমিকদিগকে খোলা হাতে সম্পন্ন করিতে হয়। শ্রমিকরা এখানে যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করে তাহা অীত মাত্রায় দুর্বল ও নিম্নমানের। মনে হয়, যাদুঘর হইতে এইগুলি তুলিয়া আনা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন, চীনের এই নিরীহ শ্রমিকদের দুর্দশা দেখিয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ জাগিল। মানুষ যাহাই হউক মানুষ, জন্তু বা জানোয়ার নয়। কিন্তু এখানে তাহাদিগকে ঠিক জন্তুর মতই কাজ করিতে হয়। একটি দেশের উন্নয়নে মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের মত শ্রম করিতে বাধ্য করা শুধু জুলুমই নয়, মনুষ্যত্বের চরম অপমানও বটে।

তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ শ্রমিকদিগকে বহু দূরবর্তী স্থান হইতে আমাদানী করা হইয়াছে এবং তাহারা ইচ্ছামত এক জায়গার কাজ ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে শ্রমের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার অধিকারও তাহাদের নাই।

তিনি বলেন চীনা-কমিউনিষ্ট পার্টি ও চেয়ারম্যান মাওসেতুং রাশিয়ার বাধ্যতামূলক শ্রমের ন্যায় পরীক্ষিত মানব-ধ্বংসকারী পন্থাকে ব্যবহার করিতেছেন।

চীনা শ্রমিকরা এইরূপ অমানুষিক শ্রম করিয়া কি পরিমাণ মজুরী লাভ করে? ইহা একটি প্রশ্ন বটে। কিন্তু জওয়াব খুবই নৈরাশ্যজনক। চীনের এইরূপ পশুবৎ খাটুনীদাতা শ্রমিকরা যে পরিমাণ মজুরী পায় তাহা বাংলাদেশ পাকিস্তান ও ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরীর তুলনায় অনেক নিম্নমানের। একজন শ্রমিক সেখানে একহাজার হইতে পনর শত 'ইয়ান' (yuan) কিংবা পঞ্চাশ ইউনিট মজুরী পাইয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক, এক 'ইয়ান' বাংলাদেশের আধপয়সারও সমান নয়। এক ইউনিট বলিতে আট আনা কিংবা তাহার কিছু বেশী বুঝায়। আর 'পঞ্চাশ ইউনিট' বলিতে বাংলাদেশের ২৫-২৬ টাকার সমান হইয়া থাকে।[১]

কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ অর্থ লইয়া যখন তাহারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করে, তখন তাহারা আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রজকিশোর শাস্ত্রী বলিয়াছেন ঃ

'চীনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম ভারতের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। চাউল, কাপড়, তৈল ও লবণের মূল্য ভারতের তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী। অন্যান্য জিনিসের উচ্চমূল্য তো ধারণাতীত। (দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'দাওয়াত' পত্রিকা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫সন)। চীনে 'সরকারী শিল্প ও কারখানায় শ্রমিকদের কর্ম বিধান'

১. বাংলাদেশের শ্রমিকদের কথা না বলাই ভালো।

পর্যায়ে শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যেসব আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহার মূল দৃষ্টিকোণ হইলঃ

শ্রমিকদিগদের সামষ্টিক দর-কষাকষি কিংবা সংগঠন করার আজাদী ভোগের কোন অধিকার নাই। নিয়ম ও শৃংখলা মানিয়া শ্রম করিয়া যাওয়াই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য।

বস্তুত এইরূপ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে শ্রমিকদের জন্য যে বিধান রচিত হইবে ও তাহাদিগকে যেসব অধিকার দেওয়া হইবে, তাহা যে শ্রমিকদের প্রকৃতই কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বিধানে মোট চব্বিশটি ধারা সংযোজিত হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঃ

যেসব শ্রমিকের নিকট সরকারী রিপোর্ট নাই, তাহাদিগকে কাজে নিয়াগ করা বে-আইনী।

আর সরকারী রিপোর্টে সে কোথায় কাজ করিয়াছে,তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তাহার সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্ট কি ইত্যাদি লিখিত থাকে।

এই বিধানের তৃতীয় ধারায় বলা হইয়াছেঃ

মজুরীর জন্য দর-কষাকষি করা চলিবে না। বরং প্রত্যেকটি কাজেরই মজুরী নির্ধারিত মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে।

চতুর্থ ধারায় লিখিত হইয়াছে ঃ

কোন শ্রমিক বা আমলার কর্মচারী ম্যানেজার অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার মঞ্জুরী ব্যতীত কাজ ত্যাগ করিতে পারে না। তাহাকে স্থানান্তরে বদলীও করা যাইতে পারে না ইহা মানিয়া কাজ করা না হইলে সংগঠন ও বিধান-রীতির বিরুদ্ধতা করা হইবে।

ইহার ৫ম ধারায় বর্ণিত বাধ্যতামূলক আইনটি হইলঃ

কোন শ্রমিককে তাহার মর্জী না লইয়া স্থানান্তরে পাঠান যাইতে পারে না। কিন্তু এই বিধানের বিরুদ্ধতা করা হইলে শ্রমিক শুধু ট্রেড ইউনিয়নের নিকট অভিযোগ করিতে পারিবে, তাহার অধিক কিছু করার তাহার অধিকার নাই।

আর ৮ম ধারায় শ্রমিকদের কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে ঃ

শ্রমিকরা কারখানার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব গোপন তথ্য সংরক্ষিত করিবে। সরকারী মালের হিফাযত করিবে ও প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময় নিজ নিজ কাজ সম্পূর্ণ করিয়া লইবে।

কাজের সময় সম্পর্কে কয়েকটি ধারা সংযোজিত হইয়াছে। যেমনঃ কাজের সময় নির্ধারণের পূর্ণ ইখতিয়ার কেবল কারখানার ব্যবস্থাপকদেরই থাকিবে। কারখানায় প্রবেশকালে ও নির্গমনের সময় প্রত্যেক শ্রমিকের তল্লাসী লওয়া হইবে।

'শ্রমিক রাজত্বের' এই সব আইন ও বিধান সম্পর্কে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে সমাজে শ্রমকেই আসল কার্যকরণ (Factor) মনে করা হয়, সেখানে স্বয়ং শ্রমিকদের মানবিক অধিকার বলিতে কিছুই নাই। তাহারা কাজ করিবার সময় কোন কথা বলিতে পারে না। কোন সামাজিক কাজের জন্য শ্রম বন্ধ করিতে পারে না। সামাজিক অনুষ্ঠানে জন্য কোন সভাও করিতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধতা করা হইলে অপরাধী হইবে ও বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হইবে। এক কথায় তাহারা সেখানে সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত, নিছক কয়েদী জীবন-যাপনে একান্তভাবে বাধ্য।

## বাড়তি মূল্য ও ইসলামী অর্থনীতি

উপরের আলোচনা হইতে এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রমই সম্পদ উৎপাদন করে না, মূলধন এবং আরো অনেক কিছু সম্পদ উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মার্কসের মতে একমাত্র শ্রমই মূল্যোৎপাদন করিয়া থাকে।[১] তাঁহার মতে পণ্যদ্রব্যের সঠিক বিনিময়-মূল্য এবং বিক্রয় দামের (Selling Price) মধ্যে যে ব্যবধান থাকিয়া যায়, তাহাই হইতেছে 'বাড়তি মূল্য' (Surplas value) আর পুঁজিদার ইহাই অর্জন করে মজুরের প্রাপ্য কাড়িয়া লইয়া। এই বাড়তি মূল্যই (Surplus Value) হইতেছে পুঁজিবাদের ভিত্তিমূল—ইহাই পুঁজিদার সৃষ্টি করে, মানব-সমাজকে সর্বহারা শ্রমিক ও পুঁজিদার—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে। শেষ পর্যন্ত ইহা হইতেই শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং শ্রেণী সংগ্রাম মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সুস্থ সমাজকে চূর্ণ করে।

মার্কসের এই অভিযোগ মূলতঃই পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে এবং এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা নিরংকুশ ও ধন-সম্পদের উপর শংকাহীন কর্তৃত্ব ভোগ করার অপ্রতিরোধ্য অধিকার থাকে। অপরকে বঞ্চিত করিয়া শোষণ করিয়া যতকিছু সম্পত্তি করায়ত্ত করা হয়, ব্যক্তি তাহারই একমাত্র মালিক হইয়া বসে। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত ধন-সম্পদ ও যাবতীয় উৎপাদন উপায়ের উপর একমাত্র রাষ্ট্রের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় বলিয়া সাধারণ মানুষের বেলায় পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ অভিন্ন হইয়া দাড়ায়। এই উভয় সমাজই শোষণমূলক। পুঁজিবাদী সমাজে বাড়তি মূল্য পুঁজিদার নিয়া নেয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাহা কি রাষ্ট্রের একচেটিয়া দখলে চলিয়া যায়না? কিন্তু ইসলামী সমাজে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার কিছু মাত্র অবকাশ থাকে না।

প্রথমতঃ ইসলামী সমাজে সম্পদ-উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেখানে কেহ ভোগ-সম্ভোগের জন্য, বিলাসিতা ও জাঁক-জমকের জন্য ধন উৎপাদন করে না, করে জনগণের সার্বিক প্রয়োজন পুরণের জন্য, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, যেন তাহা নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কাজেই শোষণ আর বঞ্চনা করার কোন চেষ্টাই সেখানে কেহ করিতে পারে না।

১. Labour can make value- মার্কসের একটি প্রসিদ্ধ কথা।

দ্বিতীয়তঃ মজুর শ্রমিকদের জীবিকা-নির্বাহের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার উপযোগী মজুরী দেওয়া, মজুরদের প্রতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অন্যান্য কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পরও পুঁজিমালিক ও কারখানা মালিক যাহা কিছু লাভ করিবে, তাহা দ্বারা সে নিজের ভোগ বিলাসিতা ও সুখ-শয্যের আয়াজন করিতে পারিবে না। জোঁকের মত অর্থ শোষণ করিয়া সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভাবন করিতে পারিবে না। কাজেই সেখানে অর্থ সম্পদের উপর আমানতদারী অর্থে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হইলেও তাহা মানুষের পক্ষে কোনক্রমই মারাত্ম হইতে পারে না। বরং তাহাতে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রেরই কল্যাণ সাধিত হওয়া অবধারিত।

তৃতীয়তঃ ইসলামী সমাজে সম্পদ-উৎপাদনের ব্যপারে মজুর-শ্রমিক ও মালিক পুঁজিদারদের পরস্পরের মধ্য কোনরূপ শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় না, পন্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত হয়। কুরআন মজীদে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতীয় কল্যাণমূলক প্রত্যেকটি কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ- (المائده-٢)

তোমরা সৎ ও পরহেজগারীমূলক সকল কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর, পাপ ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতামূলক কোন কাজেই তোমরা কেহ কাহারো সহযোগিতা করিও না।[১]

কাজেই ইসলামী সমাজের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই মজুর-শ্রমিক এবং মালিক ও পুঁজিদারদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় না, কেহ কাহাকেও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে না। বরং সেখানে সকলেই মানুষের সঠিক কল্যাণ-সাধন, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন এবং সকলে মিলিয়া এক আল্লাহ্‌র হুকুমত কায়েম করার ব্যাপারে পরস্পরকে বন্ধু, সহযোগী ও সহকর্মী বলিয়া মনে করে। আর এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইহাতে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থানুসারে প্রত্যেকেই অংশ গ্রহণ করে। ইসলামী অর্থনীতির মূল ভাবধারা হইতেছে পরিপূর্ণ সহযোগিতা এবং সামঞ্জস্য বিধান; হিংসা, বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়।

মার্কসের মতে ধনিকদের 'বাড়তি মূল্য' লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে তিনটি শর্ত পূরণ করিতে হয়। তাহা হইতেছে শ্রমিকদের বেতন কম করা, শ্রমিকদের কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত পণ্যেৎপাদন করিয়া লওয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অত্যাধিক মূল্য গ্রহণ করা। কিন্তু ইসলামী শিল্পনীতিতে এইরূপ কোন শর্ত কিছুতেই কার্যকর হইতে পারে না। কাজেই ইসলামী সমাজে অনুরূপ শর্তের ফলে বাড়তি মূল্য লাভ করিয়া শোষণের পাহাড় সৃষ্টি করা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

এই কারণে ইসলামী সমাজে সীমাবদ্ধ পরিমাণ মুনাফা লাভ করার অবকাশ থাকা সমাজের পক্ষে কোন দিক দিয়াই ক্ষতিকর হইতে পারে না।

১. আয়াতটি ইসলামী সমাজের সমগ্র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রযোজ্য হইবে।

## যান্ত্রিক উৎপাদন ও ইসলামী অর্থনীতি

প্রত্যেক সমাজে প্রচলিত স্থানীয় উৎপাদন-ব্যবস্থায় নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রয়োগ অর্থনীতির দৃষ্টিতে একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া দেখা দেয়। ইসলামী অর্থনীতি এই সমস্যার যে সমাধান পেশ করিয়াছে, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

প্রত্যেকে দেশেই শিল্পপণ্য ও খাদ্য-উৎপাদনের জন্য একটি বিশেষ 'যন্ত্র' ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই যন্ত্র যেরূপ হয়, অনুরূপ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের জীবিকার্জন সেই বিশেষ যন্ত্র ব্যবহারের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। কাজেই কোন দেশের উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তন হইলে সে দেশে মারাত্মক বেকার সমস্যা দেখা দেওয়া অবধারিত হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে দেশে হাতে-গড়া লাঙ্গল দ্বারা ভূমিচাষ হয়, সে দেশে এই লাঙ্গল চাষের যোগ্য লোকেরাই ভূমিচাষ করিয়া জীবিকার্জন করিতে পারে এবং এই লাঙ্গল চাষ হইতে খাদ্য গ্রহণের উপর কৃষিজীবী অসংখ্য মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ একটি দেশে সহসা যদি লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বারা ভূমিকর্ষণ শুরু করা হয়, তাহা হইলে দেশের বিপুল সংখ্যক লাঙ্গলচাষি বেকার হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি লোক অনশনের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে যে দেশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্ত্র তাঁত হইতে উৎপন্ন হয়, সহসা সে দেশে ব্যাপকভাবে কাপড়ের মিল হইতে বস্ত্র উৎপাদন শুরু করিলে দেশের সকল তাঁতীই বেকার হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ যে দিন হইতে পৃথিবীতে যন্ত্রসভ্যতার সূচনা হইয়াছে, সে দিন হইতেই এই যন্ত্র-দানব কত মানুষকে যে বেকার করিয়াছে, অসহায়ত্বের সর্বস্বান্তকারী গহবরে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অভাব ও দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত করিয়াছে, তাহার ইয়াত্তা নাই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি উৎপাদন যন্ত্রের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে—যাহার দরুণ দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী বেকার হইয়া পড়িতে পারে—কিছুতেই অনুমতি দিবেনা যতক্ষণ না উহার অনুকুল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর একটি সিদ্ধান্ত উক্ত দাবির স্বপক্ষে আকাট্য যুক্তি হিসাবে পেশ করা যায়। এক ব্যক্তি মদীনা শহরে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক ঘোড়া পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল এবং সে জন্য খলীফার নিকট আস্তাবল নির্মাণ করার অনুমতি চাহিয়াছিল। হযরত উমর ফারুক (রা) একটি শর্তে ইহার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং সে শর্তটি এই ছিল যে, তাহার এই ঘোড়ার জন্য খাদ্য মদীনার বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্যথায় মদীনার বর্তমান জন্তুগুলির খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার পূর্ণ সম্ভবনা রহিয়াছে এবং তাহার ফলে অসংখ্য দরিদ্র লোক ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে।[১] বস্তুত ঃ যে সরকার ও যে সমাজ জন্তুর খাদ্য-সমস্যার প্রতি এত সতর্ক দৃষ্টি রাখিত, সে সমাজের মানুষের জীবনে যে কোনরূপ খাদ্য-সমস্যা দেখা দিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্য এ কথায় আর কোনই সন্দেহ থাকে না যে, হযরত উমরের যুগে আধুনিক উৎপাদন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে এবং একটি যন্ত্রের অসংখ্য মানুষ-শ্রমিককে বেকার করিয়া দেওয়ার কথা জানিতে পারিলে, তিনি ঠিক তখনই উহা ব্যবহারের অনুমতি দিতেন, যখন বেকার লোকদের অপরিহার্য রুজীর কোন না কোন ব্যবস্থা করা

১. তারিখ-ই তাবীর দ্রষ্টব্য।

সুসম্পন্ন হইত। ফলে একদিকে দেশবাসীর রুজীর নিরাপত্তা দানে যন্ত্র-মালিকদের নিকট হইতে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিতেন, অপরদিকে যন্ত্র-মালিকও ভ্রাতৃত্ব-বোধের দরুন আন্তরিক নিষ্ঠার সহিতই এই কাজের সহযোগিতা করিত।

## যন্ত্র-শিল্পের সমস্যা ও উহার সমাধান

বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের জীবনে যে বিরাট ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই যে, ইহার দরুন একদিকে গার্হস্থ্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোৎপাদন ধ্বংস হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবন শোষণমূলক শ্রমনীতির আঘাতে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকদের দৈনিক কমপক্ষে আটঘন্টা করিয়া হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে বাধ্যকরা হইতেছে; কিন্তু তাহাদের এত কমপরিমাণে মজুরী দেওয়া হইতেছে যে, তাহাদ্বারা তাহাদের নিম্নতম মৌলিক প্রয়োজনও কোনক্রমে পূর্ণ হইতে পারে না।

এই সমস্যার আসু সমাধান অপরিহার্য। বিশেষতঃ এক একটি দেশকে যখন নূতনভাবে শিল্পায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন পূর্ব হইতেই এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ধারণা লইয়া অগ্রসর হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আমার মতে বৃহদায়তন যান্ত্রিক উৎপাদনের উল্লিখিত সমস্যার প্রাথমিক সমাধান একটি উপায়ে হইতে পারে।

প্রথম এই যে, শিল্পায়নের ফলে দেশের কত লোকের জীবন ও জীবিকা বিপদগ্রস্থ হইতেছে, সেদিকে সরকারকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিল্পপতিকে কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া গেলেও দেশের কোটি কোটি লোককে জীবিকা হইতে বঞ্চিত করিয়া শুধু তাহারই খরিদ্দারে পরিণত করার কোনই অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। তাউ আইনের সাহায্যে জীবিকা বঞ্চিত সমস্ত লোককে কারখানার কার্যে নিযুক্ত করার জন্য কারখানা মালিককে বাধ্য করিতে হইবে। আমার মতে কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য বর্তমান কার্য সময় দৈনিক ৮ ঘন্টা হইতে কমাইয়া মাত্র ৪ ঘন্টা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে কারখানায় এক লক্ষ মজুর দৈনিক আট ঘন্টা করিয়া কাজ করে, দৈনিক চার ঘন্টা কার্যের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইলে সেখানে দুই লক্ষ মজুর কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। ইহার ফলে প্রত্যেক কারখানায় দ্বিগুন মজুরের প্রয়োজন হওয়ায় বেকার সমস্যা অনেকখানি সমাধান হইয়া যাইবে, মজুরদের কার্য সময় কম হওয়ায় তাহাদের স্বাস্থ্য বর্তমানের ন্যায় নষ্ট হইব না এবং শ্রমিকদের নিম্নতম প্রয়োজন পুরণ ভিত্তিক মজুরী দেওয়া বাদ্যতামূলক করা হইলে পুঁজি মালিকের নিকট হইতে জাতীয় অর্থ বিস্তারলাভ করিয়া প্রকৃত অভাবী ও প্রয়োজনশীল লোকদের হাতে পৌঁছিতে শুরু করিবে।

বস্তুত এইরূপ ব্যবস্থা হইলে তাহা দ্বারা শুধু জনগণ ও মজুরগণই উপকৃত হইবে না, তাহার ফলে কারখানা মালিক ও গোটা মানবতাই বিশেষভাবে উপকৃত হইবে এবং বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীর অসংখ্য প্রকার জটিলতা ও অর্থনৈতিক সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

# ভূমি-ব্যবস্থা

## ইসলামী অর্থনীতিতে জমির গুরুত্ব

মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য—খাদ্য ও শিল্পপণ্যের কাঁচা মাল—জমি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে—তাই মানুষের জীবনে জমির নানাবিধ ও অপরিসীম গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

ভূমির গুরুত্ব কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ হইতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ-

(الاعراف ١٠)

আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তাহাতেই তোমাদের জন্য জীবিকা-নির্বাহের যাবতীয় উপাদান সৃষ্টি করিয়াছি।....

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

هُوَالَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ-

(ملك- ١٥)

আল্লাহ্ তা'আলাই জমিকে তোমাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য নম্র ও অনুকূল (চাষযোগ্য ও উৎপাদনী শক্তিপূর্ণ) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমরা উহার বিভিন্ন পথে চলাফিরা (শ্রম) করিয়া জীবিকা উপার্জন কর এবং তাহা হইতে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক গ্রহণ কর।

সূরা 'আল-বাকারা'র একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-

(البقره -٢٦٧)

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের সদুপায়ে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় কর: এবং তোমাদিগকে জমি হইতে আমি যাহা কিছু উৎপাদন করিয়া দেই, তাহা হইতেও (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ কর।

প্রথমোল্লিখিত আয়াত হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই দুনিয়ায় বসবাস করিবার সুযোগ দিয়াছেন এবং এই পার্থিব জীবন সুষ্ঠুরূপে যাপন করার জন্য অপরিহার্য জীবিকার ব্যবস্থাও তিনি এই পৃথিবীতেই করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় আয়াত হইতে সুস্পষ্টরূপে এই তথ্য জানিতে পারা যাইতেছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রধানতঃ এই পৃথিবীর ভূমি হইতে লাভ করিতে হইবে। এই ভূমি হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করিবার জন্য উহার ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইতে হইবে এবং যে যে উপায়ে তাহা হইতে জীবিকা সংগ্রহ করা সম্ভব, সেই সেই উপায়ে তাহা হইতে ফসল ও দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করিতে হইবে, এই বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও গবেষণা চালাইতে হইবে। মাটির পরতে-পরতে জীবিকার যে অশেষ সম্ভাবনাময় গোপন ভান্ডার লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

শেষোক্ত আয়াতে বিশেষ করিয়া ঈমানদার লোকদের জন্য ভূমি-ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক নির্দেশ উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, ঈমানদার লোকগণ সাধারণভাবে যাহা কিছু উপার্জন করিবে, তাহাকে অবশ্যই পবিত্র, নির্মল এবং সকল নিষিদ্ধ উপায়-মুক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়, তাহার উপর এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন জীবিকার উপর একদিকে সৃষ্টিকর্তার এবং অন্য দিকে সৃষ্ট মানুষের অধিকার রহিয়াছে। এই উভয় প্রকারের অধিকার যথাযথরূপে আদায় করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য এবং তৃতীয় এই যে, এইভাবে তাহারা যাহা কিছুই উপার্জন করিবে, সীমিত মালিকানা কর্তৃত্ব সহকারে তাহা ভোগ ও ব্যবহার করারও তাহাদের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

## জমির মালিকানা

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা এবং একচ্ছত্র মালিক। কিন্তু তাহার এই মালিকানা যে তাঁহার নিজের ভোগ-ব্যবহারের জন্য নয়, তাহা সর্বজনবিদিত। আল্লাহ্ তা'আলা নিখিল বিশ্বভূবনকে নিজ ইচ্ছায় ও নিজ শক্তির বলেই সৃষ্টি করিয়াছেন: কিন্তু সৃষ্ট জগতের এই অফুরন্ত দ্রব্য-সামগ্রীর কোন একটিও আল্লাহ্র ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দরকার হয় না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে, কোন অভাব ও আবশ্যকতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার সীমাহীন নিরংকুশ ক্ষমতা কেহ সংকুচিত করিতে সক্ষম নয়। বস্তুত তিনি এই সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য—মানুষেরই ভোগ-ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব নিখিল জাহানের সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ এবং মানুষের ভোগ-ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়নের নিরংকুশ অধিকার প্রয়োগের দিক-দিয়াই আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত ও কার্যকর হইবে। আর এইজন্যই মানুষ আল্লাহ্র দেওয়া বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথিবী ভোগ ও ব্যবহার করিয়াছে কিনা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার চূড়ান্ত ও পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করিবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে একক

এবং অংশীদারহীন। বস্তুত আল্লাহ্‌র তাওহীদী মালিকানার প্রকৃত অর্থ ইহাই। এই কথাই ঘোষণা করা হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى- (طه- ٥٠)

সেই আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতঃপর উহার ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য বিধান ও ব্যবস্থাও দান করিয়াছেন।

সমগ্র পৃথিবী এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য, মানুষেরই কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا- (البقره-٢٩)

জমি ও পৃথিবীর বুকে যাহা কিছু রহিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা সবই—হে মানুষ, তোমাদেরই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এই জমি ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা উক্ত আয়াত হইতে নিঃসন্দেহে জানিতে পারি। মানুষ উহা কিভাবে করায়ত্ত করিবে এবং কোন্ নীত ও নিয়মে তাহা ভোগ ও ব্যবহার করিবে, তাহার মূলনীতিও আল্লাহ তা'আলাই দান করিয়াছেন। কুরআন মজীদের সূরা আ'রাফের নিম্নলিখিত আয়াতে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه (الاعراف-١٣٧)

জমি আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁহার বান্দাহ্দের মধ্য হইতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকার দান করেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তাঁহারই বিরচিত নিয়মের মূল কথা। অতএব পৃথিবীর ও ভূমির প্রকৃত মালিক আল্লাহ নিজে হইলেও উহার উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী মানুষেরই জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন উৎপাদক শক্তি ও দ্রব্য-সম্পদ উপার্জন করিবে, করায়ত্ত করিবে এবং ভোগ ও ব্যবহার করিবে। ইহাই হইতেছে আল্লাহর 'মালিকানা'র অধীন মানুষের 'মালিকানা"র ব্যবহারিক তাৎপর্য। আল্লাহ্‌র মালিকানা সম্পর্কে এই মৌলিক আলোচনার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে,

اَلْاَرْضُ لِلّٰهِ (পৃথিবী আল্লাহ্‌র) (الرحمن - ١٠) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (পৃথিবীকে আল্লাহ সমগ্র জীবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (البقره - ٢٠٥)- 'আকাশ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই আল্লাহ্‌র—প্রভৃতি আয়াত হইতে 'জাতীয় মালিকানা'র মার্কসীয় মতবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা এবং "জমির মালিক আল্লাহ্—কোন ব্যক্তি নয়" বলিয়া দেশের যাবতীয়

জমিক্ষেত রাষ্ট্রের—আর প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাসীন মুষ্টিমেয় শাসন-কর্তৃপক্ষের নিরংকুশ কর্তৃত্বে সমর্পণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি। তদুপরি এই ভুল নীতিকে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-হিসাবে পেশ করা ইসলামের উপর কুঠারাঘাত ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মানব-সমাজে অর্থনীতির দিক দিয়া ভূমির যতখানি গুরুত্ব রহিয়াছে, উহার ভোগ ও ব্যবহারের নিয়াম-নীতি-নির্ধারণ করার ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ ততখানি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায়, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ—অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা-অধিকার দান করা হইয়াছিল; জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের হর্তাকর্তা ছিল তাহারা নিজেরাই। রাষ্ট্র বা দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ—কাহারোই কোন অধিকার তাহাতে স্বীকৃত ছিল না। জমির মালিক—জায়গীরদারগণ—কৃষক চাষীদিগকে অল্প-অল্প জমি চাষ করিবার জন্য দিত, চাষীরা তাহাতে যে যে ফসল ফলাইত তাহার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জমির মালিক জায়গীরদারকে এবং গির্জাকে আদায় করিয়া দিত। নিজেদের ভাগে খুব কম অংশই অবশিষ্ট থাকিত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিল ভূমিদাস আর জায়গীরদারগণ ছিল তাহাদের প্রভু ও মালিক। অতঃপর ইউরোপের ভূমি-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন ভূমির কৃষি-প্রণালীতে নতুন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় এবং উহার ফলে কৃষি-উৎপন্ন ফসল পূর্বাপেক্ষা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ইহা দেখিয়া সেকালের বড়বড় পুঁজিমালিকগণ স্বাভাবিকভাবেই ভূমি দখল করিতে শুরু করে। কৃষি-ব্যবস্থায় এই মৌলিক পরিবর্তনের কারণে ছোট-ছোট ভূমিচাষীগণ কৃষিক্ষেত হইতে উৎখাত হইতে আরম্ভ করে। তাহাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমি জমিদারগণ ক্রয় করিয়া কিংবা বলপূর্বক দখল করিয়া করায়ত্ত করিতে শুরু করে এবং বিরাট আকারে জমি চাষ করিয়া তাহা হইতে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিতে থাকে। ক্ষুদ্র কৃষকগণ জমি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া শিল্পায়িত শহরের দিকে ধাবিত হয়, বেকার শ্রমিক হিসাবে শিল্প-কারখানার সম্মুখে আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। ভূমির এই সামন্তবাদী-ব্যবস্থায় সমাজের ভূমিহীন মানুষ তথা বিরাট সমাজকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থকে ভূমির উপর হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

এই পুঁজিবাদী ভূমি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দিয়াছে সমাজতান্ত্রিক ভূমি-নীতি। ইহার মূল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, জমির মালিকানা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, সমগ্র সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হইবে রাষ্ট্র। দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে পরিশ্রম করিয়া কেবলমাত্র কাজ করিয়াই রুজীরোজগার করিতে হইবে। ইহাতে জমির মালিকানা হইতে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের দাসানুদাসে পরিণত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু এই উভয় প্রকার ভূমি ব্যবস্থাই অস্বাভাবিক, অমানুষিক ও বঞ্চনামূলক। প্রথম প্রকার ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়, নিপীড়িত এবং শোষিতও।...... আর সত্য কথা এই যে, মনুষ্যত্ব ও মানবতা এই উভয় ধরনের সমাজ হইতে একেবারে নির্বাসিত।

ব্যক্তিকে ভূমির একচ্ছত্র মালিক করিয়া দেওয়ার জায়গীরদারী-জমিদারী ব্যবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও মর্মান্তিক। অনুরূপভাবে ব্যক্তির অধিকার হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া একান্তভাবে রাষ্ট্রের নিরংকুশ কর্তৃত্বে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার রুশীয় ও চীনা অভিজ্ঞতা আরো অধিক অমানুষিক ও হৃদয়বিদারক। এই কারণে ইসলাম এই উভয় প্রকার ভূমি নীতিকেই অস্বীকার করিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ভূমির মালিক হইতে পারে যদিও নিরংকুশ মালিকানা সে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ ভূমির উপর সমাজ ও সমষ্টির অধিকারও ইসলাম স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহাও সীমাহীন ও সর্বগ্রাসী নয়, নয় ব্যক্তি-স্বার্থবিরোধী। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ভূমিনীতির দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী পথ দিয়া চলিয়াছে ইসলামের ভূমিনীতি। ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন ও সীমাবদ্ধ ইখতিয়ারের পরিবেশে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়াছে। তাহাতে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার-জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনামূলক নীতি গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। কৃষক-চাষীকে ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইবারও অধিকার রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় নাই। ইসলামের ভূমিনীতিতে চাষযোগ্য জমি প্রধানতঃ নাগরিকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ব্যক্তি তাহা চাষাবাদ করিবে, উহার উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অংশ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা সে রীতিমত জাতীয় বায়তুলমাল-এ আদায় করিতে থাকিবে। কোন ভূমিমালিক নিজে জমি চাষ করিতে সমর্থ না হইলে বা করিতে না চাহিলে সে তাহা অন্য একজনের দ্বারা চাষ করাইবে। কারণ 'লাঙল যাহার, জমি তাহার' দাবি ইসলামী অর্থনীতির নয়, এই দাবি বা মূলনীতি ঘোষিত হইয়াছে একমাত্র মার্কসীয় দর্শনে এবং চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায়। (যদিও কার্যতঃ তাহাও শ্লোগানমাত্র, যাহার বাস্তব রূপ কোথাও দেখা যায় না।) কাজেই জমির মালিক হওয়ার জন্য বা ভোগাধিকার লাভ করার জন্য প্রত্যেককেই নিজের হাতে চাষ করিতে হইবে—ইসলামী অর্থনীতি এমন কোন শর্ত আরোপ করে নাই।

কিন্তু দেশের সমস্ত জমিই যদি ব্যক্তির মালিকানা ও ভোগাধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় কাজ ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূর্ণ করা নানাভাবে ব্যাহত হইতে পারে। এইজন্য ইসলামী অর্থনীতি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেও জমিক্ষেত রাখিবার অনুমতি দিয়াছে, যেন প্রয়োজনের সময় দেশের ভূমিহীন লোকদের মধ্যে তাহা বন্টন করা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য রাষ্ট্রীয় নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্তৃত্বাধীন জায়গা-জমি থাকিতে পারে—থাকা আবশ্যক। এই সব জমিকে মসজিদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সরকারী অফিসাদির স্থান, চারণভূমি, পার্ক, রাজপথ, পানিপথ, রেললাইন, সাধারণ ক্রীড়ার স্থান এবং জলাশয় প্রভৃতির জমি ইসলামী হুকুমতে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। এই সব জমির উপর কোন নাগরিকেরই ব্যক্তিগত নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহাতে দেশের প্রত্যেকটি নাগিরকের ব্যবহারাধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হইবে।

কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, নবী করীম (স)-এর নিজস্ব কার্যক্রম এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের ভূমিনীতি হইতে আমরা এই তত্ত্বই জানিতে পারি।[১]

## ভূমির ভোগাধিকার লাভের ইসলামী নীতি

ইসলামের ভূমি-নীতিতে জমির মালিকানা লাভ ও ভোগ দখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আবাদ ও মালিকানাধীন জমি। কেহ না কেহ উহা আবাদ করিয়া উহাতে বসবাস কিংবা কৃষিকাজ ইত্যাদি কোন-না-কোন উপায়ে উহা ভোগ দখল করিতেছে। এই জমি উহার মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমিকে অপর কেহ ভোগ ব্যবহার করিতে কিংবা উহার কোন অংশ দখল করিতে পারিবে না। তবে রাষ্ট্র ও জাতির বৃহত্তর কোন কল্যাণের প্রশ্ন উঠিলে তখন ব্যাপারটি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ কাহারো মালিকানাভুক্ত জমি হওয়া সত্ত্বেও উহা অনাবাদি পড়িয়া রহিয়াছে। উহাতে পানি সেচ করা হয় না, আগাছা-পরগাছা বা জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় না, চাষাবাদ করা হয় না, উহা বসবাসের কাজেও ব্যবহার করা হয় না।

এই জমিও মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। মালিক উহা অন্যান্য জমির ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবে এবং উহাতে উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হইবে।

তৃতীয়ত ঃ জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট জমি। এক গ্রামবাসীর গৃহপালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি কিংবা কাষ্ঠ আহরণ ক্ষেত্র অথবা মসজিদ, ঈদগাহ বা কবরস্থান প্রভৃতি সার্বজনীন কাজের জন্য নির্দিষ্ট জমি এই পর্যায়ে গণ্য।

কোন এক ব্যক্তি এই জমির মালিক হইবে না; বরং ইহা ব্যবহার করার ও ইহা হইতে উপকৃত হওয়ার অধিকার সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

---

১. শাহ অলীউল্লাহ দিহলভী লিখিয়াছেন ঃ

الاصل فيه ما اوما نا ان الكل مال الله ليس فيه حق لاحد نى الحقيقة لكن الله تعالى لما اباح لهم الانتفاع بالارض وما فيها وقعت المشاحة نكان الحكيم حينئذ ان لا يهيج احد مما سبق اليه من غير مضاراة (حجة الله البالغةج ١ص ١٠٢) والارض كلها فى الحقيقة بمنزلة مسجد اوربا ط (حجة الله البالغه)

'পূর্বে' যেমন বলিয়াছি, সমস্ত ধনসম্পদই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মালিকানা। উহাতে প্রকৃত পক্ষেই কোন মানুষের কোন অধিকার নাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন উহা হইতে জনগণের উপকৃত হওয়ার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন তখন উহাতে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ফলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা এই করা হয় যে, উহাতে অধিকার প্রয়োগ করিতে গিয়া অপর কাহারো ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।"

'বস্তুতঃ সমস্ত জমিক্ষেতই মসজিদ কিংবা মুসাফিরখানার মত সকল মানুষের সমান অধিকারের জিনিস।

চতুর্থতঃ অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি। উহার কোন মালিক নাই, উহা কেহই ভোগদখল করিতেছে না। এই পর্যায়ের জমি-জায়গাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় الصوات। 'আল মওয়াত' বলা হয়। এই জমির পরিচয় দান প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেনঃ

هِيَ اَرْضٌ خَارِجُ الْبَلَدِ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لِاَحَدٍ وَلَا حَقًّا لَهُ خَاصًّا

ইহা জনপদের বাহিরে অবস্থিত এমন জমি, যাহার কেহই মালিক নাই, উহার উপর কাহারো একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হইবে না।

যে জমিতে সাধারণ মানুষে জন্য প্রয়োজনীয় কোন পদার্থের খনি থাকিবে, উহাতেও সর্বসাধারণের ভোগাধিকার স্বীকৃত হইবে, যতক্ষণ না কাহাকেও বিশেষভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

অনাবাদী জমি আবাদ করার অর্থ হইলঃ জমিতে বন-জঙ্গল ও আগাছা পরগাছা থাকিলে উহা কাটিয়া সাফ করা, পানি না থাকিলে উহাতে কিংবা পানিতে ডুবিয়া থাকিলে উহা হইতে পানি সিঞ্চন করা, উহাতে চাষাবাদ করা ও ফসল ফলানো; কিংবা উহাতে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা; অথবা উহাকে যে কোন প্রকারে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা।

আল্লামা মাওয়ার্দী লিখিয়াছেনঃ জমি আবাদ করার ব্যাপারটি দেশ চলতি প্রথা অনুযায়ীই স্বীকৃত হইবে। কেননা নবী করীম (স) তাঁহার বাণীতে এ জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করেন নাই। উহাকে দেশ চলতি প্রথার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

## জমির মালিকানা লাভ

কোন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়া এবং ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর করার সময় সংশ্লিষ্ট দেশের জমিক্ষেতের সাধারণতঃ কয়েকটি অবস্থা থাকিতে পারে, যথা—

১. অনাবাদী পড়োজমি—এখানো যাহার উপর কাহারো মালিকানা স্থাপিত হয় নাই। (নূতন চরাভূমি, বন-জঙ্গল বা পরিত্যক্ত জমি) কিংবা যাহার মালিক মৃত বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উত্তরাধিকারী কেহ নাই।

২. মুসলমানদের ভোগাধিকারভূক্ত জমি.

৩. অমুসলিমদের ভোগাধিকারভূক্ত জমি এবং

৪. যেসব জমি-জায়গাকে পূর্বেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে নিদিষ্ট করা হইয়াছে—ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় এইরূপ জমিকে বলা হয় খালেছাহ। خالصه

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর শেষোক্ত প্রকার জমি পূর্বানুরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনই থাকিবে। রাষ্ট্র তাহা নিজস্ব কাজে ব্যবহার করিবে কিংবা তৎলব্ধ অর্থ সরকারী কাজে ব্যয় করিবে।

প্রথমোক্ত প্রকার জমি-জায়গা আবাদ ও চাষোপযোগী করিয়া উহাতে ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমিহীন লোকদের মধ্যে সুবিচারমূলক নীতি অনুযায়ী বন্টন করিতে হইবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) 'কিতাবুল খারাজ 'গ্রন্থ লিখিয়াছেনঃ

وَبِالْاِمَامِ اَنْ يَّقْطَعَ كُلَّ مَوَاتٍ وكُلَّ مَاكَانَ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ مِلْكٌ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَعْمَلُ فِيْ ذَالِكَ بِالَّذِي يُرٰى اَنَّهُ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ واَعَمُّ نَفْعًا-

(كتاب الخراج ص ٦٦)

অনাবাদী, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধিকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেহ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তাহা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য। এই ব্যপারে সকল মুসলমানের সাধারণ ও নির্বিশেষ অধিকার স্বীকার করিতে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধনকেই নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

অর্থাৎ এই জমি এমনভাবে বন্টন করিতে হইবে, যেন এই বন্টনের ফলে জনগণের কল্যাণই সাধিত হয়. কোনরূপ ক্ষতি বা অমঙ্গল যেন কাহারও না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এই জমির বন্টনকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ 'নবী করীম (স) মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলে পর এখানকার সকল শুষ্ক, মৃত, অনাবাদী ও পড়ো-জমি সুনিয়মিতভাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

এইভাবে একজন নাগরিক যে জমি লাভ করিবে এবং উহাকে আবাদ ও চাষোপযোগী করিয়া লইবে, সে ব্যক্তি ঐ জমির 'মালিক' বিবোচিত হইবে।

হযরত আয়েশা (র) বর্ণিত একটি হাদীসে নবী করীম (স)-এর এই ইরশাদ উল্লেখিত হইয়াছেঃ

مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَا حَقٌّ بِهَا- (بخاري، احمد، ونسائ)

যে ব্যক্তি কোন মালিকহীন জমি আবাদ করিয়া লইবে, সে-ই উহার ভোগাধিকার ও মালিকানা লাভ করিবে।

'আবূ দাউদ' নামক হাদীস গ্রন্থে একজন সাহাবীর এই উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَضٰى اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ اللّٰهِ وَالْعَبْدِ عِبَادُ اللّٰهِ فَمَنْ اَحْيٰى مَوَاتَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا-

আমি সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত নবী করীম (স) চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, জমি-জায়গা সবকিছু আল্লাহর এবং মানুষ তাহারই দাস, অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী

জমি চাষোপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করিয়া তুলিবে উহার মালিকানা লাভে সে-ই অগ্রাধিকার পাইবে।

তৃতীয় প্রকার জমিঃ অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির অবস্থা সাধারণতঃ তিন প্রকার হইতে পারে। অমুসলিমদের জমির এই প্রকারভেদ তাহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা অনুযায়ীই নির্ধারিত হইবে; তাহা এইরূপঃ

(ক) অমুসলিম বাসিন্দারা মুসলিমদের সহিত মুকাবিলা করিয়া যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্যন্ত যদি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, অথবা মুসলমানদের সহিত কৃত সন্ধিচুক্তি ভংগ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মুসলমানগণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করে, তবে অমুসলিমগণ রাজনৈতিক দিকদিয়া 'জিম্মী'—'শক্তি প্রয়োগের ফলে পরাজিত ও বশ্যতা স্বীকারকারী অমুসলিম' হওয়ার মর্যাদা পাইবে। অনুরূপভাবে তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি গণিমতের সম্পদ বা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র উহার বিলিব্যবস্থা, চাষাবাদ ও বন্দোবস্তের জন্য ইচ্ছা করিলে মুজাহিদদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দিতে পারে। আবার উহার চাষাবাদের কাজ উহার প্রাচীন চাষীদের দ্বারা নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে সম্পন্ন করার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। কিন্তু মূলত সেই প্রাচীন ভূম্যাধিকারীরা উহার মালিক থাকিবে না। হযরত নবী করীম (স) খায়বর এলাকায় কার্যত এই নীতিরই প্রয়োগ করিয়াছেন।[১]

নবী করীম (স) মদীনায় হিজরাত করার পর তথাকার ইয়াহুদীদের সহিত "যুদ্ধ নয়—শত্রুতাও নয়"-এর চুক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীদের মধ্যে 'বনু কায়নূকা' গোত্র ইহা লংঘন করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। অতঃপর তাহারা ইসলামী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। নবী করীম (স) তাহাদের সকল ধন-সম্পত্তি গণীমতের মাল হিসাবে মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। 'বনু নজীর' গোত্রও এই একই অপরাধে অপরাধী ছিল, ক্ষমাগতভাবে পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত তাহা:। অবরুদ্ধ থাকিয়া পরাজয় স্বীকার করে। অতঃপর তাহাদিগকে সকল নগদ সম্পদ ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ প্রাণ লইয়া দেশ ত্যগ করিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় । তাহারা যুদ্ধ করে নাই বলিয়া তাহাদের যাবতীয় জায়গা জমি বিনা যুদ্ধেই নবী করীম (স)-এর হস্তগত হয়। ফলে তাহা সবই একান্তভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই কথাই বলিয়াছেনঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ–

আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূলকে তাহাদের (বনু নজীর)নিকট হইতে যাহাকিছু অর্জন করাইয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই। কারণ, তাহা অর্জন করিবার জন্য

১. كتاب الخراج بيحقى ابن ادم ص ٢٠

তোমাদিগকে ঘোড়া ও উট দৌড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হয় নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার রাসূলগণকে নিজ ইচ্ছামতই অন্যের উপর আধিপত্য দান করেন। —আল-হাশরঃ ৬

অতঃপর নবী করীম (স) এই সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। দুইজন সাহাবীর কঠিন দারিদ্রের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিশেষ অংশ দান করিয়াছিলেন।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলিয়াছেন— "বনু নজীরের ধন-সম্পত্তি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে বিনা যুদ্ধেই দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য মুসলমানদের কোনরূপ যুদ্ধ বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। অতএব তাহা খালেসভাবে নবী করীম (স)-এর প্রাপ্য। তাহা হইতে তিনি তাহার নিজের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ করিতেন এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহাদ্বারা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কাজ, বিশেষ করিয়া সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম খরিদ কার কাজ সম্পন্ন করিতেন।[১]

অন্য কথায় এই সম্পত্তি সবই ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী মালিকানা বলিয়া ঘোষিত এবং বায়তুলমালে সঞ্চিত হইয়াছিল। নবী করীম (স) কে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে উহা জনগণের মধ্যে বন্টন করার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। কায়রো ও খরতুম বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফারুক কলেজের শিক্ষক ডঃ জাকারিয়া বুয়ুমী লিখিয়াছেনঃ বনু নজীর গোত্রের অস্থাবর মাল-সম্পদ দরিদ্র আনসার ও মহাজিরদের মধ্যে বন্টন করিয়াছেন। মুহাজিরদের তীব্র প্রয়োজনের কারণে তাহাদিগকে ৩৬ অংশ দেওয়া হয়। কিন্তু জমি ও তাহাতে যেসব বৃক্ষরাজি বা ফসল ছিল তাহা বন্টন করা হয় না বরং তাহা সরকারী ব্যবস্থাপনায় রাখা এবং তাহা দিয়া দরিদ্র ইয়াতীম ও মিসকীনদের ব্যাপক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়।[২]

বনু কুরাইযা নবী করীমের সহিত কৃত সন্ধিচুক্তি লংঘন করিয়া কাফির শত্রুদের সহিত গোপন রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। নবী করীম (স) তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদের ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে তাহাদের রসদের হিস্সা অনুযায়ী বন্টন করা হইয়াছিল।

ইসলামের ভূমিনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে খায়বরের ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ৭ম হিজরী সনে খায়বরবাসীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হয় এবং পরে তাহাদের সহিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র খায়বরে বিশাল উর্বর ভূমির উপর ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) খায়বরের সমস্ত জমি ও খেজুর গাছ অর্ধেক ফল ও ফসল সরকারকে দেওয়ার শর্তে চাষাবাদকারীদের হাতে ন্যাস্ত করিয়াছিলেন। যাহা তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করিতেন।[৩]

---

১. সহী বুখারী, ২য় জিলদ, ৫৭৫ পৃঃ; আহ্কামুস্ সুলতানীয়া ৩৬১ পৃঃ। ফতুহুল বুলদান-বালাযরী ৩৩ পৃঃ।

২. المالية العامة الاسلامية- ص ٥٦

৩. فى المجتمع الاسلامى ابو زهره ٣٤ بوز

(ক) নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এই সমগ্র এলাকাকে ছত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি খন্ডের সহিত এক শতটি অংশ যুক্ত করেন। তন্মধ্য হইতে আঠারো খন্ড (মোট সম্পত্তির অর্ধেক) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-পূরণ ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট আঠারো খন্ড মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, উহার প্রত্যেকটি খন্ডেরই অংশীদার হইয়াছিল একশতজন লোক। নবী করীম (স) তাঁহার নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ইহা হইতেই একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(খ) যেসব অমুসলিম জাতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া—কোন জোরজবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই—ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিবে, ইসলামী রাষ্ট্র ঠিক চুক্তি অনুসারেই তাহাদের সকল অধিকার রক্ষা করিবে। তাহাদের নিজস্ব জমি-জায়গা তাহাদেরই ভোগ-দখল থাকিবে। তাহারা চুক্তি অনুসারেই ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয় কর রীতিমতই আদায় করিতে থাকিবে।

খায়বর বিজয়ের পর 'ফিদাক' নামক স্থানের অধিবাসীগণ নবী করীম (স)-এর সহিত সন্ধি করিবার জন্য নিজেদের পক্ষ হইতে উদ্যোগী হইয়াছিল এবং তাহাদের জমি-ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ইসলামী রাষ্ট্রকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিল। নবী করীম (স) তাহাদের আবেদনক্রমেই তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। ফিদাক-এর জমি লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয় নাই, অধিবাসিদের হাতেই উহা রাখিয়া দেওয়া হয়[১]। ফিদাক এলাকা হইতে যাহা আয় হইত, তাহা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করা হইত, যদিও ফিদাকের অধিবাসীগণই এইসব জমি-জায়গার আসল দখলদার ছিল। তাহাদের নিকট হইতে ঐ সব জমি কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। অবশ্য হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে বিশেষ কারণে তাহাদিগকে নির্বাসিত করা হয় এবং ন্যায্য মূল্যর বিনিময়ে তাহাদের জমি-জায়গা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে খরিদ করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে ভূমিক্রয়ের ইহা এক প্রাচীন রীতি।[২]

'তাইমা' নামক স্থানের অধিবাসীগণও নিজেদের আগ্রহ-উৎসাহে নবী করীম (স)-এর সহিত সন্ধি করিতে অগ্রসর হয়। ফলে তাহারা তাহাদের নিজ বাসস্থানেই বসবাস করিবে, তাহাদের জমি-ক্ষেত তাহাদেরই দখলে থাকিবে এবং তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রকে 'খারাজ' দিতে থাকিবে—এই শর্তে তাহাদের সহিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩]

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (স)-এর অনুসৃত ভূমিনীতিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মক্কা জয় করার পর উহার প্রাচীন বাসিন্দা 'মুহাজিরগণ' নিজেদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহাদের হিজরাত পূর্বকালীন মালিকানা অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি-জায়গার উপর পুনরাধিকার লাভ করেন। কারণ মক্কানগর মূলত বিনা যুদ্ধেই বিজিত হইয়াছিল।

১. কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বন্দ ১০০, ৩৯ পৃঃ
২. বুখারী, ২য় জিঃ ৫৭৬ পৃঃ
৩. আহকামে সুলতানিয়া, ফতুহল বুলদান, ৪৮ পৃঃ

নাজরান এলাকার খৃস্টানগণও ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। চুক্তি হইয়াছিল যে, তাহাদের জান-মাল, জমি-জায়গা, ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবকিছুরই নিরাপত্তা থাকিবে। তাহারা এই নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ লাভের বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে 'জিযিয়া' দিবে। তাহাদের এই সন্ধিচুক্তি প্রথম খিলাফতকাল পর্যন্ত বহাল থাকে কিন্তু দ্বিতীয় খলীফার আমলে নাজরানের খৃষ্টানগণ প্রকাশ্যভাবে সুদী কারবার করিতে আরম্ভ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কর্মতৎপরতা অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দেয়। এই কারণে হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে নির্বাসিত করেন এবং তাহাদের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া তাহা আদায় করিয়া দেন। অন্য কথায় রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের বিত্ত-সম্পত্তি খরিদ করিয়া লওয়া হয়। ইহার বিনিময়ে সিরীয়া ও ইরাক হইতে তাহাদিগকে চাষাবাদের জন্য জমি দান করা হয়।[১]

ইয়ামনের অধীবাসীগণও নবী করীম (স)-এর সহিত সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। নবী করীম (স) এই চুক্তি লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি ও গচ্ছিত-প্রোথিত ঐশ্বর্যের উপর ইসলামী রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রের ধার্যকৃত অন্যান্য দেয় এবং সকলকেই যথারীতি আদায় করিতে হইবে।[২]

(গ) যেসব অমুসলিম ভূমি-মালিক মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়, কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র হইতে পালাইয়া চলিয়া চলিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত উহার মালিক ও অধিকারী বা উত্তরাধিকারী কেহই অবশিষ্ট থাকে না, এইসব জমি-জায়গা বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তাহা জনগণের মধ্যে পূণর্বন্টন করিবে। হযরত উমর (রা) এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসূফ (রা) লিখিয়াছেনঃ

اِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَصْفٰى اَمْوَالَ كِسْرٰى وَاٰلِ كِسْرٰى وَكُلَّ مَنْ فَرَّ عَنْ اَرْضِهٖ وَقُتِلَ فِى الْمَعْرِكَةِ وَكُلَّ مُغِيْضِ مَاءٍ اَوْ جِمَّةٍ فَكَانَ عُمَرُ (رض) يَسْقَطِعُ مِنْ هٰذِهٖ لِمَنْ اَقْطَعَ- (كتاب الخراج ص ٧ ع -٥٨)

যে সব জমি কিস্‌রা, কিসরার বংশাবলী এবং যুদ্ধে নিহত ও পালাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া লোকদের মালিকানাভুক্ত ছিল, হযরত উমর (রা) তাহা সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যেসব জমি পানির নীচে ডুবিয়াছিল এবং সমস্ত ডাকঘর ও তৎসংলগ্ন জমি-জায়গাও তিনি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পরে তিনি এই সব জমি-জায়গা জনগণের মধ্যে চাষাবাদের জন্য বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

১. বুখারী, ফতুহুল বুলদান, ৭৭ পৃঃ।

২. অহকামে সুলতানীয়া।

বাংলাদেশ ভূ-খন্ড হইতে অমুসলিম দেশত্যাগীদের ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে এই নীত পূর্ণভাবে প্রযোজ্য এবং এই দলীলের ভিত্তিতে তাহা সব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে।

ইমাম আবূ ইউসূফের বর্ণনা হইতে জানা যায়, হযরত উমরের খিলাফত আমলে এই ধরনের সরকারায়ত্ত জমি-জায়গা হইতে আয়ের পরিমাণ ৪০ লক্ষ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

মোট কথা, স্বয়ং নবী করীম (স)-এর দশ বৎসরকালীন মাদানী জিন্দেগীতে প্রায় দশলক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকা—গড়ে দৈনিক দুই শত পঁচাত্তর বর্গমাইল অঞ্চল—ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে নবী করীম (স)-এর ভূমিনীতি এই ছিল যে, যেসব ভূমি যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগের পর হস্তগত হইয়াছিল, তাহা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করা হইত। অতঃপর উহার একাংশ সরাসরি ভূমিহীন লোকদের মধ্যে বন্টন করা হইত। এইরূপে যেসব অঞ্চল বিনা-যুদ্ধে করায়ত্ব হইত, তাহাও 'খালেস' নামে অভিহিত হইয়া খালেসভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কিন্তু যে সব অঞ্চলের অধীবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করিত এবং নিজেদের এলাকাকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন করিয়া লইত অথবা যেসব অমুসলিম 'জিযিয়া' দেওয়ার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিত, তাহাদের জমিক্ষেতের উপর ইসলামী রাষ্ট্র মাত্রই হস্তক্ষেপ করিত না। বরং ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদের প্রত্যেকেরই মালিকানার পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিত এবং তাহার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'কর' বা 'খারাজ' আদায় করিত মাত্র। এতদ্ব্যতীত মালিকহীন সম্পত্তি যাহা কিছুই হস্তগত হইয়াছিল, নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই তাহা বিভিন্ন সাহাবীকে তাঁহাদের কৃতিত্বপূর্ণ ইসলামী অবদান ও বৃহত্তর জাতীয় খেদমতের জন্য পুরষ্কারস্বরূপ দান করিয়াছেন। ইসলামী অর্থনীতির প্রাচীন পরিভাষায় ইহাকেই إقطاع 'জায়গীর দান' বলা হয়। বলাবাহুল্য, বর্তমান জায়গীরদারী ও সামন্তবাদী ভূমিনীতির সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নাই।

নবী করীম (স)-এর পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) নবী করীমের ভূমি নীতিকেই বহাল রাখেন এবং কার্যতঃ তিনি তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলেন। তিনিও ভূমিহীন লোকদের মধ্যে মালিকহীন জমি বন্টন করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার খিলাফতকালে মুর্তাদগণ ইসলামের অনুশাসন মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে। ফলে খলীফা তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের যাবতীয় বিত্ত-সম্পত্তি খিলাফতের কর্তৃত্বাধীন করিয়া লন। তাহাদের অনেক জমিকেই রাষ্ট্রীয় চারণভূমিতে পরিণত করা হয়।[২] হযরত খালিদ বিন অলিদ প্রবল যুদ্ধের পর ইরাক জয় করেন। তখন ইরাকের জমি-ক্ষেত বিজয়ী সৈনিকের মধ্যে বন্টন করার দাবি উথাপিত হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাহা না করিয়া ইরাকের বিরাট এলাকাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উহার চাষাবাদের কাজ উহার

১. কিতাবুল আমওয়াল. আবু উবাইদ
২. তারিখ-ই-তাবারী

পুরাতন ভোগদখলকারীদের উপরই ন্যস্ত করেন। তাহারা জমি চাষাবাদ করিত এবং ইসলামী খিলাফতকে 'জিযিয়া ও 'খারাজ' (ভূমিরাজস্ব) আদায় করিয়া দিত। যদিও পরবর্তী যুগে অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এই নীতিরও পরিবর্তন হইয়াছিল।

## দ্বিতীয় খলীফার ভূমি-নীতি

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পর সিরীয়া জয় করা হয়। প্রবল যুদ্ধের পর সিরীয়বাসীগণ মুসলমানদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। তাহারা একদিকে 'জিযিয়' এবং অন্য দিকে 'খারাজ' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মুসলমানগণ তাহাদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেন।

হযরত উমর (রা) প্রথমে এই এলাকার জায়গা-জমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কোন কোন সাহাবীর সহিত এ সম্পর্কে তিনি পরামর্শ করেন। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে এই কাজ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন ঃ "আজ সিরিয়ার এই বিরাট অঞ্চল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলে এবং উত্তরাধিকার আইন বলে বংশানুক্রমিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসিবে?" শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকা উহার মূল ভোগদখলকারীদের হস্তেই ন্যস্ত রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করা হইল। রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থ সর্বসাধারণের কল্যাণে বিনিয়োগ করায় অধিকৃত এলাকার উপর পরোক্ষভাবে সব নাগরিকেরই অধিকার স্থাপিত হইল। সরকারী ব্যবস্থায় জমি-জায়গাকে সাধারণ জনমানবের কল্যাণে পরিচালনা করার ইহাই হইতেছে উত্তম ও আদর্শ দৃষ্টান্ত।

হিজরী ১৬ সনে ইরাক-অন্তর্ভুক্ত 'সওয়াদ' নামক স্থান অধিকার করা হয়। সওয়াদের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কেও হযরত উমর ফারুক (রা) সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করেন। তিনি তাহার নিজের মত প্রকাশ করার প্রসঙ্গে বলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বজনীন ও সামগ্রিক দায়িত্ব এবং জরুরী কার্যবলী সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য অধিকৃত সমগ্র ভূমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া নির্ধারণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় বায়তুলমাল শুন্য হইয়া যাইবে; দেশরক্ষা, অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃংখলা ও জনগণের অভাব-অনটন পূরণ করার ঘোষিত দায়িত্ব পালন প্রভৃতি সামগ্রিক কাজ সাংঘাতিকরূপে ব্যাহত হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে নিম্নোদ্ধৃত আয়াত পাঠ করেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ- (الحشر-٨)

জনপদের অধিবাসীদের বিত্ত-সম্পত্তি হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছুই দান করিয়াছেন, তাহা হইতে আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীণ ও সম্বলহীন পথিকগণ অংশ লাভ করিবে। এইভাবে সম্পদ বন্টন করা হইলে ধন-সম্পদ তোমাদের কেবলমাত্র ধনীকদেরই কুক্ষিগত হইয়া থাকিবে না; কাজেই রাসূল তোমাদের যাহা কিছু দান করেন, তোমরা তাহাই গ্রহণ কর। আর যাহা হইতে তিনি তোমাদিগকে বিরত রাখেন, তাহা হইতে তোমারাও বিরত থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল, কারণ আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদানকারী।'

অর্থাৎ এইভাবে যে সব ধন-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ব হইবে, তাহা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হইবে। তাহা বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করিয়া জায়গীরদারী বা সামন্তবাদের সৃষ্টি করা যাইবে না। আর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র-ই উহার বিলিব্যবস্থা করিবে, পারস্পরিক কৃষিনীতি অনুযায়ী লোকদের দ্বারা উহার চাষ করাইবে এবং উৎপন্ন ফসল হইতে রাষ্ট্র উহার প্রাপ্য অংশ (Right) আদায় করিয়া লইবে। এই সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) লিখিয়াছেনঃ

فَتَرَكَهَا عُمَرُ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ وَلِمَنْ يَجِئُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَرَاَى الْفَضْلَ فِىْ ذَالِكَ- (كتاب الخراج ص ٦٩)

হযরত উমর (রা) এই সমস্ত জমিকে তৎকালীন ও অনাগত মুসলমানদের জন্য ছাড়িয়া ও রাখিয়া দিলেন এবং ইহাকেই তিনি উত্তম নীতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

হযরত উমর (রা) ইরাক বিজয়ী হযরত সায়াদকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ঃ যেসব অস্থাবর সম্পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও, কিন্তু জমি ও খাল ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি মুসলিম জনগণের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদরূপে অক্ষুন্ন ও অবন্টিত রাখ। কেননা উহা যদি বর্তমান সময়ের লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তাহা হইলে অনাগত মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

হযরত উমর (রা)-এর এই ভূমিনীতি সাহাবাদের পরামর্শ পরিষদ এক বাক্যে গ্রহণ ও সমর্থন করে এবং এই নীতি অনুযায়ী তখন কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা হয়।

## সারকথা

হযরত নবী করীম (স) এবং প্রথম ও প্রধান দুই খলীফার গৃহীত ভূমি নীতির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ লাভ করিতে পারিঃ

১. অমুসলিমদের যুদ্ধ-পরাজিত হওয়ার পর যে ধন-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারর্ভুক্ত হইবে, বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে উহার একটি বিরাট অংশ বন্টন করা যাইতে পারে। আর অবশিষ্ট অংশ রাষ্ট্রের নিজ তত্ত্বাবধানেই থাকিবে। খায়বরে এই নীতিই কার্যকর করা হইয়াছিল।

২. কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সশস্ত্র আক্রমণ-ব্যতীতই যাহা ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হইবে, তাহা 'খালেসা' হইয়া একান্তভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। রাষ্ট্র নিজ ক্ষমতায় সর্বসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিলিব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিবে। বনু নজীর গোত্রের সম্পত্তিতে এই মূলনীতিই আরোপিত হইয়াছিল।

৩. যুদ্ধের পূর্বেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে অমুসলিমদের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি তাহাদেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে, উহার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী যাহা কিছু ধার্য হইবে, তাহা তাহারা আদায় করিতে অবশ্যই বাধ্য থাকিবে। ফিদাক, তাইমা ইত্যাদি এলাকার ক্ষেত্রে এই নীতিই গৃহীত হইয়াছিল।

৪. যেসব অমুসলিম ভূমি-মালিক মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইবে, তাহাদের জমি এবং যেসব জমির কোন মালিক বা উত্তরাধিকারী নাই অথবা যেসব অমুসলিম দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে তাহাদের সব জমি-জায়গা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হইবে।

৫. মুসলমানদের ভোগাধিকারভুক্ত ভূমি সম্পর্কে নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কি নীতি হইবে, তাহাও উপরোক্ত ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ নূতন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলে এবং অমুসলমানগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে উভয় অবস্থাতেই তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে ও মালিকানার অধীনে থাকিবে। ইসলামী রাষ্ট্র ইহাদের কাহারো ন্যায়সংগত ও বৈধ উপায়ে অর্জিত মালিকানার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহাদের উপর ইসলামের সামাজিক ও সামগ্রিক অধিকার হিসাবে যাহা কিছু ধার্য হইবে, তাহা তাহাদের অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

কিন্তু এই সময় কাহারো মালিকানার বৈধতা, সত্যতা ও মৌলিকতা সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং কাহারো মালিকানা অন্যায় ও জুলুম ভিত্তিক হওয়ার কথা বলিয়া যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্র এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবে। তদন্তের পর যাহার মালিকানা ও দখলীসত্ব অবৈধ প্রমাণিত হইবে, তাহা হয় উহার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে, কিংবা ইসলামী হুকুমত তাহা রাষ্ট্রয়ত্ত করিয়া লইবে।

এই ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মুখে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর কর্মাদর্শই উজ্জ্বলতম নিদর্শন হইবে। তাঁহার গৃহীত পন্থা অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্র এই ধরনের সকল প্রকার জমীদারী-জায়গীরদারীকে রাষ্ট্রয়ত্ত্ব করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

## ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের স্বরূপ

প্রসঙ্গত ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়

যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। জমিদারী, জায়গীরদারী বা তালুকদারী ও হাওলাদারী প্রভৃতি কর আদায়কারী মধ্যস্বত্বের কোন অবকাশই ইসলামী অর্থনীতিতে স্বীকৃত হয় নাই। এই সব স্বত্ব মূলত পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। মূল জমির সহিত এই স্বত্বাধিকারীদের কোন নিকট সম্পর্ক থাকে না। সরকারের সহিত খুব নিম্নতম হারে কর দানের প্রতিশ্রুতিতে এক একটি বিরাট এলাকার উপর তাহাদের একচ্ছত্র প্রভূত্ব স্থাপিত হয় এবং জমির মালিক চাষীদের নিকট হইতে নিজেদের ইচ্ছামত হারে কর আদায় করে। কৃষক বা ভূমি মালিক জমি হইতে নিজেদের ইচ্ছামত হারে কর আদায় করে। কৃষক বা ভূমি মালিক জমি হইতে কিছু লাভ করুক আর নাই করুক; বন্যায়, প্রতিকূল আবহাওয়ায় বা পংগপালের দুর্ধর্ষ আক্রমণের ফলে সমস্ত শস্য ধ্বংস হইয়া গেলও বাৎসরিক দেয় খাজনা মাত্রই ক্ষমা করা হয় না। কাজেই ইসলামী অর্থনীতি এইরূপ জমিদারী বা নিছক খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব কিছুতেই বরদাশত করিতে পারে না।

ইসলাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে যে, এক ব্যক্তি কিছু পরিমাণ জমির মালিক হইতে পারে। এই 'কিছু'র কোনরূপ পরিমাণ বা সংখ্যা ইসলাম নির্ধারিত করে নাই। কারণ একজন ভূমি-মালিকের উপর ইসলাম এত বেশী বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যে, তাহাতে কাহারও পক্ষেই এলাকার সমস্ত বা অধিকাংশ জমিক্ষেত গ্রাস করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উহার কোন প্রান্তিক পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বাতুলতা, অনুরূপভাবে তাহা অস্বাভাবিকও বটে।

ভূমি-মালিক নিম্নলিখিত উপায় ও পন্থায় ভূমি ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারে ঃ

(ক) ভূমি মালিক নিজে তাহার ভূমি চাষ করিবে।

(খ) নিজে চাষ করিতে না পারিলে বা না করিলে কিংবা নিজে যে পরিমাণ চাষ করিতে পারে, তাহার বেশী জমি থাকিলে অপরের দ্বারা তাহা চাষ করা হইবে; অথবা চাষের কাজে অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

অপরের দ্বারা চাষ করাইবার তিনটি উপায় হইতে পারেঃ

(১) কোন দিন-মজুরের দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে জমি চাষ করাইবে; (২) উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার শর্তে কাহাকেও উহা চাষ করিতে দিবে। এবং (৩) প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে কাহাকেও এক বৎসর এক ফসলের জন্য উহার ভোগাধিকার দান করিবে।

(গ) নিজের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন না হইলে—অন্য কথায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি থাকিলে—তাহা অন্য কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগদখল করিতে দিবে।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী ভূমিস্বত্বের প্রয়োগ উল্লিখিত যে কোন পন্থায়ই সংগত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ভূমি-মালিকের নিজেরই যে জমি চাষ করা উচিৎ, তাহা নিম্নলিখিত হাদীস হইতে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ اَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا- (بخارى)

যাহার জমি রহিয়াছে, তাহার নিজেরই উহা চাষাবাদ করা এবং তাহাতে কৃষি করা কর্তব্য।

## পারস্পরিক কৃষিনীতি

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি, ভূমিস্বত্ব ভোগ করার কেবল এই একটিমাত্র পন্থাই সংগত বলিয়া ঘোষণা করে নাই। কোন লোক নিজে জমি চাষ করিতে না পারিলে—যেমন জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পংগু, শিশু বা স্ত্রীলোক হয়, কিংবা নিজে চাষ করিতে না চাহিলে, সে অন্যের দ্বারা তাহা চাষ করাইতে পারে। নবী করীম (স) অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ فُضُوْلُ اَرْضِيْنَ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْلِيَزْرِعْهَا اَخَاهُ- (ابن ماجه)

যাহার অতিরিক্ত জমি আছে, তাহা হয় সে নিজে চাষ করিবে, না হয় সে তাহার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাইবে বা তাহাকে চাষ করিতে দিবে।

অপর এক হাদীসের ভাষায়ঃ

اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا- (مسلم)

সেই জমি নিজেরা চাষ কর কিংবা অন্যদের দ্বারা চাষ করাও।

এই পর্যায়ে রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِنَّمَا يَزْرِعُ ثَلٰثَةٌ رَجُلٌ لَهٗ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَامُنِحَ وَرَجُلٌ اِسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ - ( ابن ماجه)

তিনজন লোক কৃষিকাজ করে। এক, যাহার নিজের জমি আছে; সে নিজে উহা চাষাবাদ করিবে। দ্বিতীয়, যাহাকে জমি চাষ করিবার জন্য দান করা হইবে, সে তাহাই চাষাবাদ করিবে যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয়, যে লোক নগদ টাকার বিনিময়ে জমি কেরায়া বা ইজারা লইয়াছে।

বস্তুত অপরের দ্বারা ভূমি চাষ করানো ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে কিছুমাত্র নাজায়েয বা শোষণমূলক ব্যবস্থা নহে। সম্প্রতি এই যে ধুয়া উঠিয়াছে—লাঙ্গল যাহার জমি তাহার, 'যে নিজ হাতে জমি চাষ করিবে না, জমির ফসলের উপর তাহার কোনই

অধিকার নাই' এবং এইসব শ্লোগানের মাধ্যমে যে নূতন ভূমিনীতি প্রচার করা হইতেছে, তাহা আর যাহাই হউক, ইসলামী ভূমিনীতি যে নয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অপরের দ্বারা জমি চাষ করাইবার কাজ স্বয়ং নবী করীম (স) এবং তাঁহার অসংখ্য সাহাবী করিয়াছেন।

খায়বর বিজয়ের ইতিহাস উপরে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে একথা জানা গিয়াছে যে, নবী করীম (স) খায়বরে বিজিত বিরাট এলাকার অর্ধেক জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বাকি অর্ধেক বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। মুজাহিদগণ নিজ নিজ অংশের মালিক ও দখলদার হইয়াছিলেন। অতঃপর এই উভয় ধরনের জমিকে খায়বরের বংশানুক্রমিক কৃষক (ইয়াহুদী)-দের নিকট পারস্পরিক ভূমি চাষের (مزارعت) শর্তে সোপর্দ করা হয়। নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাহাদের সহিত সমস্ত ফসলের অর্ধেক দানের শর্তে ভূমি চাষের চুক্তি করিয়াছিলেন ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (مسلم ج ص ١٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) খায়বরবাসীদের সহিত অর্ধেক ফসল দানের শর্তে ভূমি-চাষের চুক্তি করিয়াছিলেন।[১]

হযরত উমর ফারুক (রা) খায়বরে প্রাপ্ত তাঁহার নিজের অংশের জমি এই পারস্পরিক কৃষিনীতি مزارعت অনুসারেই ভোগ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খায়বরের যে সব জমি বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছিল, তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অংশের মালিক ছিলেন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশের জমির সীমানাও নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অথচ কোন মুজাহিদই নিজ অংশের জমি নিজে চাষ করেন নাই। বরং এই সমস্ত জমিই তথাকার চাষী ইয়াহুদীদিগকে অর্ধেক ফসল দানের শর্তে চাষ করিতে দিয়াছিলেন।

শুধু খায়বরের ব্যাপারেই নয়, হিজরতের পরে আনসারগণ যখন নিজেদের জায়গাজমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং নবী করীম (স)-ই তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতঃপর আনসারগণ

---

১. এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেন ঃ

والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة منعا على النصف والثلث والربع-

নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের অনেকেই এই হাদীস অনুযায়ী আমল করিয়াছেন। তাঁহারা অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ কিংবা চার ভাগের এক ভাগ ফসলের বিনিময়ে পারস্পরিক কৃষিকাজ করায় কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না।

মুহাজিরদের সহিত 'পারস্পরিক কৃষিনীতি (مزارعت) অনুসারে কাজ করার চুক্তি করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمَوْنَةُ وَنُشْرِكْكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا-

আনসারগণ নবী করীম (স)-কে বলিলেন—আমাদের খেজুরের বাগান আমাদের ও মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। নবী করীম (স) বলিলেন 'না'। অতঃপর আনসারগণ মুহাজিরদিগকে বলিলেন—আপনারা আমাদের জমি-ক্ষেতে কাজ ও শ্রম করুন, আমরা আপনাদিগকে ফসলের অংশ দান করিব। এই কথায় মুহাজিরগণ রাযী হইলেন।

'পারস্পরিক কৃষিনীতি অনুযায়ী ভূমি চাষ করার প্রথা ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ইমাম বাকের (র) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

مَا بِالْمَدِيْنَةِ اَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةِ الْاَيَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ-

ফসলের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি চাষ করার কাজ করিত না—মদীনায় মুহাজিরদের এমন কোন পরিবারই ছিল না।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলিয়াছেনঃ

اَكْرَى الْاَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهٖ اِلَى يَوْمِكَ هٰذَا- (ابن ماجه)

তিনি নবী করীম (স) এবং হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর আমলে তিন ভাগের এক ভাগ কিংবা চার ভাগের এক ভাগ ফসলের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিয়াছেন। এখন পর্যন্ত তিনি এই নিয়মেই চাষাবাদের কাজ করাইতেছেন।

হযরত হাসান বসরী (তাবেয়ী) বলিয়াছেন ঃ

لَاَبَاْسَ اَنْ تَكُوْنَ الْاَرْضُ لِاَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا فِىْ خَرْجٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَاَى ذٰالِكَ الزُّهْرِى-

ইহাতে কোনই দোষ নাই যে, দুইজনের মধ্যে একজনের জমি হইবে এবং উভয়ই উহা হইতে ফসল ফলাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিবে, (কিংবা শ্রম করিবে) আর উহাতে যে ফসল ফলিবে, তাহাতে উভয়ই সমান অংশীদার হইবে।

তিনি আরো বলিয়াছেন, 'ইমাম জুহরীও ইহা সংগত এবং জায়েয বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহাবী (طحاری) নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ কালীব-বিন ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

اَتَانِی رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ وَمَاءٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذَرٌ وَّلاَبَقَرُ اَخَذْتُ اَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتُهَا بِبَذَرِیْ وَبَقَرِیْ فَنَاصَفْتُهُ-

এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল, তাহার নিকট জমি এবং উহার সেচের জন্য জলাশয় আছে; কিন্তু তাহার বীজ ও গরু বা কৃষিযন্ত্র নাই। আমি তাহার জমি আর্ধেক ফসল দেওয়ার বিনিময়ে গ্রহণ করিলাম এবং নিজের বীজ ও গরু দিয়া কৃষিকার্য সম্পন্ন করিলাম। অবশেষে উহার ফসল আমরা উভয়ই আধা-আধি ভাগ করিয়া লইলাম। (এইকাজ সংগত হইল কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল) উত্তরে হযরত আবদুল্লা বলিলেন حسن 'উত্তম'।

বস্তুত ফসলের কোন নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে পারস্পরিক কৃষিকাজ সম্পূর্ণ জায়েয। তবে ইহাতে কোন এক পক্ষের উপরই কোনরূপ জুলুম হইতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارِعَةَ وَلٰكِنْ اَمَرَ اَنْيَّرْفِقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا- (ترمذی)

পারস্পরিক কৃষিকাজকে নবী করীম (স) নিষিদ্ধ করেন নাই; বরং তিনি পরস্পরের প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতি সম্পন্ন হইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হইতে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, পারস্পরিক কৃষিনীতি (مزاوعت) ইসলামে সম্পূর্ণরূপে জায়েয। ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণও ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রা) হইতে এ সম্পর্কে নিষেধ ও নেতিবাচক যে উক্তি বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তাঁহার সাধারণ নীতি নয়। তিনি কেবল ইরাকের শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমির ক্ষেত্রেই পারস্পরিক কৃষিনীতিকে সমর্থন করেন নাই। তাহার কারণ এই নয় যে, তিনি নীতিগতভাবেই ইহাকে সংগত মনে করিতেন না বরং ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, উল্লিখিত ভূমিগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল না। সেখানকার জিম্মিদের মালিকানার জমি ছিল, তাহা অনিশ্চিত ছিল এবং সে সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কাজেই তাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে খরীদ করা এবং অপরের দ্বারা চাষ করানোকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। অন্যথায় মূলত অপরের দ্বারা জমি চাষ করানোকে তিনি কখনই নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় কথা এইরূপ কৃষিনীতি হযরত নবী করীমের (স) সময় হইতেই খুলাফায়ে রাশেদুনের কাল পর্যন্ত দ্বিধা-সংকোচহীনভাবে সকল মুসলমানের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কেহই এইরূপ কাজকে নিষিদ্ধ মনে করেন নাই। কাজেই আজ ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেনঃ

وَاَمَّا فَعَلَهُ هُوَ وَفَعَلَهُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُوْنَ وَالصَّحَابَةُ فَهُوَ الْعَدَلُ الْمَحْضُ الَّذِىْ لَارَيْبَ فِىْ جَوَازِهِ- (الطرق الحكية ص-٢٧)

যে নিয়মে রাসূলে করীম (স) খুলাফায়ে রাশেদুন এবং সাহাবায়ে কিরাম ভূমির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে ও পুরাপুরিভাবে সুবিচাপূর্ণ ব্যবস্থা। উহা জায়েয হওয়ায় কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইবনে আবূ লাইলা, অবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ সকল মুহাদ্দিস ও ফিকাহ বিদ—ইমাম আহমাদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে শুরাইহ প্রমুখ ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন ঃ 'পারস্পরিক জমি সেচ ও পারস্পরিক কৃষিকাজ সমবেতভাবে সম্পন্ন করা যেমন জায়েয,অনুরূপভাবে এককভাবেও ইহা করা জায়েয। খায়বর সংক্রান্ত হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় এবং ইহাই সর্বজন গ্রহীত নীতি। খায়বরে পারস্পরিক কৃষিনীতি জায়েয হইয়াছিল শুধু পানি সেচের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, এইরূপ দাবি করা কিছুতেই সংগত হইতে পারে না বরং উহা হইতে অকাট্যভাব প্রমাণিত হয় যে, স্বতন্ত্রভাবেও পারস্পরিক কৃষিনীত সম্পূর্ণ জায়েয।

ফিকাহবিদদের মতে নিম্নলিখিত চারভাবে পারস্পরিক কৃষিকার্য জায়েয ঃ

(ক) জমি ও বীজ জমি-মালিক দিবে এবং কৃষিযন্ত্র ও শ্রম দিবে চাষী।

(খ) জমি, কৃষি-যন্ত্র ও বীজ সবই দিবে জমি-মালিক আর চাষী শুধু শ্রম করিবে ও ফসল ফলাইবে।

(গ) জমি-মালিক শুধু জমি দিবে এবং অন্যান্য সবকিছু দিবে চাষী।

(ঘ) জমি ও কৃষি যন্ত্র জমির মালিক দিবে এবং বীজ ও শ্রম দিবে চাষী।[১]

শেষোক্ত ধরনের পারস্পরিক কৃষিকার্য সম্পর্কে কোন কোন ফিকাহবিদ আপত্তি জানাইলে ইমাম আবূ ইউসূফ উহাকে বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন।

তৃতীয় কথা, ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি-মালিকানার ব্যাপারে জমি বা নগদ টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। সংগত উপায়ে এক জনের হাতে যত পরিমাণ জমিরই সমাবেশ হউক না কেন, ইসলাম তাহা নিষেধ করে নাই। এই জমি সে নিজে চাষ করিবে, অপরকে ফসলের নির্দিষ্ট ভাগের বিনিময়ে চাষ করিতে দিবে, নগদ মজুরী দিয়া নিদ মজুরের দ্বারা জমিতে কাজ করাইয়া ফসল উৎপন্ন করিবে, অথবা নগদ টাকা লইয়া

১. تحفةالفقهاء، ج٣ص٣٦٣-٣٦٤

অপরকে এক ফসলের বা এক বৎসরের জন্য চাষ করিতে দিবে—ইসলামী কৃষিনীতিতে ইহার প্রত্যেকটি পন্থাই সংগত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পর্যায়ে ইসলামের অর্থনীতি বিশারদ ও সর্বজনমান্য মনীষীদের মতও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতি যখন কোন বৃদ্ধ,পংগু, অন্ধ, শিশু এবং স্ত্রীলোক—যাহারা নিজ হাতে জমি চাষ করিতে পারে না তাহাদিগকেও জমির মালিক হওয়ার অধিকার দেয়, তখন অন্যের দ্বারা ভূমি চাষ না করাইতে পারিলে তাহারা মালিকানা কিরূপে কার্যকর হইবে? তাহারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করিতে পারে না শুধু এতটুকু কারণে তাহাদের মালিকানা কাড়িয়া লইতে হইবে? ............. ইসলাম তাহা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারে না।

স্বর্ণ রৌপ্য বা নগদ টাকার বিনিময়ে একজনকে জমি চাষ করিতে দেওয়া বা অন্যের জমি চাষ করিবার জন্য গ্রহণ করায় কোনই বাধা নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَمْثَلَ مَا اَنْتُمْ صَانِعُوْنَ اَنْ تَسْتَاجِرُوا الْاَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِا لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ- (بخارى جلد-١)

শুন্য জমি স্বর্ণ রৌপ্যের (নগদ টাকায়) বিনিময়ে ইজারা লওয়া তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা।

ইহা হইতে সকল প্রকার জমি নগদ মূল্যে ভাড়ায় দেওয়া ও নেওয়া জায়েয প্রমাণিত হয়।

সহী মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে, হিঞ্জিলা ইবনে কায়সুল আনসারী বলেনঃ

سَاَلْتُ رَافِعَ ابْنِ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَاَبَاْسَ بِهِ-

আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে সোনা-চাঁদির (নগদ টাকার) বিনিময়ে জমি ভাড়ায় লওয়া বা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ 'তাহাতে কোন দোষ নাই'।

অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে, জমি কেরায়া লাগানোকে লোকেরা খুব মন্দ কাজ মনে করিতেছে বলিয়া যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَّ مَنَحَهَا اَحُدُكُمْ اَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَا عَنْ كِرَائِهَا- (ابن ماجه)

নবী করীম (স) তো বলিয়াছেন যে, তোমাদের একজন তাহার ভাইকে চাষের জন্য জমি দেয় না কেন? কিন্তু তিনি জমি ভাড়ায় লাগাইতে তো নিষেধ করেন নাই।

ইসলামী সমাজে যুগ যুগ ধরিয়া এইসব পদ্ধতিতেই জমি চাষ করার কাজ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পতনযুগের সূচনায় এবং বর্তমানের পতন যুগের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া এক শ্রেণীর জাতীয়করণবাদী কর্তৃক এই সব পন্থাকেই অসংগত প্রমাণ করিবার চেষ্টা চালাইয়াছে। সাধারণতঃ তাহারা এই জন্য মার্কসীয় যুক্তিধারারই আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এতটুকু লক্ষ্য করে না যে, মার্কস যে শোষণ ও বঞ্চনার তান্ডব নৃত্য দেখিয়া অন্যান্য উৎপাদন উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিরও ব্যক্তিগত মালিকানাকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা জায়গীরদারী, জমিদারী সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজেই সম্ভব—মার্কস-ও এইসব সমাজেই তাহা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামের সুবিচারপূর্ণ অর্থনীতিতে—তথা ইসলামী সামাজ ও রাষ্টে—অনুরূপে শোষণ ও বঞ্চনার কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। তথায় অপরের জমি চায় করিয়া কোন চাষী সমস্ত ফসল মালিকের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া শুন্য হস্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয় না, মোটা অংশ সে নিজের ঘরে নিশ্চয়ই লইয়া যাইতে পারে। আর তাহাতেও তাহার মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ না হইলে ইসলামী রাষ্ট্র তাহা পরিপূরণের জন্য দায়ী থাকে। কাজেই মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তিই এখানে বর্তমান থাকিবে না এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও পারস্পরিক কৃষিনীতিকেও নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিবে না।

সম্পত্তির জাতীয়করণবাদীরা কেবল মার্কসীয় দর্শন পেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দু-একটি হাদীসও যে তাহারা নিজেদের দাবির অনুকূলে পেশ করে না, এমন নয়। যথা, হযরত রফে ইবনে খাদীজ-বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটিঃ

نَهَا نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا اِذَا كَانَتْ
لِاَحَدِنَا اَرْضٌ اَنْ يُّعْطِيَهَا بِبَعْضٍ خَرَاجِهَا وَبِدَرَاهِمَ-

রাসূলে করীম (স) আমাদের একটি উপকারী কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কাহারো জমি থাকিলে তাহা উৎপন্ন ফসলের অংশ বা নগদ টাকার বিনিময়ে অপরকে চাষ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কিন্তু এই হাদীসটি উহার বর্তমান শব্দসমূহ সহকারে কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ উল্লিখিত হাদীসটি একে দীর্ঘ ও বিস্তারিত হাদীসের একটি অংশ মাত্র। কাজেই উহাকে উহার মূল হাদীসের সহিত মিলাইয়াই দেখিতে হইবে। সেই পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ ঃ হিঞ্জিলা ইবনে কায়সুল আনসারী বলেন, 'আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে "সোনা-চাদির" বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'ইহাতে কোন দোষ নাই।' অতঃপর তিনি আরো বলেন ঃ

اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءٍ مِنَ لزَّرْعِ فَيُهْلِكُ هٰذَا وَيُسْلِمُ هٰذَا
فَلَمْ يَكُنْكِرَاءُ الْاَرْضِ اِلاَّ هٰذَا فَلِذَالِكَ زَجَرَعَنْهُ- (مسلم، ابوداود)

আসল ব্যাপার এই যে, নবী করীম (স)-এর প্রাথমিক সময়ে লোকেরা খালের তীরে অবস্থিত জমির বিশেষ কোন অংশে যে ফসল জন্মিবে, উহার অংশ দেওয়ার বিনিময়ে অপরকে জমি চাষ করিতে দিত—ভূমি চাষ করিতে দেওয়ার ইহাই ছিল তখন সাধারণ নিয়ম। কিন্তু পরিণামে উহার এই অংশের ফসল নষ্ট হইয়া যাইত। ফলে চাষী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত এবং নিজ শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইত। এই জন্য নবী করীম (স) এই কাজ হইতে মুসলমানদিগকে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

পূর্ণ হাদীসটি হইতে জানা গেল যে, অপরের দ্বারা জমি চাষ করানোকে নবী করীম (সাঃ) নিষিদ্ধ করেন নাই; বরং আরবের তৎকালীন প্রচলিত অবিচার ও শোষণমূলক শর্তে চাষ করানোকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন মাত্র। কারণ এইরূপ শর্তে উভয়ের মধ্যে একজনের লোকসান হওয়া নিশ্চিত ছিল। এই কারণে ইহা সুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছিল ও শোষণের কারণ হইয়াছিল।

এতদ্বীত রাফে' ইবনে খদীজের বিভিন্নভাবে বর্ণিত 'নিষেধ বাণী'ই মূলত সত্য নহে। কারণ হযরত রাফে' নবী করীমের নিকট যখন এই নিষেধবাণী শুনিয়াছিলেন তখন আসলে সাধারণভাবে এই কাজকেই নিষিদ্ধ করা হয় নাই; বরং বিশেষ অবস্থার দরুনই নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ এই যে, আবূ দাউদ ইবনে মাজাহ্ ও নাসায়ী গ্রন্থে ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) বলিয়াছেন ঃ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنَ خَدِيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتٰى رَجُلَانِ النَّبِىَّ صلعم وَقَدَاقْتَتَلَا فَقَالَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تَكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعُ ابْنِ خَدِيْجٍ قَوْلَهُ فَلَاتُكْرُوْا الْمَزَارِعَ-

'আল্লাহ্ রাফে'কে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ, এই নিষেধমূলক হাদীস সম্পর্কে রাফে অপেক্ষা আমিই অধিক ভাল জানি। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে, দুই ব্যক্তি (জমি লইয়া) পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া নবী করীমের খিদমতে হাজির হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া (এবং সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া) তিনি বলিলেনঃ 'ইহাই যদি তোমাদের অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা জমি' কেরায়া' দেওয়া বন্ধ করিয়া দাও' কিন্তু রাফে' পূর্বের কথা কিছুই শুনিতে পান নাই। তিনি শুধু শেষ কথাটি 'জমি কেরায়া দেওয়া বন্ধ করিয়া দাও' শুনিতে পাইয়াছিলেন।

স্বয়ং হযরত রাফে'র নিম্ন লিখিত কথা হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তদানীন্তন আরব-সমাজের প্রচলিত ভুল ও জুলুম-মূলক রীতির কারণেই নবী করীম (সঃ) উক্ত ভুল পন্থায় জমির চাষাবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রাফে' ইবনে খাদীজ বলেনঃ

كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكَانَ اَحَدُنَا يَكْرِىْ اَرْضَهُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ

لِىْ وَهٰذِهٖ لَكَ- فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ- هٰذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهٖ فَنَهَا هُمُ النَّبِىُّ صلعم-

(بخارى، مسلم)

আমরা মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি ছিলাম, আমাদের কেহ যখন জমি কেরায়া দিত,তখন সে বলিত, জমির এই খন্ডের ফসল আমার আর ঐ খন্ডের ফসল তোমার। কিন্তু অনেক সময় দেখা যাইত যে, ঐ জমির এককন্ডে হয়ত ফসল জন্মিয়াছে; আর অপর খন্ডে কিছুই জন্মে নাই। তখন নবী করীম (স) এইভাবে জমি চাষ করিতে দিতে নিষেধ করিলেন।

কাজেই এই নিষেধমূলক হাদীস মূলতঃ একটি বিশেষ অবস্থা বা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট—উহা সাধারণ নিষেধ নয়।

কিন্তু এক শ্রেণীর 'চিন্তাশীল' লোক হাদীসের আগাগোড়া কিছুই না জানিয়া বা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া, পূর্বাপর সম্পর্কহীনভাবে মধ্যখান হইতে এক টুকরা লইয়া নিজেদের মনগড়া মতবাদের প্রমাণস্বরূপ উহাই পেশ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলামের বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হইয়াছিল শুধু জমিদার ও জোতদারদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই কথা যে আদৌ সত্যভিত্তিক নয়, কুরআন হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস হইতেও প্রমাণিত নয়, তাহা ইসলামভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন।

## সরকারী পর্যায়ে জমি বন্টন

এই আলোচনার শেষ ভাগে সরকারী পর্যায়ে জমি বন্টন সম্পর্কে আরো কায়েকটি জরুরী কথা বলা আবশ্যক।

সরকারী পর্যায়ে কেবলমাত্র সেই সব জমিই বন্টন করা যাইতে পারে যাহার কোন ব্যক্তিই মালিক নয় এবং তাহা বন্টন করা যাইবে কেবল সেই সব ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমি মালিক লোকদের মধ্যে যাহারা উহা আবাদ ও চাষোপযোগী করিয়া তুলিতে এবং উহা হইতে ফসল ফলাইতে ইচ্ছুক ও সক্ষম বিবেচিত হইবে। উপরন্ত উহা নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আবাদ করার শর্তেই দেওয়া যাইতে পারে। এই শর্তের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মিয়াদ শেশ হইয়া যাওয়ার পর্বে যদি তাহা আবাদ করা সম্ভব না হইয়া থাক তাহা হইলে উহা সরকারের নিকট প্রত্যার্পিত হইবে এবং সরকার উহা অপর লোকদের মধ্যে পূণর্বন্টন করিবে।

নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে এইরূপ জমি বন্টনের নিয়ম পুরামাত্রায় প্রচলিত ছিল।

এই জমি বন্টনের ব্যাপারে জরুরী শর্ত হইলঃ

(ক) সেই জমি কোন নাগরিকের মালিকানাভুক্ত হইবে না।

(খ) উহা সাধারণ জন-মানুষের কল্যাণের সহিত সম্পর্কিত হইবে না। এধরনের কোন জমি বিশেষ কোন নাগরিককে ব্যক্তিগতভাবে মালিকানা হিসাবে দান করার সরকারের কোন অধিকার নাই। এবং

(গ) এই জমি এমন হইবে না যেখানে সাধারণ জন-মানবের জন্য অপরিহার্য কোন ধাতু বা সম্পদের খনি অবস্থিত। এইরূপ হইলে সেই জমি ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও দেওয়া যাইবে না।

এই তিন প্রকারের জমি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার জমিই সরকার যাহাকে ইচ্ছা ভোগ দখলের জন্য দান করিতে পারে। কিন্তু তাহাও খাতির, প্রীতি, আত্মীয়তা, ঘুষ-রিশওয়াত, সুপারিশ ও ধরপাকড় বা দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। বরং এই জমি বন্টনের ব্যাপারেও শহর-নগর উন্নয়ন, অধিক ফসল ফলাও ও সাধারণ জনমানুষের কল্যাণ হইতে হইবে আসল লক্ষ্য।

## নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে জমি বন্টন নীতি

আরবদেশে যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানকার জমি জায়গার তিনটি অবস্থা ছিল। অবস্থা তিনটি নিম্নরূপঃ

(১) বহু পরিমাণ জমি ছিল ব্যক্তিদের মালিকানাভুক্ত,

(২) এমন অনেক জমিই ছিল, যাহার কেহ মালিক ছিলনা এবং

(৩) গৃহপালিত পশুর সাধারণ চারণভূমিরূপে নির্দিষ্ট ছিল অনেক জমি।

নবী করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সর্ব প্রথম মৃত, পড়ো ও মালিকবিহীন অনাবাদী জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেনঃ 'এই মৃত জমি যে আবাদ করিবে সে উহার মালিক হইবে।' লোকেরা তখন সাধ্যানুসারে জমি আবাদ করিবার ও উহার মালিক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেল। এইভাবে বহু লোকের মধ্যে মালিকবিহীন জমি বন্টন করা হইল। (আবূ দায়ূদ)

নবী করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর প্রথম পর্যায়ে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়। ইহার ফলে মুসলমানরা বিজয়ী হইয়া এই দুই রাষ্ট্রের বিশাল অঞ্চল দখল করিয়া লয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দখলকৃত এই বিশাল জমি-জায়গার কেহই মালিক ছিলনা। হয় উহার মালিক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, না হয় উহা আসলেই কাহারও মালিকানা ভুক্ত ছিল না বরং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সরকারায়াত্ত জমি-জায়গা ছিল এবং তাহাই ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আসিয়াছিল।

এই সময়ও ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাগণ এই সব জমি-জায়গা আবাদ ও ভোগদখল করার জন্য এমন লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন যাহারা উহা আবাদ করিতে ও উহাতে ফসল ফলাইতে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি বন্টনের ইহাই হইল মূল সূত্র। ইহা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক সুফল দান করিয়াছিল।

এই সকল ভূমিবন্টনে শরীয়াতি বিধান পুরাপুরি অনুসৃত হইয়াছে। ইসলামের ফিকাহবিদগণ পূর্বোল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে ভূমিবন্টনকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন ও জায়েয বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) গভর্ণর হযরত আবূ মুসা আশ্‌য়ারীকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ

اِنْ لَمْ تَكُنْ طَرْضُ جِزْيَةٍ وَلَاأَرْضًا يَجْرِىْ اِمَيْهَا مَاءُ جِزْيَةٍ فَاقْطَعْهَااِيَّاهُ-

যদি উহা জিজিয়ার জমি না হয় এবং এমন জমিও না হয় যেখানে জিজিয়ার জমির জন্য পানি প্রবাহিত হয়, তবে কেবল সেই জমিই সরকারী পর্যায়ে জনগণের মধ্যে বন্টন করিতে পার।

ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র ব্যক্তি-মালিক বিহীন জমিই সরকারী পর্যায়ে বন্টন করা যাইতে পারে। আর এইরূপ জমি পূর্ণবন্টন সরকারী পর্যায়েই হইতে পারিবে। (كتاب الاموال -ص٢٤٨)

কাজী আবুল হাসান আল-মাওর্দী লিখিয়াছেনঃ

وَاِقْطَاعُ السُّلْطَانِ مُخْتَصٌّ بِمَا جَازَ فِيْهِ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَتْ فِيْهِ اَوَرُهُ وَلَا يَصِحُ فِيْمَا تَعَيَّنَ فِيْهِ مَالِكُهُ وَتَمَيَّزَ مُسْتَحِقُّهُ- (الاحكام السلطانيه-١٦٨)

সরকারী পর্যায়ে জমি বন্টনকার্য কেবলমাত্র সেই সব জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাহা সরকারের দখলীভুক্ত রহিয়াছে এবং যাহাতে সরাসরি সরকারী নির্দেশ কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যে সব জমির নির্দিষ্ট মালিক রহিয়াছে এবং যে সব জমির দখলকার অন্যদের হইতে পৃথক অধিকার পাইয়াছে সে সব জমি সম্পর্কে সরকার বিনা কারণে কোন নূতন নীতি গ্রহণ করিতে পাড়ে না।

সরকারী পর্যায়ে জমি বন্টনের ইহাই মৌ}িক বিধান। অতএব সাধারণভাবেও কোন সামষ্টিক ক}্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীতই খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া ভূম্যাধিকারীদের উৎখাত করিয়া দিয়া উহাকে০নিজস্ব লোকদের মধ্যে অথবা অস্বাভাবিক উচ্চ মূলেক্ষর বিনিময়ে পুনর্বন্টন করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম।

এই পর্যায়ে এ কথাও বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারীভাবে যে জমি জনগণের মধ্যে বন্টন করা হইবে, উহার দ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদ বা জায়গীরদারী প্রথা রচনা করা চলিবে না, যাহার পক্ষে যত পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামলানো, চাষাবাদ ও ফসল ফলানো সম্ভব হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকে ততখানি জমিই দেওয়া যাইবে। উহার অধিক পরিমাণ জমি কাহাকেও দেওয়া যাইবে

না। কাহাকেও যদি আবাদ অসাধ্য পরিমাণ জমি দেওয়া হয় যাহার ফলে বহু চাষেচ্ছু বা ভূমি-শ্রমিক বঞ্চিত থাকিয়া যাইতে পারে; কিংবা জমি-মালিক যদি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে জমি সরকারী তহবিলে ফেরত লইতে ও এই কাজে সক্ষম [ উপযোগী লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। হসরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা)-কে নবী করীম (স) প্রচুর জমি নিজে আবাদ করার উদ্দেশ্যে দিয়াছিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ছর পর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ রাসূলে করীম্ন(স) আপনাকে অনেক জমি দিয়াছিলেন। তাহার পরিমাণ এত বেশী যে, আপনি নিজে তাহা চাষাবাদ করিয়া পুরামাত্রায় ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। অতঃপর বলিলেনঃ

فَانْظُرْ مَاقَوِيْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَامْسِكْهُ وَمَا لَمْ تَطِيْقُ وَمَا لَمْ تَقْوِ عَلَيْهِ فَادْفَعْهُ
اِلَيْنَا نُقَسِّمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে পরিমাণ জমি আপনি নিজে চাষাবাদ করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পরিমাণই আপনি নিজের নিকট রাখুন। আর যাহা সামলাইতে পারিবেন না কিংবা যে পরিমাণ জমির ব্যবস্থাপনা করা আপনার সাধহাতীত, তাহা আমাদের (রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দিড়, আমরা উহা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন জ{রয়া দিব।

হযরত বিলাল জমি ফেরত দিতে রাযী(ড়া হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাধ্যাতীত পরিমাণের ঢ়{ম হযরত উমর (রা) ফেরত লইলেন এবং মুসলমানচঙ্ছর মধ্যে পুনর্বন্টন করিলেন।[১]

এইরূপ ভূমি বন্টনের কাজ স্বয়ং নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন্পনর আমলদারীতেও সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ ভূমি বন্টনের পশ্চাতে দুইটি উদ্দেশ্যেই নিহিত ছিল। একটি হইল ভূমিহীন লোকদিগকে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ দান ও তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিবিধান এবং দ্বিতীয় হইল সেনাবাহিনীর মধ্যে যাহারা প্রশংসামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের এই বিরাট কাজের পুরস্কার দান। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যের পশ্চাতেও অনাবাদি ও অনুন্নত জমিকে আবাদ ও চাষোপযোগী বানানো ও তাহাতে ফসল ফলাইয়া জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন ছিল আসল লক্ষ্য।

তখন নিম্নোক্ত তিন প্রকারের জমিই বন্টন করা হইয়াছেঃ

(ক) যে সব জমির কেহ মালিক নাই, যদিও তাহা অনাবাদি ও পড়ো জমি।

(খ) যাহা শহর, নগর ও গ্রামবাসীর সাধারণ ও সামষ্টিক প্রয়োজনে আসে না।

(গ) যাহাতে সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য কোন ধাতু বা খনিজ পদার্থ অবস্থিত নহে।

---

১. (كتاب الخراج يحى ابن آدم ص ٩٢)

এইরূপ জমি রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারে। অবশ্য সে দানের পশ্চাতে দেশ ও দেশবাসীর সাধারণ কল্যাণই লক্ষ্যরূপে নিহিত থাকিতে হইবে, নির্বিচারে বা অবিবেচনা সহকারে তাহা বলা চলিবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেন; এই পর্যায়ের জমি—যাহা আবাদ নয়, যাহার কেহ মালিক নাই, তাহা—বন্টন না করিয়া অকেজো ফেলিয়া রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই উচিত হইতে পারে না। কেননা, আবাদ করার ফলে যেমন প্রয়োজনীয় বিপুল খাদ্য ফসল লাভ করা যাইতে পারে, তেমনি সরকারের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই পর্যায়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের একটি ফরমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ

> তোমাদের হাতে যেসব সরকারী জমি জায়গা রহিয়াছে তাহা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের নিয়ম অনুযায়ী জনগণকে চাষ করিতে দাও। ইহাতেও যদি উহার চাষাবাদ না হয়, তাহা হইল এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে (তিন ভাগের এক ভাগ সরকার পাইবে এবং দুই ভাগ পাইবে চাষী) তাহা চাষ করিতে দাও। আর এই শর্তে যদি কেহ জমি চাষ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে দশ ভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে চাষ করিতে দিতে পার। ইহাতেও যদি জমি চাষ না হয় তাহা হইলে কোনরূপ বিনিময় না লইয়া এমনিই চাষ করিতে দাও। এই ভাবেও কেহ চাষ করিতে না চাহিলে উহার চাষাবাদ করার জন্য বায়তুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় কর এবং কোন জমিই তোমরা বেকার থাকিতে দিবে না।

## ভূমি উন্নয়ন ও বন্টন

রাষ্ট্র সরকারের দখলে যে সব মালিকহীন পড়োজমি থাকে, সরকার তাহা ভূমিহীন জনগণের মধ্যে বন্টন করিবে। ইসলামী অর্থনীতির ইহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য নীতি। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এই ধরনের জমি জনগণের মধ্যে বন্টন করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত হাদীসটি এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্যঃ

انَّ لنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ جَلْسَيْهَا وَغَوْرَيْهَا وَحَيْثُ يُصْلِحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يَعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ-

(ابوداؤد)

> নবী করীম (স) বিলাল ইব্‌নে হারেস নামক এক ব্যক্তিকে কাব্‌লিয়া এলাকার উচ্চ ও নিম্ন এলাকার খনি এবং কুদসের চাষযোগ্য জমিসমূহ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন মুসলমানের হক অপরকে দেন নাই।

কাব্‌লীয়া ও কুদস এলাকা মুসলিম মুজাহিদদের অধিকৃত এলাকা। এই এলাকার খনি ও চাষযোগ্য জমি রাসূলে করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বিলাল ইব্‌নুল হারেসকে দান করিয়াছিলেন। এই সব খনি ও জমির কেহ মালিক ছিল না। কাজেই রাষ্ট্র সরকারের পক্ষে তাহা বন্টন করা খুবই সংগত কাজ। আল্লামা শওকানী উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেনঃ

اَمَّا حَدِيْثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ يَجُوْزُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْاَئِمَّةِ اِقْطَاعُ الْمَعَادِنِ-

এই পর্যায়ের হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ও তাঁহার পর ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে জনগণের মধ্যে খনি বন্টন করাও সম্পূর্ণ জায়েয কাজ।

وَلِلْاِمَامِ اَنْ يُّقْطِعَ كُلَّ مَوَاتٍ وَكُلَّ مَاكَانَ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ مِلْكُ وَلَيْسَ فِىْ يَدِاَحَدٍ - (كتاب الخراج ص ٦٦)

বস্তুত ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান পড়ো, মালিকহীন ও দখলহীন জমি লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে পারে।

এইভাবে যখন কোন জমি বা খনি কাহাকেও বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, আর যদি তাহাতে দখল লইয়া চাষাবাদের কাজ করে এবং উহাকে চাষযোগ্য ও ফসল দাত্রী বানাইয়া লয়, তখন সে উহার মালিক হইবে এবং তাহার মালিকানা কখনই হরণ করা যাইবে না।

আর যদি কোন জমি বা খনি এইভাবে বন্টন করা হয় এবং পরে লক্ষ্য করা যায় যে, তাহা হইতে বিনা পরিশ্রমে উৎপাদন করা সম্ভব, তাহা হইলে উহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। কেননা উহার ফল তো সহজলভ্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়। কাজেই যে-ই উহা প্রথম দখল করিবে, সে-ই উহার ভোগাধিকার পাইবে। কাহারো পক্ষে উহার একচ্ছত্রভাবে মলিক হইয়া বসা এবং সাধারণ মানুষকে উহার ভোগ ও ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করার কোন অধিকার নাই।

খনি যদি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ভূমি গর্ভস্থ কোন ধাতুর হয়, যাহা মাটি ও পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং যাহা কঠিন ও কঠোর শ্রম ব্যতীত উত্তোলন ও পরিশোধন করা সম্ভব হয় না, তাহলে উহা কাহাকেও দান করা যাইতে পারে। তবে সে উহার নিরংকুশ মালিক হইয়া বসিতে পারিবে না।

এই ধরনের খনি কাহাকেও দান করা হইলে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহাতে উত্তোলোন ও পরিশোধন কার্য বন্ধ রাখিতে পারিবে না। কেননা তাহার ফলে উহার অভাবে সাধারণ মানুষের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। তাহাকে উহা দান করা হইয়াছে উহাতে কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং যত দিন তাহার পক্ষে সম্ভব সে উহাতে করিয়া যাইবে। যদি সে উহাতে কাজ বন্ধ করে, তখন উক্ত খনি তাহার অধিকার হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ করিবে। ইমাম শাফেয়ীর ইহাই মত।

হাদীসের শেষ অংশ وَلَمْ يَعْطِيْهِ حَقَّ مُسْلِمٍ 'তাহাকে কোন মুসলিমের অধিকার দিয়া দেওয়া হয় নাই'—ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কেহ যদি একবার কোন জমির মালিক হয়, তাহার পর সে উহাকে বেকার ফেলিয়া রাখে, কিংবা সে জমি হইতে সে অনুপস্থিত থাকে তবে প্রথম দান ও আবাদ করার কারণেই তাহার মালিকানা স্থায়ী হইবে না।

# ধন-বিনিময়

ইসলামের সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ অর্থনীতিতে ধন-উৎপাদনের প্রধান দুইটি উৎসের (Source) আলোচনার পর ধন-বিনিময় সম্পর্কেও আলোকপাত করা আবশ্যক। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই শ্রম ও মেহনতের সাহায্যে ধন-উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু অনেক সময়ই নিজ শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া সরাসরিভাবে উহা হইতে উপকৃত হওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না; বরং সেইজন্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় করিয়া লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

মানুষ স্বভাবতই অপরের মুখাপেক্ষী, কোন মানুষই অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া, অপরের শ্রমের সাহায্য না লইয়া বাঁচিতে পারে না। অনুরূপভাবে একটি দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকে, অন্যদেশে উহার অপরিহার্য প্রয়োজন থাকার সঙ্গে সঙ্গে তথায় তাহা দুর্লভ হইতে পারে। কাজেই লোকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পারস্পরিক সম্পদ বিনিময় যতখানি আবশ্যক, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক পণ্যবিনিময়ও অনুরূপভাবে আবশ্যক। বস্তুত, কর্মবন্টনের উন্নতির ফলে ধন-বিনিময়ের ক্ষেত্রও অধিকতর প্রশস্ত হইতে পারে।

ধন-বিনিময় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কুরআন শরীফের এই মূল নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করিয়া লইতে হইবেঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (قف) وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ (النساء ٢٩)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা বাতিল উপায়ে পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করিও না; বরং পারস্পরিক সন্তোষভিত্তিক ব্যবসায়ের মাধ্যমেই তোমাদের সম্পদের লেন-দেন হওয়া আবশ্যক; এবং তোমরা আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংস করিও না।

আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল উপায়ে' বলিতে সত্য-বিরোধী তথা শরীয়াত ও নৈতিকতার দিক দিয়া অন্যায়—এমন সকল পন্থাই বুঝায়। আর লেনদেন অর্থ—পরস্পরের স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্য শ্রম করে, এবং সে তাহাকে পারিশ্রমিক দেয়। ইসলামী সমাজের সকল প্রকার লেন-দেন এইভাবেই হওয়া আবশ্যক। পারস্পরিক ব্যাবসায় অর্থাৎ লেন-দেন কোনরূপ অন্যায় চাপে পড়িয়া কিংবা প্রতারণা ও

ধোঁকায় পড়িয়া সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঘুষ এবং সুদ-ভিত্তিক লেন-দেনে পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতি রহিয়াছে বলিয়া বাহ্যত মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা জবরদস্তিমূলক; অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহা হইয়া থাকে। কোন লোকই সন্তুষ্টচিত্তে ঘুষ বা সুদ দিতে প্রস্তুত হইতে পারে না; বরং বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ চাপে পড়িয়াই মানুষ ইহা করিতে বাধ্য হয়। জুয়ার ক্ষেত্রেও বাহ্য দৃষ্টিতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু উহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই হারিবার জন্য নয়, জিতিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করার গোপন আশা লইয়াই খেলায় মাতিয়া উঠে। ধোঁকা-প্রতারণার ক্ষেত্রেও উভয়ই প্রথমতঃ রাযী হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে পরাজিত পক্ষের রাযী হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

আয়াতের শেষ বাক্যাংশ 'তোমরা আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংশ করিও না' হইতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উক্ত নিষিদ্ধ পন্থায় লেন-দেন বা ধন-বিনিময় করা আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংসেরই শামিল। উক্তরূপ লেন-দেন ব্যক্তিগতভাবে এক একটি জাতিকে নিশ্চিতরূপে ধ্বংসের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করে।

অতএব নিজের পণ্যদ্রব্যকে অপরের পণ্যদ্রব্যের সহিত পারস্পরিক সদিচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতে বিনিময় করিয়া লওয়াই ইসলামী অর্থনীতিতে ধন-বিনিময়ের মূল কথা।

ধন-বিনিময়ের প্রাচীন পদ্ধতি হইতেছে একটি পণ্যের পরিবর্তে অন্য একটি পণ্য গ্রহণ করা। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ধন-বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা প্রবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। খায়বরের শাসনকর্তা মদীনায় আসিয়া নবী করীম (স)-এর সম্মুখে খুব উৎকৃষ্ট খেজুর পেশ করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'খায়বর এলাকায় সাধারণত এই প্রকার খেজুরই কি উৎপন্ন হইয়া থাকে? উত্তরে শাসনকর্তা বলিলেনঃ সাধারণত এইরূপ উৎকৃষ্ট খেজুর সর্বত্র ফলে না। এইজন্য আমরা এই ধরনের এক সের খেজুর সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর দুই সের খেজুরের বিনিময়ে খরীদ করিয়া থাকি।' নবী করীম (স) ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ

لَاتَفْعَلْ بِعِ وَالْجَمْعَ بِالدَّارَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا-

এইরূপ করিও না, বরং সাধারণ খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় কর এবং উৎকৃষ্ট খেজুর মুদ্রার বিনিময়েই ক্রয় কর।[১]

বস্তুত পণ্য-দ্রব্যের মূল্য মুদ্রার মানদন্ডেই সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। 'বার্টার' বা পণ্য-বিনিময়ের প্রাচীন রীতিতে অন্যান্য অনেক প্রকার বাস্তব অসুবিধা ছাড়াও পণ্যদ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব হওয়াও একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা, সন্দেহ নাই। পরন্তু একই জাতীয় বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের দরুণ বেশী ও কম পরিমাণের সহিত বিনিময় হইলে তাহাতে সুদ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই জন্যই

১. বুখারী, ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ

নবী করীম (স) এই ধরনের পণ্য-বিনিময় সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ "ইহাতো সুদ।" নবী করীম (স)-এর সমীপে হযরত বিলাল (রা) কিছু পরিমাণ খেজুর উপঢৌকন-স্বরূপ পেশ করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কোথা হইতে আনা হইয়াছে?" উত্তরে বেলাল (রা) বলিলেনঃ "আমাদের দুই 'ছা' (আরবীয় পরিমাণ—এক 'ছা' দুই সেরের সমান) নিকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে এক 'ছা' ভাল খেজুর আনিয়াছি, শুধু আপনার সম্মুখে পেশ করার উদ্দেশ্যে। নবী করীম (স) এই কথা শুনিয়া বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ "ইহা স্পষ্টরূপে সুদ, এইরূপ বিনিময় করিও না। এইরূপ বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভূত হইলে নিকৃষ্ট খেজুর অন্য কোন দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া, সে দ্রব্যের বিনিময়ে ভাল খেজুর ক্রয় করিও। (বুখারী)

## ধন-বিনিময়ের ভুল পন্থা

ইসলামী অর্থনীতিতে একচেটিয়া ব্যবসায়-প্রথা সাধারণভাবে সমর্থিত নহে। ইসলাম পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কে যথাসম্ভব বাধা-বিমুক্ত ও সর্বসাধারণের সমান অধিকারের আওতায় আনিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। অতএব কেহ যদি কোন পণ্যদ্রব্যের সমগ্রটা অন্যান্য সকলের অজ্ঞাতে খরীদ করিয়া লয় এবং নিজের একাধিকারভুক্ত করিয়া নিজ ইচ্ছামতই উহার মূল্য নির্ধারণ করে কিংবা উহা যাহাদের প্রয়োজন, তাঁহাদের কাহারো নিকট অত্যধিক চড়া দামে বিক্রয় করে আর অনেক লোককেই তাহা হইতে বঞ্চিত রাখে, তবে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহা মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে—ইসলামী সমাজে এইরূপ স্বেচ্ছাচার কিছুতেই বরদাশত করা যাইবে না। কারণ প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হইলে অসংখ্য মানুষের জীবন অচল হইয়া পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঠিক এই জন্যই, পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকা প্রতারণা বা শঠতার প্রশ্রয় দেওয়াকেও ইসলামী অর্থনীতি কখনই বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। যে সব ক্রয়-বিক্রয়ে লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা যাহাতে এক পক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অপর পক্ষের নিশ্চিতরূপে লাভবান হওয়া অবধারিত, ইসলামী অর্থনীতিতে তাহাও সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কারণ এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামী সমাজের ঐক্যভিত্তি চূর্ণ এবং ইনসাফের নীতি লংঘিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

## পণ্যদ্রব্য-পরিমাপে অসাধুতা

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার সঠিক পরিমাপ না করা—ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা নিজ হাতে বেশী ওজন করিয়া লওয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ-

(المطففين- ١-٣)

যাহারা ওজনে কম দেয়—পরের জিনিস ওজন করিয়া নিলে তখন পুরাপুরিই গ্রহণ করে; কিন্তু অপরকে যখন ওজন করিয়া দেয়, তখন উহার পরিমাণ কম দেয়—ইহারা নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হইবে।

বলা বাহুল্য, এই 'ধ্বংস' কেবল পারলৌকিককই নহে, ইহকালীনও বটে এবং কেবল নৈতিকই নহে, অর্থনীতির দিক দিয়া—জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইহা দ্বারা মারাত্মক ধ্বংস টানিয়া আনা হয়—এই জন্যই কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেঃ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ-

(الشعراء- ١٨١-١٨٣)

পণ্যদ্রব্যের ওজন পূর্ণ কর, ওজনে কম দানকারী হইও না। সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন কর, লোকদিগকে পরিমাণে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষযুক্ত দ্রব্য দিও না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়কারী হইয়া বিপর্যয় করিয়া বেড়াইও না।

পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা, ভুল প্রচারণা করা, অথবা পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা ইহাতে জনগণ পারস্পরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

কোন এক দোকানে শস্যস্তুপের উপরিভাগ শুষ্ক এবং নিম্নভাগ সিক্ত দেখিয়া নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেনঃ

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي-

(مسلم، ترمذى)

তুমি ভিজা শস্য উপরে রাখিতেছ না কেন?....... তাহা রাখিলে খরিদ্দারগণ উহার প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াই ক্রয় করিত—প্রতারিত হইত না। বস্তুত যে লোক আমাদিগকে প্রতারিত করে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। (মুসলিম, তিরমিযী)[১]

অর্থাৎ সে আমার উপস্থাপিত হেদায়েত অনুযায়ী চলে না, আমার দেওয়া জ্ঞান ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে না এবং আমার উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে না।

১. এই হাদীস অনুযায়ী ব্যবসায়ে কোনরূপ প্রতারণা করা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেনঃ

حديث ابى هريرة حديث صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام-(ترمذى)

আবূ হুরাইয়া বর্ণিত এই হাদীসটি সহীহ। বিশেষজ্ঞগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাঁহারা ব্যবসায়ে ধোঁকাবাজীকে ঘৃণা করেন এবং বলিয়াছেনঃ ব্যবসায়ে ধোঁকাবাজী সুস্পষ্ট হারাম।

ইসলামী সমাজে ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি লংঘন করা একটা মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। যে লোক অপরাধে লিপ্ত বা অভ্যস্ত তাহাকে ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি দেওয়া যায় না। দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা বাতিল করিতে হইবে, ইহাই ইসলামের বিধান। (تحفة الاحوذى)

## লাভের আশায় পণ্য মওজুদ

অস্বাভাবিকভাবে অধিক মুনাফা লুটিবার লোভে ব্যবসায়ীগণ সাধারণ সুলভ পণ্য বিপুল পরিমাণে খরীদ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। ফলে বাজারে দুস্প্রাপ্যতার দরুন উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য তীব্র গতিতে উর্ধ্বগামী হইতে থাকে। ইহার পরিণামে তাহা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সীমার বাহিরে চলিয়া যায় এবং দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। হয়তবা অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়ার উপক্রম হয়। তখন মুনাফা শিকারীদল নিজেদের ইচ্ছামত দর নির্ধারণ করে এবং পশ্চাৎদ্বার হইতে বিক্রয় করিতে শুরু করে। আর কোন প্রকার ভয় না থাকিলে প্রকাশ্য ভাবেই এই অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। ফলে জনগণের পক্ষে এইরূপ পণ্য সংগ্রহ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়। আর সংগ্রহ করা গেলেও সেজন্য অস্বাভাবিক মূল্য দিয়া জনগণকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। ইসলামী অর্থনীতি এই ধরনের hoarding আদৌ সমর্থন করে না। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئُ– (مسلم، ابو داؤد)

পণ্যদ্রব্য আটক করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী নিঃসন্দেহে অপরাধী।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلى لله عليه وصلعم) اَنْ يُّحْتَكَرَ الطَّعَامَ – (بيهقى)

অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্যপণ্য আটক করিয়া রাখিতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

مَنِ حْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِىَ مِنَ اللّٰهِ وبَرِىَ مِنْهُ–

(مسند احمد، حاكم)

যে ব্যক্তি অতিরিক্ত চড়া দামের আশায় চল্লিশ দিন যাবত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করিয়া আটকাইয়া রাখিবে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাহার এবং তাহার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

হযরত আবূ আমামা রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهٖ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفَّارَةٌ– (رزين)

যে লোক চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যপণ্য আটক করিয়া রাখে অতঃপর যদি তাহা সম্পূর্ণ দানও করিয়া দেয়, তবুও তাহার এই আটক করিয়া রাখার গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

অতএব অত্যধিক মুনাফা লুটিবার আশায় খাদ্যপণ্য আটক করিয়া রাখা ইসলামী শরীয়াতে সম্পূর্ণ হারাম।[১]

খাদ্যদ্রব্য আটক করিয়া যাহারা অত্যধিক মুনাফা লুটিতে চাহে তাহাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَا رَحَزِنَ وَاِنْ اَغْلَهَا فَرِحَ-(مسلم)

খাদ্য শস্য আটককারী ব্যক্তির মনোবৃত্তি অত্যন্ত বীভৎস ও কুটিল। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে তাহারা চিন্তিত হইয়া পড়ে আর তাহা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

অতএব যে সব উপায়ে অবাধ ক্রয়-বিক্রয় ও ধন বিনিময় ব্যাহত হয়, ক্ষুণ্ণ হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যবসায়ীগণ যদি পণ্যদ্রব্য আটক করিয়া অধিক মূনাফা লুটিবার চেষ্টা করে তবল ইসলামী রাষ্ট্র সে ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য এবং তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া এই কাজ হইতে বিরত রাখার এবং আটককৃত খাদ্যপণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উহার কর্তব্য।[২]

পণ্য মওজুদ করণ পর্যায়ে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, যদি কোন লোক নিজের জমির ফসল হইতে নিজের ও পরিবারবর্গের সম্বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য খাদ্য ফসল সঞ্চয় করিয়া রাখে,তবে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। একটি হাদীসের ব্যখ্যায় ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

فی هذا الحديث جواز ادخار قوت ستاوجواز الأدخار للعيال وان هذا لا يقدح فی التوكل، واجمع العلماء علی جواز الا دخار فيما يستغله الائسان من قريته كما جری للنبی صلی اللّٰه عليه وسلم-

আলোচ্য হাদীস হইতে সম্বাৎসরিক খাদ্য এবং পরিবারের লোকজনের খোরাকী জমা করিয়া রাখা সাধারণ অবস্থায় জায়েয বলিয়া প্রমাণিত হয়। বস্তুত মানুষ তাহার নিজের জমি-ক্ষেত হইতে যে ফসল লাভ করে তাহা হইতে প্রয়োজন পরিমাণ সঞ্চয়

---

১. نبوی شرح مسلم

২. নববী (تحفة الاحوذی ج ٥ ص ٢٨٢)

করিয়া রাখা জায়েয—এই বিষয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত। নবী করীম (স)-এর জন্য এইভাবে সম্বাৎসরিক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত।[১]

ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, 'যদি কেহ বাজার হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া পরিবারবর্গের সম্বাৎসরিক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ব্যাপারটি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। সেই সময় যদি দেশের খাদ্য সংকট অবস্থা বিরাজ করে, তবে তাহা জায়েয হইবে না। এইরূপ অবস্থায় যদি কিছু দিন বা এক মাস কালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, আর তাহার দরুন যদি সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ার আশংকা না হয় তবে তাহা জায়েয হইব। আর প্রাচুর্যকালে এক বৎসর কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য খাদ্য খরীদ করিয়া রাখাও জায়েয হইবে।[২]

পরন্তু ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ষড়যন্ত্র বা কোন প্রকার কুটিল কারসাজীর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া জনগণের ক্রয় ক্ষমতার সীমা লংঘন করিলে ইসলামী রাষ্ট্র দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোন জরুরী কারণ ব্যতীত—দ্রব্য-মূল্য নির্ধারণের অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নাই। অতএব নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে উহার দর বাঁধিয়া দেওয়া যাইবেনা। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় একবার অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সাহাবায়ে কিরাম দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَلِىٍّ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقِىَ رَبِّىْ
وَلَيْسَ اَحَدُكُمْ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِىْ دَمٍ وَلَامَالٍ- (ترمذى)

খাদ্যমূল্য নির্ধারণকারী হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই ইহার মূল্য হ্রাস করেন। কারণ রুজীর মালিক তিনিই, উহার মূল্য তিনিই নির্ধারণ করেন এবং আমি আল্লাহ্র সহিত এইভাবে সাক্ষাৎ করিতে আশা পোষণ করি যে, তোমাদের কাহারো রক্তপাত বা মাল-সম্পদ হরণের জুলুম করিয়াছি বলিয়া সেদিন আমার প্রতি কেহ দাবি তুলিবে না।

ইহার কারণ এই যে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ মূলত ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার ব্যাপার। অতএব মূল্য নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা তাহাদের থাকা উচিত। অন্যথায় তাহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ হইয়া পড়ে। তবে এই ব্যাপারে কাহারো উপর কোন প্রকার জুলুম হইলে কিংবা প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনগণকে বিশেষ অসুবিধার

---

১. نووى شرح مسلم

২. (تحفة الاحوذى ج ٥ ص ٢٨٢)

সম্মুখীন হইতে হইলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। কেননা তখন ব্যাপারটি আর ব্যক্তিগত না থাকিয়া সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়।[১]

ইসলামী অর্থনীতি সমগ্র ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত ও নিছক পারিবারিক ব্যাপারের উপর সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়া থাকে। এই জন্যই, যে সব ব্যাবসায়ে একদিকে ব্যক্তির বা গোষ্টীর বিপুল স্বার্থ লাভ হয় আর অপর দিকে তাহাতে সাধীত হয় সামগ্রিক বা সামাজিক ক্ষতি, নৈতিক চরিত্র হয় বিনষ্ট—ইসলামী অর্থনীতি তাহা আদৌ বরদাশ্‌ত করে না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতি অবাধ ও উদার নীতি পোষণ করে। এই ব্যাপারে কোনরূপ অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা ইসলাম সমর্থন করে না—তাহা ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্র—যাহার দিক হইতেই হউক না কেন। এই কারণেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া, স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া; প্রয়োজন-অনুযায়ী খাল ও নদী খনন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। হযরত উমর ফারূক (রা) মিশরে যে খাল খনন করিয়াছিলেন তাহার ফলে মিশর ও মদীনার মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছিল এবং উভয় দেশে দ্রব্যমূল্য একই স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। দ্বিতীয় খলীফা এই জন্য অনেক পাকা সড়কও নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশংকা হইলে রাষ্ট্র রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রত্যাহার করিতে হইবে।

পণ্যের সরবরাহ ও পরিবেশনের পরিমাণ এবং উহার গতিধারার যে নিকটতম সম্পর্ক রহিয়াছে উহার মূল্যমান নির্ধারণের সহিত, তাহা অর্থনীতিবিদ মাত্রেরই জানা আছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি পণ্যের সরবরাহ পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য অনিবার্যরূপে হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে উক্ত পণ্যের সরবরাহ কম হইলে উহার মূল্য নিশ্চিতরূপে উর্ধ্বমুখী হইবে। কিন্তু এই মূলনীতি অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হইতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফের মত, একটি পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ কম হইলেও উহার সস্তা হওয়া এবং উহার প্রাচুর্য সত্ত্বেও দাম চড়া হওয়া অসম্ভব বা বিচিত্র নয়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বাজারে পণ্যমূল্যের সামঞ্জস্য বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। এখানে যেমন ইচ্ছামত অধিক মূল্য গ্রহণের অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় না; অনুরূপভাবে উহার ন্যায্য মূল্যের অনেক কমে বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ের একচেটিয়া

১. এই পর্যায়ে যে কয়টি হাদীসই বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ ও সচ্ছল অবস্থা এই দুইয়ের মাঝে সাধারণত কোন পার্থক্য করা যায় না। তবে ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ বা স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি দেখা দিলে তখন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া জায়েয। রাসূলে করীমের উপরোক্ত হাদীস হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয়। তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া জুলুম। কিন্তু কোন অবস্থায় তাহা না করার দরুন যদি জনসাধারণের উপর জুলুম হইতে থাকে, তবে তখন তাহা না করাই বরং অতিবড় জুলুম।

অধিকার (Monopoly) সৃষ্টি করার সুযোগ কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। হযরত উমর (রা) একজন লোককে সাধারণ বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে 'মুনাক্কা' বিক্রয় করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'হয়-প্রচলিত মূল্যে বিক্রয় কর; অন্যথায় আমাদের বাজার হইতে চলিয়া যাও।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) কারণ, একজন ব্যবসায়ী পণ্য মূল্য অন্যায়ভাবে হ্রাস করিয়া দিয়া সকল খরিদ্দারকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে চাহিলে ব্যবসায়ের গোটা বাজারটাই নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ভীষণ ক্ষতি হয়। ফলে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

## রেশনিং প্রথা

উপরে বলা হইয়াছে, ইসলামী অর্থনীতি দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের স্বাধীন ও অবাধ ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার দিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ—কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইসলামী অর্থনীতির আদর্শসম্মত নয়। কিন্তু বাস্তবিকই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং অবাধ ক্রয়-বিক্রয় করা অপরিহার্য বোধ হইলে তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ, সর্বাত্মক প্লাবন ও যুদ্ধবিগ্রহই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইহার কোন একটির দরুন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কিছুমাত্র পশ্চাদপদ হইবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তখন গোটা অর্থনীতির উপর পূর্ণ কন্ট্রোল প্রবর্তন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য ও মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য দ্রব্য কন্ট্রোল করিবে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিবে। নবী করীম (স)-এর সময় তাঁহার প্রেরিত এক সৈন্যবাহিনীতে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় সেনাধ্যক্ষ হযরত আবূ উবাইদাহ (রা) সৈনিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অনুরূপ একটি বাহিনী সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত হইয়াছিল হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে। পথিমধ্যে ইহাদের খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন সৈনিকদের প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে যে খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা একস্থানে স্তূপীকৃত করিবার জন্য সেনাপতি নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং তাহা দৈনিক নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ অনুযায়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (বুখারী)

স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তিনিও চৌদ্দশত লোকের নিকট অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করিয়া উহা সকলের মধ্যে নিয়মিতরূপে বন্টন করিয়াছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের সময় (১৮হিঃ) মদীনায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তখন বহু পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনার পর চতুর্দিক হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং তাহা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করার জন্য রেশনকার্ড ইস্যু করা হইয়াছিল।

## ধন-বিনিময়ের বিবিধ ব্যবস্থাঃ মুদ্রা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানব-সভ্যতার প্রথম অধ্যায়ে পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল; কিন্তু জীবনের এই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পর সভ্যতার বিবর্তিত ও উন্নততর পর্যায়ে ইহার জন্য কোন-না-কোন মাধ্যমের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দেখা দেয়। ইসলামের ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনারই পুণরাবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত মুদ্রার সাধারণ ব্যবহার শুরু হইয়াছিল। অধ্যাপক জিভেন্সের ভাষায়, মুদ্রা বলা হয় ধাতুনির্মিত এমন কতকগুলি টুকরাকে, যাহার ওজন ও অকৃত্তিমতা উহার উপর অঙ্কিত নক্সা দ্বারাই প্রমাণিত হয়[১]।

## মুদ্রার গুরুত্ব

নবী করীম (স)-এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, তিনি পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের পরিবর্তে মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় কার্য সম্পাদনের প্রথা চালু করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইসলামী অর্থনীতি এবং শরীয়াতী বিধানে যাকাত, দেন-মহর প্রভৃতি যাহা কিছুর আদেশ করা হইয়াছে, তাহা পণ্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারাই আদায় করা হয়। খারাজ, জিজিয়া ও শুল্ক ইত্যাদিও মুদ্রায় আদায় করা ভিন্ন উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত মজুরী, পারস্পারিক ব্যবসায় কিংবা একজনের মূলধনে অপরের ব্যবসায় পরিচালনাও ইহারই সাহায্যে সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব ইহা হইতেই অনুধাবন করা যায়।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই মুদ্রা প্রস্তুত করা, উহার মূল্য নির্ধারণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উহার প্রবর্তন করার অধিকার একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেরই রহিয়াছে। রাষ্ট্রীই সনদ ব্যতীত কোন মুদ্রাই জনগণের মধ্যে চালু এবং পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

উপরন্তু প্রয়োজন অনুভূত হইলে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোটও ব্যবহার করা যাইতে পারে। হযরত উমর ফারূক (রা) প্রয়োজন দৃষ্টে চর্মনির্মিত 'নোট' ব্যবহার করিয়াছিলেন।[২]

ইসলামের প্রথম অধ্যায়ে নোটের পরিবর্তে আর একটি জিনিস ব্যবহার করা হইত। কোন ব্যক্তি বহুদূর পথে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে সে স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় ভারী মুদ্রা সঙ্গে না নিয়া তাহা হইতে অত্যধিক মূল্যে হীরা-জহরত খরীদ করিয়া লইয়া যাইত এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া সেই দেশের প্রচলিত নগদ মুদ্রা লাভ করিত।[৩]

বর্তমান কালের লোক ব্যাংকের নোট বা চেক নিয়া অনুরূপ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে।

---

১. অধ্যাপক জিভেন্সঃ Mechanism of Exchange; Chapter VII
২. আলকাত্তানী ঃ কিতাবুত তারাতীবুল ইদারিয়া, ১ম খণ্ড
৩. জর্জি জায়দান ঃ তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী ৫ম খণ্ড

## আন্তর্জাতিক মুদ্রা

বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় ব্যবসায়ী-পদ্ধতিতে চলিতেছে। যাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহারা বিনিময় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করে এবং সে জন্য তাহাদিগকে রীতিমত বাট্টা দিতে হয়।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এই ধরনের বিনিময় প্রথাকে অসংগত ঘোষণা করিয়াছে এবং এইরূপ বিনিময়ের মাধ্যমে 'বাট্টা' বাবদ যাহা কিছু নেওয়া হয়, তাহাকে সুদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কেবল 'ক্রেডিট এক্সচেঞ্জ'-ই সুদ হয় না, নগদ আদান-প্রদানের সময়ও যাহা কিছু 'বাট্টা' দেওয়া-নেওয়া হয় তাহাও সুদই হইয়া থাকে।

নবী করীম (স)-এর বাণী হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এক দেশের মুদ্রা মূল্য যদি অন্যান্য দেশের মুদ্রা-মূল্যের সমান হয়, তবে এই উভয় দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় সমান পরিমাণেও নগদ আদান-প্রদানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَاتَبِيْعُواالدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بَالدِّرْهَمَيْنِ-

একটি স্বর্ণ মুদ্রাকে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে এবং একটি ধাতব মুদ্রাকে দুইটি ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করিও না।[১]

অন্য একটি হাদীসে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময়-হার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে এ ভাষায়ঃ

اَلدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا-

স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রার সহিত এবং ধাতব মুদ্রা ধাতব মুদ্রার সহিতই বিনিময় করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কম-বেশী করা যাইবে না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী অর্থনীতিবিদগণই উল্লিখিত হাদীস দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারেন। সাধারণত এক দেশের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার সহিতই বিনিময় হয়; কিন্তু এক দেশের মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশের মুদ্রা গ্রহণ করার জন্য বাট্টা দিতে হয়। ইসলামী অর্থনীতি সমগ্র দুনিয়ার আন্তর্জাতিক মুদ্রার প্রচলন করার পক্ষপাতী। বস্তুত বর্তমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন উত্তম পন্থাই থাকিতে পারে না। বিনিময় সমস্যা ও বিনিময়-গোলক-ধাঁধার দরুন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য বর্তমান সময় অত্যন্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় বিশ্বনবীর এই চির সত্য বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ স্বর্ণ বা

১. موطا امام مالك

রৌপ্য মুদ্রার মান ওজন সমান করিয়া লইত এবং বাট্টা দেওয়া-নেওয়ার প্রথা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিত, তবে বিশ্বের মানবসমাজ নানাবিধ অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইত, ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধ হইত; প্রাচুর্য ও দারিদ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হইত। অনুরূপভাবে একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও অনেকখানি উন্মুক্ত ও সুগম হইত।

## মুদ্রা জাল প্রতিরোধ

ইসলামে মুদ্রা জাল করা কঠিন অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহা সমাজ-শৃঙ্খলা ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিনাশ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টার সমপর্যায়ভুক্ত অপরাধ। এই কারণে যে কোন প্রকার মুদ্রা চূর্ণ বা নষ্ট করা ও নিষিদ্ধ হইয়াছেঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ-

মুসলমানের জাতীয় মুদ্রা চূর্ণ (বা নষ্ট) করিতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।[১]

## প্রতিশ্রুতি-পত্র (Letter of credit)

নগদ টাকার পরিবর্তে 'ক্রেডিট' নোটের মাধ্যমেও অনেক সময় পণ্য দ্রব্যের বিনিময় কিংবা শ্রমের মজুরীর আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমান যুগে যখন ক্রেতা এক স্থানে এবং বিক্রেতা বহু দূরবর্তী অন্য এক দেশে থাকিয়াও পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে এবং ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাইতেছে তখন ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

'ক্রেডিটে'র সংজ্ঞা প্রদান করিয়া অধ্যাপক 'লক' বলিয়াছেন—'এক সীমাবদ্ধ সময়ে মুদ্রা আদায় করার আশাই হইতেছে ক্রেডিটের মূল কথা। ভবিষ্যতে টাকা আদায় করার প্রতিশ্রুতিতে হুন্ডি, চেক, সরকারী প্রমিসরী নোট, ব্যাংকের জারী করা নোট এবং পোষ্টাল অর্ডার ও মানি অর্ডার ইত্যাদিই ক্রেডিটের বিভিন্ন রূপ।' ডঃ থামস্-এর কথায় ক্রেডিট নোট মূলত নগদ টাকারই বিকল্প মাত্র।[২] ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সাহায্যে ব্যাপকভাবে বিনিময়কার্য সম্পন্ন করা সহজ এবং ঋণ-আদায় করায়ও প্রভূত সুবিধা হইয়া থাকে।

'প্রমিসরি নোট, ইস্যু করার প্রথা ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর (রা) মক্কা নগরে ইরাকগামী লোকদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার ভ্রাতা ইরাকের গর্ভণর মুছয়ীব বিন্ জুবাইর (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইতেন, লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিয়া লইত।[৩]

---

১. ابو دؤد

২. Element of Economics

৩. ابوداؤد

আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) এক শহরে ব্যবসায়ীদিগকে পণ্য দিতেন, এবং অন্য এক শহরে উহার মূল্য গ্রহণ করিতেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) হিজাজে লোকদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতেন এবং ইরাকে তাহা আদায় করিতেন; কিংবা ইরাকে টাকা গ্রহণ করিতেন এবং হিজাজে তাহা প্রত্যাবর্তন করিতেন।

মোট কথা, হুন্ডীর মারফত উল্লিখিতরূপে টাকার আদান-প্রদান করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে নাজায়েয নহে।[১] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'হুন্ডি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ 'ইহাতে কোন দোষ নাই।' হযরত আলী (রা)-র মতও ইহাই ছিল।

ফকীহ ইব্‌নে সিরীন সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّهُ كَانَ لَايَرٰى بِالسَّفْجَاتِ بَأْسًا اِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ–

হুন্ডি-ব্যবহারে তিনি কোনরূপ দোষ মনে করিতেন না। অবশ্য যদি তাহা প্রচলিত নির্দোষ নিয়মে ব্যবহার করা হয়।

হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ

لَا بَأْسَ اَنْ يُّعْطِىَ الْمَالُ بِالْمَدِيْنَةِ وَيَأْخُذَ بِاَفْرِيْقَةَ– (مصنف ابن ابى شيبة)

মদীনায় পণ্য দিয়া আফ্রিকায় তাহা (বা উহার মূল) গ্রহণ করায় কোন রূপ দোষ নাই।

বস্তুত এই কাজে কোনরূপ সুদ না লইয়া কমিশন বা খরচ-বাবদ কিছু গ্রহণ করিলে তাহা না জায়েয হওয়ার কোনই কারণ নাই। ব্যাংক, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সরকারী সিকিউরিটি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফতে এক শহর হইতে অন্য শহরে পণ্য-দ্রব্য কিংবা নগদ টাকা স্থানান্তর করা এবং প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক মজুরী (Establishment Expenditure) বাবদ নির্দিষ্ট-হারে কমিশন লওয়া কোন রূপেই অসঙ্গত হইতে পারে না। অবশ্য তাহাতে সুদের প্রথা থাকিলে কিংবা এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরণ করার জন্য 'বাট্টা' গ্রহণ করিলে তাহা কোন মতেই জায়েয হইতে পারে না।

## হাওয়ালা (Novation)

ক'র টাকা পাওনা আছে খ'র নিকট কিন্তু ক নিজে গ'র নিকট ঋণী। এখন এই তিনজনই পরস্পর মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, গ ক'র নিকট এবং ক খ'র নিকট হইতে টাকা আদায় না করিয়া গ খ'র নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে। অর্থনীতির পরিভাষায় ইহাকে Novation বলা হয়।

---

১. মনে রাখিতে হইবে, ইহা একই প্রশাসন অধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে হুন্ডীর ব্যবহার সম্পর্কে কথা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হুন্ডীর কারবার চোরাচালানের পর্যায়ে গণ্য এবং নিষিদ্ধ।

একাধিক লোকের মধ্যে একই প্রকার বা একই পরিমাণের ঋণ-আদায় করার ইহা অতি সহজ পন্থা, সন্দেহ নাই। ইহা হুন্ডির একটি স্বতন্ত্ররূপ। জার্মান প্রাচ্যবিদ ফন্ ক্রেমার বলেন, 'হাওয়ালা' সম্পর্কে ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ যে গভীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুসলমানদের উন্নত ব্যবসায়ী কার্যক্রমের পরিচয় দেয়। ইসলামী অর্থনীতিতে ঋণ-আদায় করার ব্যাপারে এইরূপ 'হাওয়ালা' সম্পূর্ণরূপে সংগত।

বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-সংক্রান্ত ঋণ-আদায় করার ব্যাপারে 'হাওয়ালা'র (Novation) বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা 'ফরেন বিল অব্ একচেঞ্জে'র স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প হইতে পারে এবং শুধু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই নয়, বহির্বাণিজ্যেও ইহা দ্বারা অনেক সুবিধা ও পারস্পরিক ঋণ আদায় অনেকখানি সহজ হয়।

## চেক

প্রমিসরী নোট হিসাবে বর্তমান সময় চেক-এর যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। চেক মূলত ব্যাংক-মালিকদের নামে একটি নির্দেশনামা মাত্র, তাহাতে লিখিত পরিমাণ টাকা চাহিবা-মাত্রই চেক-বাহককে আদায় করিয়া দেওয়ার নির্দেশ থাকে।

কাজেই নগদ আদায় করার পরিবর্তে 'টাকা-আদায়ের নির্দেশনামা' বা চেকের সাহায্যে লেন-দেন করা কোনরূপেই অসংগত হইতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেই 'চেক'-এর ব্যবহার শুরু হইয়াছিল। বস্তুত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সময়ই ইহার ব্যাপক প্রচলন হয়।[১] মোট কথা চেক ব্যবহারে কোনরূপ আপত্তি থাকিবার কথা নয়। ইহার সাহায্যে ধন-বিনিময় কার্য বিপুল পরিমাণে সম্পন্ন হওয়া খুবই সহজ হয়।

১. তারীখই ইয়াকুবী, ২য় খন্ড

# ধন-বন্টন

ইসলামের শিল্পনীতি ও ভূমি-ব্যবস্থার দীর্ঘ আলোচনা হইতে অর্থোৎপাদনে সংগত পন্থা সম্পর্কে আমরা অবহিত হইয়াছি। এই আলোচনা হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, ব্যক্তি-মানুষ সংগত উপায়ে যাহা কিছু উপার্জন করিবে—তাহা নগদ সম্পদই হউক আর জমি-জায়গা ও দালান কোঠাই হউক—সে তাহার 'মালিক' হইবে। এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রে এক-এক ব্যক্তির নিকট বিপুল ধন-সম্পত্তি একীভূত ও কুক্ষিগত হইতে পারে। অথচ এইরূপে ধন-সম্পদের একীভূত হইতে দেওয়া মানব সমাজের পক্ষে যে কত মারাত্মক তাহা কাহারো অবিদিত নয়। ইহারই সুযোগে দুনিয়ায় পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় এবং তাহা বিরাট মানবতাকে (Humanity at Large) জীবন-যাত্রা নির্বাহের বুনিয়াদী ও অপরিহার্য প্রয়োজন হইতে নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। কাজেই ইসলাম বিশ্ব-মানবতার যে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞান সম্মত অর্থ ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাতে এইরূপ মানবতা-বিরোধী নীতি কিছুতেই অব্যাহতভাবে চালু থাকিতে পারে না। এইজন্য ইসলাম সকল প্রকার ধন ও সম্পত্তি সম্পর্কে মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ- (الحشر ٧)

যাবতীয় ধন-সম্পত্তির আবর্তন যেন তোমাদের শুধু ধনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া না থাকে।

কিন্তু অর্থ এবং সম্পদের উৎপাদন যতই প্রচুর হউক না কেন, উহার বন্টন ব্যবস্থা যদি বিশুদ্ধ নীতি ও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যকর না হয়, তবে তাহা নির্বিশেষে দেশ ও দেশবাসীর পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে। বন্টন-ব্যবস্থার ভুল নীতির দরুনই বর্তমান মানুষে-মানুষে আকাশছোঁয়া বিরোধ ও বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে ধনের প্রাচুর্য এবং অপরদিকে দুঃসহ দারিদ্রের সর্বগ্রাসী আক্রমণ মানব-সমাজকে ভারসাম্যহীন (Balanceless) করিয়া একেবারে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির পরস্পরের মধ্যেই আজ অনুরূপ বৈষম্য প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

অথচ ধন-সম্পদ যদি বাস্তবিকই নির্ভুল ও সুবিচারপূর্ণ পন্থায় বন্টন হইতে পারে, ধন-সম্পদের আবর্তন—উৎপাদন ও বন্টন—যদি বৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক পন্থায় হয়, স্থায়ী ও সর্বকালের প্রযোজ্য কোন বিধানের মারফতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর বুক হইতেই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হইতে পারে। একদিকের অর্থ-সম্পদের পর্বত

তুষারস্তুপের ন্যায় বিগলিত হইয়া এমন উদ্দাম ঝর্ণাস্রোতরূপে প্রবাহিত হইতে পারে, যাহা নিকট ও দূরের সকল 'শুষ্ক অঞ্চল'কেই সিক্ত করিতে পারে। একটি অর্থোৎপাদনকারী যন্ত্রের উৎপাদন অসংখ্য খাতে বাহিয়া অসংখ্য মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে ধন-বন্টনের স্বাভাবিক পন্থা অনুযায়ী চারটি প্রধান উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

(ক) নিজের, পরিবার-পরিজন, পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশী সর্বসাধারণ মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন।

(খ) সমাজের অক্ষম, অভাবী পংগু ও অর্থোৎপার্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ লোকদের প্রয়োজন পূর্ণকণার্থে অবশ্য দেয়— যাকাত, ছদকা, ফিত্‌রা এবং কুরবাণী, সাধারণ দান-খয়রাত ইত্যাদি।

(গ) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করার বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনবশতঃ আরো অধিক দানের কর্তব্য।

(ঘ) মালিকের অন্তর্ধানের পর তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে (ইসলামী বিধান অনুযায়ী) বন্টন করিয়া দেওয়া।

## ধন-ব্যয়

সম্পদ উৎপাদনের নির্দেশদান ও উৎপাদনের সংগত পন্থা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার বন্টন ও ব্যয়ের উপর ইসলামী অর্থনীতি খুব বেশী জোর দিয়াছে। কারণ, অর্থসম্পদ ব্যয় করা না হইলে তাহার এক কড়াক্রান্তিও মূল্য নাই । ধন-সম্পদ স্বভাবতই এমন একটি জিনিস, যাহা ব্যয় করা, ব্যবহার করা ও অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া ছাড়া উহা হইতে কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

এই জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একদিকে কৃপণতা পরিহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ- (ال عمران- ١٨٠)

আল্লাহ্‌র নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যে সব ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা যাহারা কৃপণতা করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহারা যেন এই কাজকে নিজেদের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে না করে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা এই দুনিয়ায় তাহাদের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর হইবে। শুধু তাহাই নয়, কিয়ামতের দিন এই সঞ্চিত ধন-সম্পদেই তাহাদের গলার বেষ্টকচক্র বানাইয়া দেওয়া হইবে।

অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ- (بنی اسرائیل - ۲۹)

তোমার হস্ত তোমার কণ্ঠের সহিত বাঁধিয়া রাখিও না—অর্থাৎ কৃপণতা করিও না।

অন্যদিকে গোটা সমাজকে লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ দিয়াছেনঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ- (البقره- ۱۹۵)

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর এবং তোমরা নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

এই আয়াতে গোটা সমাজের ধ্বংস এবং জাতীয় অর্থসম্পদ ব্যয় করাকে সমান পর্যায়ে দাঁড় করা হইয়াছে। অন্য কথায়, জাতীয় পর্যায়ে ধনসম্পদ ব্যয় না করিলে জাতীয় ধ্বংস অনিবার্য বলিয়া আয়াতটিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- (التوبه- ٤١)

তোমরা তোমাদের মাল ও জানপ্রাণ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাতেই তোমাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছ, যদি তোমরা জান ও বোঝ। অতএব অর্থ ব্যয় একটি জাতীয় কর্তব্য।

একদিকে অর্থসম্পদ ব্যয় করার আদেশ করিয়া এবং অপরদিকে কৃপণতা করিতে নিষেধ করিয়া মানুষকে নিরংকুশ ও বল্গাহারা হওয়া হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। অযথা ব্যয়, অপচয়, নিষিদ্ধকাজে ব্যয়-বিলাসিতা ইত্যাদি করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধও করা হইয়াছে। এত পরিমাণ ব্যয় করিতেও নিষেধ করা হইয়াছে, যাহার ফলে ব্যক্তিকে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতে হয়। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ-

(بنی اسرائیل- ۲۶-۲۷)

ধন-সম্পদের অপচয় করিও না, যাহারা এইভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে, তাহারা শয়তানের ভাই।

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا- (بنی اسرائیل- ۲۹)

তোমার হাত এতখানি উম্মুক্ত করিয়া দিও না, যাহার ফলে তুমি লজ্জিত, তিরস্কৃত এবং দুঃখীত হইতে পারে।

এরজন্য অর্থব্যয় করার ব্যাপারেও ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

كُلُوْا وَالشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- (العراف- ٣١)

খাও, পান কর, কিন্তু বেহুদা খরচ করিও না। কারণ বেহুদা খরচকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَالْقَصْدِ فِىْ الْفَقْرِ وَالْغَنٰى-

দারিদ্য ও প্রাচুয্য উভয় অবস্থায়ই অর্থব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ডাঃ ই. ভী রবিনসন বলিয়াছেনঃ

যে দেশের আয় ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়, সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হইতে বাধ্য কিন্তু ব্যয় যদি আয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে তবে তাহার ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটা অনিবার্য।[১]

জুয়াখেলা ও নেশার দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অযথা অর্থের অপচয় করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধঃ

يَااَيُّهَا الَّذِنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- (المائده- ٩٠)

হে ঈমানদারগণ! জানিয়া রাখ, মদ, জুয়া, অখোদার উপাস্য স্থল ব্যবহার এবং গায়েব জানিবার জন্য পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে তোমরা কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

## ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থব্যয়

ধন-সম্পদ ব্যয় করার সকল নিষিদ্ধ পথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا- (القصص- ٧٧)

এই দুনিয়ায় ও দ্রব্য সামগ্রীতে তোমার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা তুমি ভুলিয়া যাইও না।

---

১. কারওয়ার এ্যান্ড কারমাইকেল ঃ "ইলিমেন্টস অব ইকনমিক্স।"

অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য নিখিল মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এই পৃথিবীতেই সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা আহরণ করিয়া—অর্জন করিয়া—ভোগ-ব্যবহার করা প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া বৈরাগ্যবাদে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই বাঞ্ছনীয় নয়।

ইসলামী অর্থনীতি ধনব্যয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম দায়িত্ব দিয়াছে ব্যক্তির উপর—ব্যক্তির নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে ব্যয় করার আদেশ ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে। একজন সাহাবী নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমার নিকট মুদ্রা আছে, আমি তাহা কি করিব? উত্তরে নবী করীম (স) ইরশাদ করিলেনঃ

تَصَدَّقْ عَلٰى نَفْسِكَ- (ابو داؤد)

নিজের জন্য নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে—উহা ব্যয় কর।

অন্য একটি হাদীসে অর্থব্যয় প্রসংগে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَبْدَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا- (مسلم)

অর্থব্যয়ের কাজ প্রথমে নিজ হইতে শুরু কর। অর্থাৎ প্রথমে নিজের জীবিকা সংস্থানের কাজে ইহা ব্যয় কর।

ইসলামী অর্থনীতি উপার্জিত ধন-সম্পদের উপর স্বয়ং উপার্জনকারীরই প্রথম অধিকার স্বীকার করিয়াছে। আত্মহত্যা করা, অনশন ধর্মঘট করা এবং ইচ্ছামূলকভাবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করা হারাম হওয়ার ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ। এতঃপর নিজের পরিবারবর্গ—স্ত্রী-পুত্র, কন্যা ও ব্যক্তির সহিত একত্রে বসবাসকারী লোকদের জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ- (مسلم)

তোমার নিজের জন্য ব্যয় করার পর তোমার পরিবারবর্গের যে সব লোক তোমার উপর নির্ভরশীল,তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে।

পরের জন্য অর্থ ব্যয়ের কাজ পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করার দ্বারা শুরু করিবে।[১]

---

১. ইমাম ইবনে হাজার ইহার অর্থ লিখিয়াছেনঃ

...ا فی الا نفاق من تعول وابلزمك نفقته من عيالك فان فضل شیء فلغير ... (فتح البارى)

তোমার পরিবারবর্গের মধ্য হইতে যাহারা তোমার সঙ্গে থাকে ও যাহাদের খরচ বহন করা ... কর্তব্য, প্রথমে তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে। ইহার পর অবশিষ্ট থাকিলে তাহা অন্যদের জ... করিবে।

## নিকটাত্মীয়দের জন্য অর্থব্যয়

প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রয়োজন পূর্ণ করার পর তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয়দের অধিকার পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "ছেলায়ে রেহ্‌ম"। তাই কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَ قْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ- (البقره- ٢١٥)

হে নবী, জানাইয়া দাও, মুসললমানগণ যেন তাহাদের পিতামাতা নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, এতদ্ব্যতীত মানুষের উপকারার্থে আরো যত কাজ করিবে আল্লাহ্ (তাহা কবুল করিবেন, তিনি) সে সম্পর্কে অবহিত।

এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যক্তির নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূর্ণ করার পরই নিকটাত্মীয়দের, নিকটবর্তী প্রতিবেশীর, সমাজের অসহায় শিশু, গরীব, দুঃখী এবং নিঃস্ব পথিকদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অর্থ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। কোন কোন নিকটাত্মীয়দের জীবিকা নির্বাহের পূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হইয়াছে। অক্ষম উপার্জনহীন পিতা-মাতা ইত্যাদি এই পর্যায়ে উল্লেখ্য।

এই জন্যই ইসলামী সমাজ নিকটাত্মীয়দের অধিকার-লংঘনকারীকে স্বভাবতই কখনো বরদাশ্‌ত্ করিতে পারে না। দুর্নিবার সামাজিক চাপে তাহাকে এই অধিকার পূরণ ও দায়িত্ব পালনে একান্তভাবে বাধ্য করা হয়। এই জন্য নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهٗ اِلٰى جَنْبِهٖ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ-

নিজ প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত রহিয়াছে এ কথা জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পেট ভরিয়া আহার করে এবং সুখের নিদ্রায় অচেতন হয়, তাহার ঈমান আছে বলিয়া কোন প্রমান নাই।

অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীর জন্য অর্থব্যয়ের ব্যাপারে আরো অধিক উৎসাহ দানের নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارَ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا عَلٰى اَهْلِكَ-

... খরচ করিলে—আর একটি মুদ্রা তুমি কোন ক্রীতদাস ...লে আর একটি মুদ্রা কোন মিসকিনকে দান করিলে আর

একটি মুদ্রা তোমার পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করিলে; জানিয়া রাখ, এই সকল মুদ্রার মধ্যে তোমার পরিবারবর্গের জন্য ব্যয়কৃত মুদ্রাটিই সওয়াব ও পূণ্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

নিজ পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরনের পর নিকটাত্মীয়দের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং গরীব আত্মীয়দিগকে দান-ছদকার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

(ترمذی)

মিসকীনকে দান করা হইলে তাহা একটি দান মাত্র। কিন্তু নিকটাত্মীয় গরীবকে দান করা হইলে তাহা যেমন দান, তেমনি তাহা আত্মীয়তার হক্ রক্ষারও ব্যবস্থা।

## সামাজিক প্রয়োজনে অর্থব্যয়—যাকাত

এইভাবে ব্যক্তির ধন-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্র অধিকতর বিশাল ও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুত ইহা ব্যক্তির উপর সমাজের অধিকার। এই অধিকার পূর্ণ করা ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করার জন্য প্রথমতঃ ব্যক্তির উপর 'যাকাত' ফরয করা হইয়াছে। যাকাত কেবল সঞ্চিত অর্থ সম্পদের উপরই আরোপ করা হয় নাই, ব্যক্তির নিকট যে পুঁজিই সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—তাহা পালিত জন্তু জানোয়ার হউক, জমি ক্ষেত-খামার হউক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্য হউক, খনিজ দ্রব্য হউক কিংবা পুঞ্জীকৃত নগদ টাকা আর স্বর্ণ-রৌপ হউক—এই সব কিছুরই উপর যাকাত ফরয করা হইয়াছে। এই যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে ক্ষেত্র ইসলাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, দুনিয়ার কোন অর্থনীতিতেই তাহার তুলনা মেলে না।

মূলত ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের স্থায়ী ব্যবস্থা পুঁজিবাদ ধ্বংস করার সর্বপ্রধান হাতিয়ার। কোন সমাজে এই ব্যবস্থা যথাযথরূপে কার্যকর হইলে তথায় পুঁজিবাদ কখনই মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে না। যাকাত ব্যক্তির শ্রম-মেহনত এবং সৎভাবে ও সদুপায়ে উপার্জিত স্তুপীকৃত ধন-সম্পদ অনিবার্যরূপে বিগলিত করিয়া সমাজের প্রতি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ও কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌছাইয়া দেয়—সূর্যতাপ পর্বতশৃংগে অবস্থিত বরফস্তুপ গালাইয়া যেমন করিয়া প্লাবিত করে দিগ্-দিগন্তকে।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ- (البقره- ٤٣)

নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।

বস্তুত যাকাত-আদায় করা দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

فَانْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِىْ الدِّيْنِ- (التوبه- ١١)

যদি তাহারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ভাই হইবে।

ইহার পরিস্কার অর্থ এই যে, মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে যাকাত আদায় করা কর্তব্য। অন্যথায় কেহ মুসলমানই হইতে পারে না।[১] আল্লাহ তা'আলা যাকাতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা এত বলিষ্ঠভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা সঠিকভাবে আদায় না করিলে সে মুশরিক বা কাফির হইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেনঃ

وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰواةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ-

(حم السجده ٦-٧)

যে সব মুশরিক যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে, তাহারা কাফির, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

'যাকাত' শব্দের অভিধানিক অর্থ, পাক বা পবিত্র করা ও উৎকর্ষ সাধন করা, এই জন্য ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় 'যাকাত' বলা হয় সেই আর্থিক ইবাদাতকে, যাহা আল্লাহ্ ও বান্দাহ্‌র হক আদায় করিয়া ধন-সম্পদ পবিত্র করার জন্য এবং নিজের নফস ও সমাজ পরিবেশকে সকল প্রকার কৃপণতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, কুটিলতা ও দারিদ্রের পংকিলতা হইতে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সমর্থ লোকদের উপর কর্তব্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'মুসলমান' হইয়াও যাহারা যাকাত দেয় না পূর্বোক্ত আয়াতে তাহাদিগকেই মুশরিক বলা হইয়াছে।

বস্তুত যাকাত-বাবদ আদায়কৃত অর্থ যদি একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যয় করা যায়, তবে ইহা দ্বারা বিরাট জাতীয় কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। দেশের এয়াতীম, মিসকীন, অক্ষম, পংগু,অন্ধ, অসহায় সম্বলহীন বিধবা ইত্যাদি সকল মানুষের জন্যই স্থায়ী সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা চালু করা সম্ভবপর।

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত যদিও (ধনী) ব্যক্তির প্রতি ফরয করা হইয়াছে, কিন্তু মূলত ইহা একটি সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ-ব্যবস্থা। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে আদায় না করিয়া সামাজিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান—ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের'—মাধ্যমেই আদায় করা ইসলামের নির্দেশ।[২]

---

১ বলা বাহুল্য, যাহাদের উপর যাকাত ফরয হয়, যাকাত আদায় করার এই আদেশ কেবল তাহাদেরই জন্য

২. এই গ্রন্থের অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত দ্রষ্টব্য।

## সাধারণ দান

'যাকাত' বাধ্যতা মূলকভাবে প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা হয়। কিন্তু এই যাকাত প্রদান করিয়াই কোন ব্যক্তি জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পাইতে পারে না। সমাজ ও জাতির জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে এবং সে প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাকাত আদায় করার পর আরো অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রহিয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

فِيْ اَمْـوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّـائِلِ وَالْمَـحْـرُوْمِ- (الذريات- ١٩)

তাহাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে।[১]

যাকাত আদায় করিলেই এই অধিকার পূর্ণ হইয়া যায় না। ইহা যাকাত আদায় করার পরই বর্তিবে। তাই কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

يَسْـئَلُوْنَكَ مَـاذَا يُنْفِـقُـوْنَ قُلِ الْعَـفْـوَ- (البقره- ٢١٥)

তাহারা জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি খরচ করিবে। বলিয়া দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর।

এই জন্যই নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

انَّ فِيْ الْمَالِ حَقًّاسِوَا لزكَواةِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِيْ الْبَقَرَةِ وَلَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَنَبِيِّنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ اَتَى الزَّكٰواةَ- (ترمذى)

---

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

فِيْ اَمْوَالِهِمْ

মুসলমান মুত্তাকীদের ধনমাল, যাহাদের পরিচয় ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

اَلسَّائِلُ هُوَ الَّذِيْ يَسْاَلُ النَّاسَ وَيَسْتَجْدِى-

যে লোকদের নিকট চায় ও দান পাইবার জন্য প্রার্থনা জানায়।

اَلْمَحْرُوْمُ الَّذِي يُحْسَبُ غَنِيًّا فَيُحْرَمُ الصَّدَقَةَ لِتَعَفُّفِه- (عمدة القارى ج ٣ ص ٥٤)

অর্থঃ যে লোক বাহ্যত ধনী বলিয়া মনে হয় এবং কাহারো নিকট কিছু চায় না বিধায় দান পাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।' অথবা কিছু না কিছু উপার্জন করে বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হয় না, তাই অসুবিধা ভোগ করে।

যাকাত ছাড়াও (তাহাদের) ধনসম্পদে জাতির অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা বাকারার আয়াত পড়িলেনঃ 'কেবল পূর্ব-পশ্চিম দিকে মুখ করাই কোন সত্যিকার নেক কাজ নয়। বরং আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্তা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহ্র ভালোবাসার বশবর্তী হইয়া নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃসম্বল পথিক, অভাবগ্রস্থ ও দাস লোকদের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং নামায পড়া ও যাকাত দেওয়াই হইল যথার্থ নেক আমল।

এই আয়াতে ঈমানের পরে পরে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম মিসকীন, নিঃসম্বল পথিক সওয়ালকারী ও দাস বা ঋণগ্রস্থের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র মুহাব্বতের কারণে অর্থদান করার কথা প্রথমে বলা হইয়াছে এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহার পর। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সম্পদশালী ব্যক্তির উপর ঈমানের পরে পরেই সাধারণ অভাবগ্রস্থদের জন্য অর্থদান করা কর্তব্য হইয়া পড়ে এবং এই অর্থদানের দরুন যাকাত দেওয়ার কর্তব্য হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। বরং তাহার পরও যাকাত দিতে হইবে। অথবা বলা যায়, যাকাত দেওয়ার পরও লোকদের এই অধিকার আদায় করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সমাজের লোকদের আকস্মিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য 'করজে হাসানা' দেওয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের একটি কর্তব্য।

এই 'করজে হাসানা' ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুই পর্যায়ের প্রয়োজনেই দিতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কুরআন মজীদে এই উভয় পর্যায়ে 'করজে হাসানা' দেওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ দান করা হইয়াছে। ইরশাদ করা হইয়াছেঃ

مَنْ ذَلَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً- وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- (البقرة- ٥-٦)

কোন্ লোক আল্লাহ্ তা'আলাকে 'করজে হাসানা' দিতে প্রস্তুত আছে? যদি কেহ তাহা দেয়, তবে আল্লাহ্ উহার বদলে উহার কয়েকগুণ বেশী তাহাকে দান করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্র রুজী ও রোজগারের পরিমাণ কমও করেন, প্রশস্তও করিয়া দেন আর শেষ পর্যন্ত তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাদীসের ঘোষণানুযায়ী সাধারণ দানের তুলনায় করজে হাসানা দেওয়া অধিক সওয়াবের কাজ। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছেঃ

لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ عِنْدَهٗ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ الاَّ مِنْ حَاجَةٍ- (ابن ماجه)

কেননা সওয়ালকারী সব সময় কিছু-না-কিছু চাহিতেই থাকে; কিন্তু যে করজ চায়, সে প্রয়োজন ছাড়া কখনো চায় না।

এই 'করজে হাসানা'রই আর একটি দিক হইল সাধারণ দান। সমাজের সচ্ছল লোকদের জন্য ইহাও এক অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ দান করিতে সমাজের অবস্থাপন্ন লোকদিগকে অবশ্য প্রস্তুত করিতে এবং থাকিতে হইবে। এ দানকে কুরআনে 'আল্লাহ্র পথে দান বা ব্যয়' বলা হইয়াছে এবং কেহ তাহা করিলে তাহা কিছু মাত্র ব্যর্থ যাইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَمَاتُنْفِقُواْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ-

(الانفال- ٦٠)

তোমরা আল্লাহ্র পথে দান রূপে যাহা কিছুই ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তাহা তোমাদিগকেই পূর্ণ মাত্রায় ফিরাইয়া দিবেন। এই ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হইবে না।

বস্তুত এই ধরনের দান বা ব্যয়ে কেবল অন্য লোকদের কল্যাণ সাধিত হয় না, কেবল সমাজেরই উপকার হয় না, নিজেদেরও পরম কল্যাণ ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَمَا تُنْفِقُوْ مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ- (البقره- ٦٧٢)

তোমরা যে ধন-সম্পদই ব্যয় কর না কেন তহা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে নিয়োজিত হয়।

নবী করীম (স) এই পর্যায়ে বলিয়াছেনঃ

يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذَلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ وَضَلَا تُلَامُ

عَلٰى كَفَافٍ وَاَبْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُالْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى- (ترمذى)

হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার উদ্বৃত সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় কর, তবে তাহা তোমার জন্য ভাল। আর যদি তাহা হইতে বিরত থাক, তবে তাহা তোমার জন্য অকল্যাণ। তোমার প্রয়োজন পুরণের জন্য কমসেকম পরিমাণ যদি রাখ, তবে সে জন্য তোমাকে তিরস্কৃত করা হইবে না। তোমার দায়িত্বাধীন পরিবারবর্গের জন্য প্রথমেই ব্যয় করিবে। আর জানিয়া রাখ, দাতার হস্ত গ্রহীতার হস্ত হইতে উত্তম।

এ পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল লোকদের জন্য হযরত আলীর (রা) নিম্নোক্ত কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ اَمْوَالَهُمْ بِقَدْرٍ مَايُكْفِى فُقَرَاهُمْ فَلَنْ

جَاعُوْا اَوْ عَرَوْا اَوْ جَهَدُوْا فَبِمَنْعِ الْاَغْنِيَاءِ وَحَقٌّ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُّحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ- (المحلى ابى حزم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সচ্ছল লোকদের জন্য ইহা ফরয করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা গরীবদের জন্য এমন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে যাহা তাহাদের ভরণ পোষণ ও জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট হইবে। ইহার পরও যদি তাহারা অভুক্ত থাকে, নগ্ন পায়ে চলিতে বাধ্য হয় এবং কষ্টে পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ধনীরা তাহাদের (গরীবদের) হক আদায় করিতেছে না বলিয়াই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কিয়ামতের দিন ধনীদের নিকট হিসাব লওয়া ও সেই অনুপাতে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর এক দায়িত্ব হইয়া পড়ে।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর, খাজনা ইত্যাদি বাবদ অনেক অর্থই ব্যয় করিতে হয়। এইভাবে এক ব্যক্তির আয় হইতে তাহার জীবদ্দশায়ই ধন-সম্পদ বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। একস্থানে পুঞ্জিকৃত হইয়া পুঁজিবাদের সৃষ্টি হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিতে পারেনা। কিন্তু এতদসত্বেও যাহার নিকটই যে পরিমাণ ধন-সম্পদ একত্রিত হয়, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহা নানাভাবে খন্ড-বিখন্ড ও বিভক্ত হইয়া অসংখ্য হস্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইসলামী অর্থনীতিতে ধন-সম্পত্তির এইরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ার বিধানকে বলা হয় 'মীরাসী আইন'।

## মীরাসী আইন

মীরাসী আইনের মনস্তাত্বিক ও সামাজিক ভিত্তি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। প্রত্যেকটি মানুষই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় স্বভাবতই নিজের সন্তান সন্ততি ও নিকটতম আত্মীয়গণকে সচ্ছল অবস্থায় দেখিয়া যাইতে চাহে। অপরদিকে ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর তাহার যোগ্য লোকগণ যদি সহসা নিঃস্ব ও অসহায় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব অতি আকস্মিকভাবেই সমাজের উপর ন্যস্ত হয়। তখন এই অবস্থায় লোকগণ সমাজের উপর একটি দুর্বহ বোঝা হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাজের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা খুব সহজ কার্য নহে। এই জন্যই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রিয়তম ও নিকটতম লোকদের সচ্ছল ও পরমুখাপেক্ষিহীন দেখিতে ইচ্ছুক হয়। নবী করীম (স) এই জন্যই ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْوَرْثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرْهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ-

(بخاری، ترمذي)

উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল ও পরমুখাপেক্ষিহীন রাখিয়া যাওয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব ও দরিদ্র রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারণ, তাহাদিগকে দরিদ্র ও সর্বহারা

করিয়া রাখিয়া গেলে তাহারা সমাজের লোকদের সম্মুখে ভিক্ষার হাত দরাজ করিতে বাধ্য হইবে।

বস্তুত ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার যে অধিকার রহিয়াছে, তাহা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ব্যক্তির নিজের জীবনে যেসব লোকের সহিত তাহার বৈষয়িক কিংবা আত্মিক অথবা রক্তের নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং যেসব লোক তাহার লাভ-লোকসানকে নিজের লাভ-লোকসান বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহার মালিকানা ধন-সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর ঐসব লোকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বন্টন করা হইবে। এই উত্তরাধিকার আইন ব্যক্তির কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই প্রবর্তিত হইবে না, উৎপাদন উপায়ের (means of production) উপরও ইহা অনিবার্যরূপে কার্যকর হইবে।

ইসলামী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মীরাসী আইনের গুরুত্ব যে কত, তাহা নবী করীম (স)-এর নিম্নলিখিত বাণী হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেনঃ

تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْا هَاالنَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ- (ترمذی، ابن ماجه)

উত্তরাধিকার আইন নিজেরা শিখ, অন্যকে শিক্ষা দাও। কারণ ইহা ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞানের অর্ধেক।

নবী করীম (স) মীরাসী আইন অনুযায়ী ধন-সম্পত্তি বন্টন করার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেনঃ

اَقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلىٰ كِتَابِ اللّٰهِ- (مسلم)

ধন-সম্পদকে উহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বন্টন কর।

অধ্যাপক টাসগ্ লিখিয়াছেনঃ উত্তরাধিকার আইনের প্রভাব সুদুর-প্রসারী। একমাত্র এই ব্যবস্থাই যে ধনী ও নিঃস্বের মধ্যে চিরন্তনী ব্যবধানকে দূরীভূত করিতে পারে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।[১]

মিঃ রিম্‌জে "মোহামাডান ল" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ 'আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধন-বন্টনের যত নিয়ম ও পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল। এই আইনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও নিখুঁত সামঞ্জস্য অপরিসীম। ইহা কেবল আইন শিক্ষার্থীদেরই শিক্ষণীয় বিষয় নয়, জ্ঞানান্বেষী সকল ব্যক্তির পক্ষেই ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১. টাগ্‌স-প্রিন্সিপালস্ অব ইকনমিকস্, ২য় খন্ড—২৪৬ পৃঃ

## মীরাসী আইনের মূলনীতি

ইসলামের মীরাসী আইনের মূলনীতি নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছেঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا- (النساء -٧)

পিতা-মাতা এবং নিকটতম আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকদের জন্যও নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্যই এই অংশ সুনির্দিষ্ট, পরিমাণে তাহা কমই হউক কি বেশীই হউক।

এই আয়াত হইতে তিনটি মূলনীতি প্রমাণিত হইতেছেঃ

প্রথম এই যে, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়গণ যে সম্পদ ও সম্পত্তিই রাখিয়া যাইবে—তাহা স্থাবর হউক কি অস্থাবর, তাহাতে উত্তরাধিকারীদের অংশ রহিয়াছে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাহা অবশ্যই বন্টন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তির অংশ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লাভ করিতে পারিবে। স্ত্রীলোক বলিয়া কাহাকেও অংশীদার হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না কিংবা এমন কোন বাহ্যিক ব্যবস্থাও চালু করা যাইতে পারে না, যাহার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা যাইতে পারে।

মীরাসী আইন প্রসঙ্গে তৃতীয় মূলনীতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা হইল اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ 'সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি মীরাস লাভের অধিকারে সর্বাগ্রগণ্য।' উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির পিতা এবং পিতামহ বর্তমান থাকিলে মীরাস লাভের ব্যাপারে পিতাই অগ্রগণ্য হইবে। কারণ, উভয়ের মধ্যে পিতাই মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অনুরূপভাবে পুত্র এবং পৌত্র বর্তমান থাকিলে পুত্রই মীরাস লাভ করিবে, পৌত্র তাহা পাইবে না। যেহেতু পৌত্র অপেক্ষা পুত্রই মৃত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত বেশী নিকটবর্তী।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত তিনজন লোক মীরাস হইতে বঞ্চিত হইবেঃ

(ক) হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করিতে পারিবে না। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثَ (ابن ماجه)

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করিবে না।

(খ) ধর্মের বিভিন্নতার দরুণ একজন অপরজনের মীরাস হইতে বঞ্চিত হইবে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছেঃ

لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَاالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ- (بخارى، مسلم ج ٢ ص ١٠٠١)

মুসলমান ব্যক্তি কাফিরের এবং কাফির ব্যক্তি মুসলিমের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারিবে না।[১]

(গ) দেশ বা রাজ্যের বিভিন্নতার দরুনও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মীরাস লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইসলামী রাজ্যের ধন-সম্পত্তি যাহাতে কাফিরী রাজ্যে স্থানান্তরিত হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু কেহ অস্থায়ীভাবে পর্যটন কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গেলে, তাহার উপর মীরাস হইতে বঞ্চিত হওয়ার এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

## অসিয়ত

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবকাশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি সম্পত্তির উপর ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা-বাসনা কার্যকর করার সীমাবদ্ধ অধিকার দান করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে ব্যক্তির অসিয়ত করার অধিকার তন্মধ্যে অন্যতম। এই পর্যায়ে প্রথমে যে আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল তাহা এইঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ-

(البقره- ١٨٠)

তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হওয়া কালে ধন-মাল রাখিয়া যাইতে থাকিলে অসিয়ত করা তোমাদের জন্য ফরয করা হইয়াছে।

এই আয়াত অনুযায়ী ইসলামী সমাজে অসিয়ত চালু হইয়া যায়। কেননা তখন পর্যন্ত মীরাসের আয়াত নাযিল হয় নাই। অতএব প্রত্যেক সম্পত্তি-মালিক মৃত্যুর পূর্বে নিজ ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কোন অসিয়ত করে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার অসিয়ত পূরণ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ধন-বন্টনের দিক দিয়া ইসলামী অর্থনীতিতে এই অসিয়তেরও যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। এমন অনেক নিকটাত্মীয় থাকিতে পারে যাহারা বাহ্যিক বা আইনগত কোন কারণবশতঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে মীরাস লাভ করিতে

---

১. কোন মুসলমানের ওয়ারিস মুর্তাদ হইয়া গেলে সেও তাহার সম্পত্তির অংশ পাইবে না। ইমাম নবী লিখিয়াছেনঃ

وَلْمُرْتَدُّ لَايَرِثُ الْمُسْلِمَ بِالْاِجْمَاعِ-

'মুর্তাদ মুসলমানের অংশীদার হইবে না, ইহাতে সকল বিশেষজ্ঞ সম্পূর্ণ একমত।'

তাহা হইলে তাহার অংশ কি করা হইবে? এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, উহা অবশিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। আর কেহ বলিয়াছেন, উহা বায়তুলমালে জমা হইবে।

পারে না—বরং বঞ্চিত হয় এবং তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে, নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে। তখন সম্পত্তি-মালিকের কর্তব্য আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সুযোগকে ব্যবহার করা এবং বঞ্চিত নিকটাত্মীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই অসিয়ত করিয়া যাওয়া।

মূলত নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের জন্য এই অসিয়তই ছিল সর্ব প্রাথমিক ব্যবস্থা। মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে এই অসিয়তের প্রচলন করা হয়। কিন্তু মিরাসী আইন জারী হওয়ার পর হযরত নবী করীম (স) অসিয়ত ও মীরাস সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি মূল নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেনঃ

প্রথম নিয়ম এই যে, মীরাসী আইন জারী হওয়ার পর কেহ ওয়ারিস্ বা উত্তরাধিকারীর জন্য কোন অসিয়ত করিতে পারে না। অর্থাৎ মীরাসী আইনের মাধ্যমে যে সব নিকটাত্মীয়ের অংশ কুরআন মজীদ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্য অসিয়ত করিয়া উক্ত অংশে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। কোন ওয়ারিসকে মীরাস হইতে অসিয়তের সাহায্যে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ; আর কোন অংশীদারকে তাহার বিধিসম্মত অংশ ব্যতীত অসিয়তের সাহায্যে অতিরিক্ত জিনিস দেওয়া বিধেয় নহে। নবী করীম (স)-এর কথাটি এইঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَدَاَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ– (ترمذى)

নিশ্চয়ই মীরাসী আইনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দিয়া দিয়াছেন। যে লোক উত্তরাধিকারী তাহার জন্য কোন অসিয়ত নাই।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, অসিয়ত মোট সম্পত্তির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের উপরই কার্যকর হইবে, তাহার বেশী অংশ সম্পর্কে অসিয়ত করিলেও তাহা কার্যকর হইবে না। নবী করীম (স) হযরত সায়াদ বিন্ আবী-অক্কাস (রা)-এর এক প্রশ্নের জওয়াবে বলিয়াছিলেনঃ

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ– (ترمذى)

হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এবং এই এক-তৃতীয়াংশই অনেক।[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্পত্তির মালিক তাহার মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ নিজ আইন-সম্মত-উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি

১. নবী করীম (স) এই কথাটির প্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

لو غض الناس فى الوصية من الثلث الى للربع لكان احب الى الله-

লোকেরা যদি অসিয়তে এক-তৃতীয়াংশ হইতে এক-চতুর্থাংশে নামিয়া আসে, তবে তাহা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়।

অ-উত্তরাধিকারীদের জন্য—নিজ ঘরের বা বাহিরের অভাবী নিকটাত্মীদের জন্য, কিংবা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বা কাজের জন্য—অসিয়ত করিয়া যাইতে পারিবে।[১]

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতিতে অসিয়ত একটি সুপারিশ মাত্র নয়, ইহা অনিবার্যরূপে কার্যকর করিতেই হইবে। কুরআন মজীদ এই অসিয়ত সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ حقا على المتقين [২] ইহা মুত্তাক্বীন ও আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ধার্য করা একটি অনিবার্য অধিকার বিশেষ।[৩] এই অধিকার যথাযথরূপে আদায় করা হইলে পিতামহ কিংবা মাতামহের বর্তমানে যাহাদের পিতা কিংবা মাতার মৃত্যু হয়, তাহাদের মীরাস হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িবার কথা নয় এবং তাহা লইয়া কোনরূপ অভিযোগও করা চলে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধন-সম্পদের সমধিক বন্টন এবং অবাধ, অজস্র ও অবিশ্রান্ত আবর্তন সৃষ্টি করাই ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। ইহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বপূর্ণ সাংসারিক জীবন শুরু করার জন্য এই সংঘাত-সংকুল জীবন যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ার অনুকূলে কিছু না কিছু কাজ-কারবার ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্প-কার্য শুরু করিবার সুযোগ পায়। —নিজের প্রাপ্ত অংশকে অধিকতর বর্ধিত করিতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারে। উপরন্তু ইহারই পরিণামে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবার বিরাট সুযোগও ঘটে।

## মীরাসী আইনের গুরুত্ব

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, ইসলামী সমাজে এই মীরাসী আইন এক অনস্বীকার্য বিধান। ইহাকে কার্যকর করিলে ইহকালে ও পরকালে—সর্বত্রই পরিপূর্ণ সাফল্য ও অর্থনৈতিক প্রগতি লাভ করা সম্ভব। আর এই আইনকে জারী না করিলে—ইহার ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টন না করিলে, ইহকাল পরকাল সকল ক্ষেত্রে চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ঘটিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। কুরআন মজীদে মীরাসী আইন বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করার পরেই আল্লাহ্ তা'আলা জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেনঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ- (النساء- ١٣-١٤)

১. বিশেষজ্ঞদের মত হইল, নবী করীমের কথা হইতে স্পষ্ট হয় যে, এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অনেক বেশী। কাজেই উহার কম অংশের অসিয়ত হওয়া উচিৎ। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ উত্তরাধিকারীরা গরীব হইলে তাহাই হওয়া উচিৎ। আর ধনী হইলে এক-তৃতীয়াংশই হওয়া উচিৎ।

২. সূরা আল-বাকারাঃ ১৮০ আয়াত

৩. এমনকি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস বন্টনের পূর্বেই এই অসিয়ত পূরণ ও কার্যকর করিতে হইবে বলিয়া কুরআন মজীদে পর পর তাকীদ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

من تعد وصية يوصين بها

যে অসিয়ত করা হইয়াছে তাহা পূরণের পরই মীরাস বন্টন করা যাইবে।

এইগুলি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা, এই সীমা রক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন বেহেস্তে স্থান দিবেন, যাহার পাদদেশ হইতে প্রতিনিয়ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তাহাতে সে চিরদিন বসবাস করিবে। বস্তুত ইহাই হইতেছে চরম সাফল্য। পক্ষান্তরে এই সীমা রক্ষার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের নাফারমানী করিবে এবং আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করিবেন—ইহাতে সে চিরদিন অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হইবে।[১]

## মীরাসী আইনের তুলনামূলক আলোচনা

উত্তরাধিকার আইন দুনিয়ার প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক সমাজে কোন না কোনরূপ বর্তমান ও চালু রহিয়াছে। কিন্তু এক দেশের উত্তরাধিকার আইনের সহিত অন্য দেশের আইনের কোন সামঞ্জস্য নাই। স্কটল্যাণ্ডের মীরাসী আইন এক প্রকার, ইংল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী আইনের মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য। ইংল্যান্ডের মীরাসী আইন অনুসারে একজন ইংরেজ তাহার সর্বশেষ অসিয়ত ও দস্তাবীজের সাহায্যে নিজের ইচ্ছামত একজনকে সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করিতে পারে,[২] ফ্রান্সের "রোড নেপোলিয়ান" অনুযায়ী নিজ সন্তানের জন্য কিছু না কিছু রাখিয়া যাওয়া অপরিহার্য এবং সন্তানের সংখ্যানুপাতে অসিয়তের মারফতে পরিমাণের কম-বেশী অনায়াসেই করা যাইতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার আইনও বাতিল করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে মানুষের স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে দুনিয়ার চাপে পড়িয়া কমিউনিস্ট মতবাদের—মার্কসীয় দর্শনের—সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার স্বীকার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার আইনকেও চালু করা হইয়াছে। ইউরোপে সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমগ্র সম্পত্তির মালিক হওয়ার রীতি খুব বেশী করিয়া প্রচলিত আছে। এই জন্য অন্যান্য সন্তানদিগকে নিতান্ত অসহায় ও পাথেয়হীন হইয়াই জীবন যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ফলে সমগ্র জাতীয় সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে একিভূত হইয়া পড়ে।

ইসলামের অর্থনীতি তথা ইসলামের মীরাসী আইন এবম্বিদ সকল প্রকার জুলুম, অবিচার, শোষণ, অসামঞ্জ্যস্যতা ও ভারসাম্যহীন বন্টন পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। ইসলামী সমাজের মৃত ব্যক্তির সকল নিকটাত্মীয়ই—ছেলেমেয়ে, স্ত্রী এবং পিতামাতা সকলেই—মীরাস লাভ করে। ফলে বিরাট বিরাট ধন-সম্পত্তি অসংখ্য খণ্ডে

১. মীরাস বন্টনের মৌলিক বিষয়াদি আল্লাহ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্র বিধান হিসাবেই মানিতে হইবে। কিন্তু আয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা বলার সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্য করিতে হয় বলিয়া বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে যে, এই বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আনুসাঙ্গিক আইন রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন।

২. ইকনমিক অব ইনহেরিটেন্স-৪র্থ অধ্যায়, ৯০ পৃঃ

বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকেরই পরিমাণ কম হওয়ায় কেবল উহারই উপর নির্ভর করিয়া কর্মহীন, অলস ও বিলাসী জীবন যাপন করা কাহারোও পক্ষেই সম্ভব হয় না। কাজেই মীরাসী আইন একদিকে যেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পন্থায় অবিশ্রান্তভাবে ধন-সম্পত্তির বন্টন করিয়া থাকে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অর্থোপার্জনের মারফতে জাতীয় সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি করে। অতএব এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, দুনিয়ার অর্থনীতিতে ইসলামের মীরাসী আইনের কোন তুলনা নাই।

## একটি আশংকার জওয়াব

ধন-সম্পত্তি ও জায়গা-জমিকে মীরাসী আইন অনুসারে সঠিকভাবে বন্টন করিলে তাহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক ভূমিখন্ডের সীমা নির্দেশের জন্য আল বাঁধিতে হইবে। ফলে উহাকে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে চাষ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। অন্য কথায়, বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রাষ্ট্রে চাষের জমি পরিমাণে কম হইবে, উৎপাদন শক্তি হ্রাস পাইবে এবং ভূমিচাষ প্রথা চিরদিন মধ্যযুগের পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। তাহা যেমন কখনও 'আধুনিক' হইতে পারিবে না, অনুরূপভাবে তাহা কোনদিনই রাষ্ট্রের সামগ্রিক খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করিতে সমর্থ হইবে না। অন্যদিকে এক ব্যক্তির হাতে একিভূত মূলধন, শতহাতে বন্টন হইয়া গেলে ইসলামী সমাজে বৃহদাকার শিল্প ও ব্যবসায় কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুঁজি লাভ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রকে শিল্পায়িত করা এবং আধুনিক সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে না।

ইসলামের মীরাসী আইন সম্পর্কে বর্তমান কালের এক শ্রেণীর লোক উল্লিখিত রূপ আশংকা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই আশংকা যে কতখানি অমূলক, কত অন্তঃসারশূণ্য এবং ভিত্তিহীন, তাহা অর্থনীতি সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অনুধাবন করিতে পারেন। প্রথম কথা এই যে, ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইসলামী সমাজের ব্যক্তিগণ নিজেরা পরস্পর মিলিত হইয়া কোন বৃহত্তর অর্থোৎপাদনকারী কাজও করিতে পারিবে না। এইরূপ ধারণা মূলত সত্য নয়। ইসলাম ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যেমন সমাজ সৃষ্টি করে, তদ্রূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহত্তর জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, একাধিক লোক মিলিত হইয়া সকল প্রকার কল্যাণকর কাজ করিবে, এ জন্য ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশও দিয়াছেঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ–

(المائده- ۲)

তোমরা সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা কর—পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহত্তর কল্যাণ লাভ করিবার জন্য কাজ কর। পাপ ও

খোদাদ্রোহিতার কাজে পরস্পর মিলিত হইও না—এই কাজে কাহারো সহযোগিতা করিও না।

কাজেই ইসলামী সমাজের ভূমি মালিকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সমবায় ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিবে এবং ইহার পক্ষ হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়া চাষের কাজ করিতে পারিবে, সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ভূমির উর্বরা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে। তাহাতে ভূমির সীমানির্দেশক আল নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই। প্রত্যেকেরই অংশের পরিমাণ লিখিত থাকিবে এবং সমবায় প্রথায় চাষের পর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমির অংশ অনুপাতে ফসল বন্টন করিয়া লইতে পারিবে। যৌথ প্রথায় ভূমি চাষ করার সকল সুফলই এইভাবে লাভ করা যাইতে পারিবে, অথচ ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন জমির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খন্ড হওয়ার ফলেও তাহা কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

বৃহদাকার শিল্প-ব্যবসায়ও অনুরূপভাবে সামষ্টিক মূলধন ও সমবেত চেষ্টা সাধনার মারফতে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। মূলত তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন রহিয়াছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলে শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবার কেন্দ্রিক গোষ্ঠিবদ্ধতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। একই গোষ্ঠির মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। ফলে এই গোষ্ঠির লোকদের মধ্যে সম্পদ ও সম্পত্তি মীরাসী আইন অনুযায়ী বন্টন করা হইলেও তাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি পাইতে পারে না। ইহাতে মীরাসী আইনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয় নাকি? ইহার জওয়াবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ গোষ্ঠিবদ্ধতা (grouping) কেবল পুঁজিবাদী সমাজেই সম্ভব। ইসলামী সমাজে এইরূপ গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন অবিচল থাকিবে না। সেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণ সমাজের মধ্যে সম্প্রসারিত হইবে। ফলে উত্তরাধিকারীদের সূত্রে এক গোষ্ঠী বা বংশের ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশের লোকদের মালিকানায় চলিয়া যাইবে। বস্তুত সম্পত্তি-মালিকের বংশ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সীমাবদ্ধ পরিবেশে ধন-বন্টনের স্থায়ী ব্যবস্থা কার্যকর করাই মীরাসী আইনের লক্ষ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নেও মীরাসী আইন কার্যকর এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ-সম্পত্তি লাভের অধিকার শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বীকৃত। ইহার ফলে উচ্চমাত্রার উপার্জনকারীদের (highest income earners) সন্তানরা তাহাদের সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে। আর ইহার দরুন ধনী আরো অধিক পরিমাণ ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়াও বসিতে পারে।

অনুরূপভাবে গরীবরা গরীবই থাকিয়া যাইবে, অথবা মূল্যাধিক্য ও সরকারী প্রাপ্যের দুর্বিসহ চাপের তলায় পড়িয়া তাহারা আরো অধিক মাত্রায় দরিদ্র হইয়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, কাজ অনুযায়ী মজুরী দেওয়ার নিয়ম যদি রাশিয়ায় স্থায়ীভাবে কার্যকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য তথায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য।

## মীরাস না পাওয়ার প্রশ্ন

প্রসংগতঃ পৌত্রের মীরাস না পাওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কেও সংক্ষেপে দুইটি কথা বলা আবশ্যক।

পৌত্র ও পৌত্রী, পিতা কি মাতার মাধ্যমেই পিতামহের কি মাতামহের সম্পত্তির অংশীদার হইতে পারে—সরাসরিভাবে নয়; ইহাই হইতেছে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন। কিন্তু পিতা কিংবা মাতা যদি পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে মাঝখানের সূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়ার দরুন মীরাস হইতে ইহাদের বঞ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা যেমন যুক্তিসংগত কথা, অনুরূপভাবে ইসলাম অভিজ্ঞ সকল লোকের নিকট শুরু হইতেই ইহা সমর্থিত হইয়া আসিয়াছে। একটি ছেলে কিংবা মেয়ে পিতার বর্তমানেই যদি মারা যায়, তবে পিতার সম্পত্তিতে তাহার যেমন কোন অংশ স্বীকৃত হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও তাহাই হইবে। অবশ্য উক্ত ইয়াতীমের জন্য অসিয়ত করা পিতামহের কিংবা মাতামহের কর্তব্য এবং ইসলামী অর্থনীতিতে ইহার পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে।[১] আর সম্পত্তির মালিক কোন কারণে তাহাদের জন্য অসিয়ত না করিলেও সম্পত্তি বন্টনের সময় অবশ্যই তাহাদিগকে উহা হইতে দিতে হইবে এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ রহিয়াছে।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا- (النساء-٨)

মীরাস বন্টনের সময় নিকটাত্মীয় ইয়াতীম ও মিসকীন যারা মীরাসের নিয়মে অংশ পায় নাই, তাহাদিগকে উহা হইতে জীবিকা দাও এবং তাহাদিগকে ভাল কথা বল।

আর কোনরূপ সহায়সম্বল না থাকিলেও ভয়ের কোন কারণ নাই। যেহেতু এই ধরনের অসহায় শিশুদের জন্য স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রই দায়ী হইবে, যেখানে এই আইনটি যথাযথভাবে ও পুরামাত্রায় কার্যকর হইবে।

## ইসলামী সাম্যের তাৎপর্য

বস্তুত ইসলাম মানুষকে কোন দিনই কোন দিক দিয়াই প্রতারিত করে না, অসম্ভব ও অস্বাভাবিকের প্রতিশ্রুতি দিয়া মানুষকে প্রলোভিত করে না। ইসলাম প্রথম দিনই ঘোষণা করিয়াছে যে, দুনিয়ার সকল মানুষ সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে সমান হইতে পারে না। তাহার কারণ, সকল মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা, কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং পরিবেশগত প্রয়োজন মোটেই সমান নয়। কাজেই এইসব গুণের দৌলতে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জিত হইবে তাহার পরিমাণও সমান হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈষম্য (Natural Defferentiation)

১. কুরআনের ঘোষণানুযায়ী এই অসিয়ত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহা কার্যকর করার পূর্বে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস বন্টন করা যাইবে না। ইহা কার্যকর করার পরই মীরাস বন্টন হইতে পারে।

রহিয়াছে, ইসলাম তাহা যথাযথরূপেই স্বীকার করিয়াছে। অন্য কথায় ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রতিভার পার্থক্যকে কোন কৃত্রিম উপায়ে নির্মূল করিয়া একাকার করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যাপারেই এবং কোন দিক দিয়াই মানুষের পরস্পরের মধ্যে নিরংকুশ সমতা স্থাপন করেন নাই। শুধু মানুষের কথাই নয়, গোটা প্রকৃতির কোথায়ও এইরূপ সমতা ও নিরংকুশ সাম্য পরিলক্ষিত হয় না। স্বভাব নিয়ম প্রত্যেকটি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা , প্রতিভা ও ক্ষমতা দান করিয়াছে। কেহ অত্যন্ত বেশী সুন্দর ও সুশ্রী, কেহ ভয়ানক কুৎসিৎ। কাহারো মস্তিষ্ক শক্তি ও প্রতিভা-মণীষা অত্যধিক, কাহারো স্মরণশক্তি বলিতে কিছুই নাই। কেহ পূর্ণ স্বাস্থ্যবান এবং মোটা-তাজা, কেহ দুর্বল, রুগ্ন ও কৃশ। কাহারো কণ্ঠস্বর সুমধুর, কাহারো গর্ধভের ন্যায় বিকট ও কর্কশ। এইসব বৈষম্য যেমন অতীব স্বাভাবিক ও জন্মগত, মানবসমষ্টির মধ্যে ধন-সম্পত্তির সমান সংগতি না থাকা—বরং আর্থিক সংগতির বৈষম্য থাকাও অনুরূপভাবে স্বাভাবিক। কাজেই এই স্বাভাবিক বৈষম্য যথাযথরূপে বজায় রাখা এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সমগ্র বৈষম্য পার্থক্যকে নির্মূল না করা মানব সমাজের উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও উত্থান লাভের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাই বলিয়াছেন কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا- (الزخرف- ٣٢)

আমি দুনিয়ার জীবনে মানুষের মধ্যে তাহাদের অপরিহার্য রুজী বন্টন করিয়া দিয়াছি এবং আমি এই ব্যাপারে কোন কোন লোককে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য দিয়াছি—যেন তাহারা পরস্পরের দ্বারা কাজ করাইতে পারে।

বস্তুত ধন-সম্পত্তির পরিমাণের এই বৈষম্যই মানব-সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক আদান-প্রদানের মূল কারণ। ইহা না থাকিলে, কোন সমাজই গড়িয়া উঠিতে পারে না। মানুষের পক্ষে সামাজীক জীবন-যাপন করাও কখনো সম্ভব হয় না।

ইসলাম যেমন স্বাভাবিক সাম্যকে স্বীকার ও সমর্থন করে, তেমনি স্বীকার করে স্বাভাবিক অসাম্যকে। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক সাম্যকে কৃত্রিম উপায়ে চূর্ণ-করা ও স্বাভাবিক অসাম্যকে কৃত্রিম উপায়ে সাম্যে পরিণত করা ইসলামের নীতি বহির্ভূত। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এই কৃত্রিমতা মানব সমাজের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর, সন্দেহ নাই। ইসলাম সমর্থিত স্বাভাবিক অসাম্যকে একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতে পারে। এক ব্যক্তি জন্মগত পংগু ও আতুর, দ্বিতীয় ব্যক্তি সুস্থ শরীর ও পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট এবং তৃতীয় ব্যক্তি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যেখানে সে শিশুকাল হইতেই মোটর গাড়ীর অধিকারী হইয়াছে। এই তিন ব্যক্তিই স্বাভাবিক বৈষম্যের ভিতর দিয়া নিজ নিজ জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছে। ইসলামের বিধান অনুসারে অর্থ ব্যবস্থা এতখানি সুবিচারপূর্ণ ও স্বাধীন প্রচেষ্টার অবকাশময় হওয়া আবশ্যক, যেন পংগু ও আতুর ব্যক্তি নিজ নিজ

অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যোগ্যতা, প্রতিভা ও স্বাধীন প্রচেষ্টার দৌলতে মোটর-মালিক হইতে পারে এবং তাহার এই পথে যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা না হয়। ............ আতুরকে যেন চির জীবন আতুর হইয়া থাকিতে বাধ্য করা না হয়। তেমনি মোটর-মালিক যদি নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অযোগ্যতার দরুন মোটরে চলার সামর্থ্য ও সংগতি হারাইয়া ফেলে—নিজের কৃতকর্মের অনিবার্য পরিণামে তাহাকে একেবারে আতুর শ্রেণীতে আসিয়া পড়িতে হয়,তবে তাহার এই আর্থিক পতনও যেন অবাধে ঘটিতে পারে, কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ে যেন তাহাকে স্থায়ীভাবে চির জীবনের তরে মোটর-মালিক করিয়া রাখা না হয়। কারণ, তাহাকে এইরূপ অধিকার দিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার কোন লোকাতীত মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কাজেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক অর্থ বৈষম্যকে রক্ষা করত কৃত্রিম পার্থক্যের মূলোৎপাটন করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তাহার নিজ যোগ্যতা, প্রতিভা ও শ্রম-মেহনতের সাহায্যে সমাজ-স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া উন্নতি সাধন করার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। বস্তুত ইহাই হইতেছে প্রকৃত ও স্বাভাবিক অর্থ ব্যবস্থা।

ইসলাম সমর্থিত স্বাভাবিক সাম্যের অর্থ—অর্থোপার্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করা ও ইহাতে সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার বর্তমান থাকা। মানুষকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না, যাহার ফলে দ্রুত গতিশীলকেও দুর্বল ও অক্ষমের সহিত জড়িত হওয়ার কারণে মন্থর হইতে হয়, কিংবা দ্রুত চলিতে চাহিলেও অপরকে পদদলিত করিয়া চলিতে হয়। ইসলামের বিধান এই যে, যে ব্যক্তি মোটরে চড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে জোর করিয়া পদাতিক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে মোটর মালিক হওয়ার যাহার আর্থিক সামর্থ্য নাই, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে মোটর মালিক করিয়া দেওয়াও সমীচীন হইতে পারে না। পরন্তু যে ব্যক্তি মোটরে চড়িয়া বেড়াইতেছে, শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে দ্রুত গতিতে চলার তাহার অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল কিংবা পায়ে হাঁটিয়া যাহারা চলিতেছে, তাহাদের গতি ব্যাহত করা কিংবা তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনই অধিকার তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজের বিকাশ ও প্রগতি লাভের জন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে ক্ষুন্ন করা জুলুম ও শোষণের শামিল। মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধনা করার অবাধ সুযোগ করিয়া দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অতীব কল্যাণকর ও অপরিহার্য।

# অর্থনৈতিক অসাম্য

বর্তমান দুনিয়ার সকল দেশ ও সকল সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য বিরাজিত। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেমন এই অসাম্য প্রচন্ড রূপ ধারণ করিয়াছে, অনুরূপ অসাম্য রহিয়াছে সাম্যবাদী—তথা সমাজতান্তিক সমাজেও। মানুষের কোন সমাজই ইহা হইতে মুক্ত নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ সাম্যবাদের মুখরোচক ও চিত্তহারী শ্লোগান তুলিয়া দুনিয়ার একশ্রেণীর শোষিত, ও বুভুক্ষ মানুষকে আলোড়িত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা অর্থনৈতিক অসাম্যকে অমানুষিক এবং সাম্যকেই মানবিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অর্থনৈতিক অসাম্য কি সত্যই অস্বাভাবিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যই কি পরম স্বাভাবিক?

বস্তুত দুনিয়ার শুরু হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব-সমাজে যে অর্থনৈতিক অসাম্য বিরাজিত, প্রকৃত পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সহিত পূর্ণ সাম্য স্যশীল। মানুষের পরস্পরের রিযিকের দিক দিয়া এই পার্থক্য আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি। তিনিই তাঁহার নিজস্ব বিশ্ব-পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এক শ্রেণীর মানুষকে অন্যান্য মানুষের উপর বিভিন্ন দিক দিয়া কয়েকগুণ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করিয়া থাকেন। ইহা এক বাস্তব সত্য। বিশ্ব-প্রকৃতির যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইবে, সেদিকেই এই পার্থক্য প্রকট রূপে লক্ষ্য করা যাইবে। এবং একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে ইহার যথার্থতা ও গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হইবে।

বর্তমানে যদিও অর্থনৈতিক সাম্যবাদের আওয়াজে আকাশ-বাতাশ মুখরিত, এই সময় এহেন স্বাভাবিক নীতির কথা বলাও যেন অনেকের পক্ষেই এক কঠিন লজ্জাষ্কর ব্যাপার। কিন্তু এই অসাম্যকে যতই অস্বীকার করা হউক না কেন, ইহাই যে সত্য ও স্বাভাবিক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

দুনিয়ার ইতিহাস, ভুয়োদর্শন, বিবেক-বুদ্ধি ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ—সব-কিছুই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে মানুষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক অসমতা হইয়া থাকে তাহা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এই অসাম্য আল্লাহ্‌র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই কারণে ইতিহাসের কোন পর্যায়েই আল্লাহ্‌র আদর্শবাদী বান্দাহ্‌রা উহাকে আপত্তিকর বলিয়া মনে করেন নাই। উহাকে জোরপূর্বক খতম করিয়া কৃত্রিমভাবে পূর্ণ সমতা সৃষ্টির জন্য যত চেষ্টাই করা হউক না কেন, তাহা কখনও সফরকাম হইতে পারে না। বরং এই ধরনের সকল চেষ্টাই সম্পূর্নরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য। তাই কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির মানুষই স্বাঁভাবিক অসাম্য দুর করিয়া পরিপূর্ণ সাম্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইতে পারে না। সেই সংঙ্গে স্বাভাবিক সাম্যকে অস্বাভাবিক উপায়ে খতম করিয়া

কৃত্রিমভাবে অসাম্য সৃষ্টি করাও কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এক কথায় স্বাভাবিক সাম্য কৃত্রিম উপায়ে অসাম্যে পরিনত করা এবং স্বাভাবিক অসাম্যকে কৃত্রিম উপায়ে ও জোর জবরদস্তির দারা সাম্যে পরিণতা করা মানব সভ্যতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই অকাট্য প্রমাণ ছাড়াও এই পর্যায়ের অপর এক অনস্বীকার্য দলীল হইতেছে দুনিয়ার একমাত্র সত্য-গ্রন্থ কুরআনমজীদ। কুরআনের কতিপয় আয়াতে ইঙ্গিতে ও স্পষ্ট ভাষার বলা হইয়াছে যে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে রিযকের দিক দিয়া যে পার্থক্য হইয়া থাকে, তাহা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। এখানে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

সূরা আন্‌-আমের আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَ
كُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ - (الانعام -١٦٥)

সই মহান আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছেন এবং তোমাদর পরস্পরকে পরস্পরের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় তুলিয়াদিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন।

এই আয়াতে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে, মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং তাঁহার খলীফা দিতীয়তঃ বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র এই প্রতিনিধিদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়া পার্থক্য ও অসাম্য রহিয়াছে। মানুষের পরস্পরে বুহুবিধ বিষযে পার্থক্য থাকা সম্পর্কে এই আয়াত অকাট্য, স্পষ্টভাষী। বিবেক-বুদ্ধি-প্রতিভা, রাজনৈতিক জ্ঞান-বিবেচনা, দূরদৃষ্টি প্রভৃতির দিক দিয়া মানষের পরস্পরে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও কর্ম-কুশলতার দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই পার্থক্য সুস্পষ্ট। আর এই কারণেই মানুষের উপার্জন পরিমাণে ও উপার্জিত সম্পদ সংরক্ষণেও পার্থক্য হওয়া অতি স্বাভাবিক। এই পার্থক্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-নীতিরই পরিণাম। অর্থনৈতিক দিক দিয়া মানুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণও ইহাতে বিধৃত রহিয়াছে। বস্তুতঃ বুদ্ধি, বিবেচনা, কর্মকুশলতার দিক দিয়া পার্থক্য হওয়াই অর্থনৈতিক পার্থক্যের ভিত্তি।

তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে, মানুষকে যাহাকিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা সবই দেওয়া হইয়াছে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

সূরা নহল-এ বলা হইয়াছেঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ - (النحل-٧١)

আল্লাহ্‌ তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের তুলনায় রিযিকের দিক দিয়া প্রাধান্য ও আধিক্য দান করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত সূরায় মানুষের পরস্পরের সমষ্টিগত অসাম্যের মাঝে অর্থনৈতিক অসমতার দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূরা নহলের এ আয়াতটিতে এই কথাটিকে

স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, জীবন-জীবিকায় মানুষের পরস্পরে যে পার্থক্য হয়, তাহা মূলগতভাবেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র বিশ্ব-পরিকল্পনারই একটি অপরিহার্য অংশ।

সূরা জুখরাফে বলা হইয়াছেঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا- (الزخرف-٣٢)

দুনিয়ার জীবনে আমরা তাহাদের মধ্যে জীবিকার উপায়-উপকরণ বন্টন করিয়া দিয়াছি। এই বন্টনে আমরা তাহাদের পরস্পরের উপর কয়েকটি মাত্রায় প্রাধ্যান্য ও আধিক্য দান করিয়াছি, যেন তাহাদের কেহ অপর লোকদের দ্বারা কাজ করাইতে পারে।

জীবন-জীবিকা, রুজি-রোজগার ও জীবন যাপনের উপায়-উপকরণের দিক দিয়া মানুষের পরস্পরে যে পার্থক্য রহিয়াছে, এই বিষয়ে এই আয়াতটি অধিকতর সোচ্চার। এই পার্থক্য স্বয়ং আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি, মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এই আয়াতের শেষ বাক্যাংশ মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবার কাহারো অধিকার নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বড়ং মানব সমাজ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ড়চপরিকল্পনার দিকেব ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবদ্দ অর্থনৈতিক দিক<দিয়া যে পার্থক্য রহিয়াছে উ}য়র মূল কারণ বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে। বস্তুত হছতের পাঁচটি অংব্বুলের আকার আকৃতি ও স্থাপনে্য জন্মগত পার্থক্যস্পতাহা হাতের কার্য সম্পাদনে ঐশ্ব"ন্তই জরুরী। সেই চংঙ্গুলিগুলি কাটিয়া সমান-আকার করিয়া দিলে অংগুলির উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। অনুরূপভাবে দুই খর্হ দুই চোখের আকার ও আকৃতির যে সমতা তাহা নষ্ট করিয়া দিলে কান ও চোখের শোনা ও দেখার কাজই করিতে ব্যর্থ হইবে।

'পরস্পরের দ্বারা কাজ করাইবে' এ কথার অর্থ সামাজিক জীবনে মানুষ হইবে মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী, পরস্পর নির্ভরশীর—পরিবারিক রাজনৈতিক দিক দিয়াও যেমন, অর্থনৈতিক দিক দিয়াও তেমনি। এবং ইহার কারণে তাহাদের মধ্রে পারস্পরিক নিবিড় সমঝোতা, সম্পর্ক এবং ব্যাপক সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়িয়া উঠিবে। আর ইহার ফলেই দুনিয়ায় রচিত হইবে মানুষের সমাজ, সভ্যতা, বৈষয়িক উন্নতি ও উৎকর্ষতা। মানুষ মানুষের সহিত গভীর ও নিবিড়ভাবে মিলিত হইয়া দুনিয়ার জবিনকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি ও স্বার্থকতায় ভরিয়া তুলিবে, মানুষ হইবে মানুষের সহযোগী।

## অর্থনৈতিক অসাম্য কেন?

মানব সমাজে অতি স্বাভাবিকভাবে যে অর্থনৈতিক অসাম্য বিরাজিত থাকে উহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র

বিশ্ব-পরিকল্পনা ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে অক্ষম হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে অক্ষম হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ। ইসলামের জীবন-ব্যবস্থা বিশ্ব-ব্যাবস্থারই প্রতিচ্ছবি। বিশ্ব-প্রকৃতিতে সৃষ্টি-কূলের মাঝে যোগ্যতা ক্ষমতা আকার-আকৃতি ও শক্তি ক্ষমতার দিক দিয়া যেমন পার্থক্য রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে পারস্পরিক নিবিড় ও গভীর সহযোগিতা। এই পার্থক্য অসাম্য ও পারস্পরিক সহযোগিতাই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির মৌল ভাবধারা।

বস্তুত জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ বুঝিতে পারিলেই মনবসাধারণের অর্থনৈতিক অসাম্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। এই নীতিতে চিন্তা করা হইলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পারস্পরিক পার্থক্য ও অসাম্যের স্বাভাবিকতা ও অনিবার্যতা অনস্বীকার্য হইবে। বাহ্যত এই পার্থক্য যতই অমানবিক ও অবাঞ্ছনীয় মনে করা হউক না কেন, ইহাই বিবেকসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইলঃ মহান স্রষ্টা এই ভূবনে মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই মানুষকে জীবন দান করিয়াছেন। সর্বোত্তম সক্ষম সুঠাম দৈহিক সংগঠন দিয়াছেন। উচ্চমানের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রতিভা-মনীষা দানে তিনি মানুষকে ভূষিত করিয়াছেন, ভাল ও মন্দ গুণের অধিকারী করিয়াছেন তাহাকে। বেশুমার উপাদান উপকরণ ও উপায় পন্থা মানুষের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন। তাহ যথেচ্ছ ব্যবহার ভোগ ও প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এই সবকিছু দান করার পর আল্লাহ তাঁহার নবী-পয়গম্বর ও কিতাবের মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরীক্ষাই হইল মানব-সৃষ্টির মৌল উদ্দেশ; মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া কি ধরনের আচরণ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই দেখিতে চাহেন।

ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, বদান্যতা, সহানুভূতি, দয়াশীলতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, উদারতা, কল্যাণ কামনা এবং অন্যান্য যাবতীয় মঙ্গলকর কাজে-কর্মে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা চিরকালই মানুষের উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃত। আল্লাহ্ এই গুণাবলীকে পছন্দ করেন এবং উহাতে ভূষিত হইবার জন্য তিনি মানুষকে নির্দেশও দিয়াছেন। পক্ষান্তরে ধৈর্যহীনতা, না-শুকরি, কার্পণ্য, নির্দয়তা, স্বার্থপরতা, অনুদারতা, লোভ ও প্রতিহিংসা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে অনিচ্ছা ও অসহযোগিতা চিরকালই মানবতা বিরোধী ও নিকৃষ্ট চরিত্র বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে অপছন্দ করিয়াছেন এবং মানুষকে ইহা পরিহার করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অতএব প্রথমোক্ত গুণাবলীতে মানব সমাজকে গড়িয়া তোলাই মানুষের কর্তব্য। আর অর্থনৈতিক অসমতাপূর্ণ সমাজেই এইসব মহত গুণের পূর্ণ ও স্বাভাবিক প্রকাশ সম্ভব।

একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই লক্ষ্য করা যাইবে, এই দুনিয়ায় মানুষকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা মূলত বড় দুইটি ভাগে বিভক্ত। একটি হইল জীবন ও প্রাণ এবং দ্বিতীয়টি ধন-মাল ও অর্থসম্পদ। মানবতার উত্তম ও উন্নত এবং হীন ও নিকৃষ্ট

গুণাবলীর দিক দিয়া মানুষের পরীক্ষা করার জন্য অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণে অসাম্য জরুরী না সাম্য, তাহা এই প্রেক্ষিতে চিন্তা করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। জৈবিক উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের দিক দিয়া জীবনের অবস্থা বিভিন্ন রকম হওয়াই সমীচীন, না পার্থক্য ও অসমতাপূর্ণ, তাহাও অনুধাবনীয়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য নানা প্রকারের গুনাবলীর পরীক্ষা। এই দৃষ্টিতে যাহারাই বিচার-বিবেচনা করিবেন, তাহারাই অর্থনৈতিক অসমতাকে মানবতার জন্য সমীচীন অবস্থা মনে করিতে বাধ্য হইবেন। আর সমতা ও পার্থক্যহীনতাকে মনে করিবেন অসমীচীন। কেননা তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মানুষের মানবীয় গুণাবলীর পরীক্ষা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সমাজের সব মানুষই যদি সমানভাবে দরিদ্র হয় কিংবা হয় সমানভাবে সচ্ছল ও ধনশালী, তাহা হইলে যেমন মানুষের ধৈর্য সহ্যগুণের পরীক্ষা হইতে পারে না, তেমনি পাওয়া যাইতে পারে না মানুষের শোক্‌র ও নিষ্ঠার একবিন্দু পরিচয়। কৃত্রিম উপায়ে কোন সমাজের সব মানুষের আর্থিক অবস্থা সর্বোতভাবে সমান ও পার্থক্যহনি করিয়া দেওয়া হইলে মানুষের জীবন-উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ইহা শুধু ধরিয়া লওয়া কথা নয়। কেননা কার্যতঃ এইরূপ হওয়া মূলতই অসম্ভব। প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় মজুরী নির্ধারণের একটি সামান্য ক্ষেত্রেও এই সমতা বিধান সম্ভবপর হয় নাই—যদিও বিপ্লবের পূর্বে ইহারই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া তোলা হইয়াছিল।[১] তাই কোন সমাজের পক্ষেই সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য সংস্থাপন করিয়া মানুষের এই সার্বিক পরীক্ষা গ্রহণকে অচল করিয়া দেওয়ার সাধ্য কোন মানুষের নাই। এ পর্যায়ে ইহাই চূড়ান্ত কথা।

## অর্থনৈতিক অসাম্য যুক্তি ও কল্যাণ দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল

মানুষের পরীক্ষার দৃষ্টিতে সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যই যে সমীচীন, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা তাহা দেখিয়াছি। এখানে এই বিষয়টি অন্য এক দৃষ্টিতে বিবেচ্য। রিযিক বা জীবন-জীবিকা ও রুজি-রোজগার মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। তাহার জীবন ইহারই উপর নির্ভরশীল। এই কারণে কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে নানা দিক দিয়া কথা বলা হইয়াছে। কুরআন বলেঃ রুজি-রোজগারে দৈন্য, অভাব প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক অসমতা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও অকাট্য যুক্তির উপর ভিত্তিশীল। কয়েকটি আয়াতেই এই কথাটি ব্যক্ত করা হইয়াছে। একানে এই পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সূরা বনী-ইসরাইলে বলা হইয়াছেঃ

---

১. এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছেঃ এম, যীাই, ইউিন নাক জনৈক সমাজতন্ত্রবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশে-বিশেষ করিয়া রাশিয়ার ১৯৩৭ সনে সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর মাঝে বেতন হারে যে পার্থক্য ছিল তাহার চিত্র এইভাবে আঁকিয়াছেনঃ

| | |
|---|---|
| সাধারণ শ্রমিকের মাসিক মজুরী | ১১০ - ৩০০ রুবল |
| মধ্যম শ্রেণীর অফিসারের মাসিক বেতন | ৩০৩ - ১০০০ রুবল |
| উচ্চ শ্রেণীর অফিসারের মাসিক বেতন | ১৫০০ - ১০,০০০ রুবল |
| সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাসিক বেতন | ২০,০০০ - ৩০,০০০ রুবল |

রাশিয়ার অন্যতম নেতা মকওয়ান অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, ২য় মহাযুদ্ধের পর এই পার্থক্য আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পইয়াছে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ- اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًاۢبَصِيْرًا-
(بنى اسرائيل- ٣٠)

নিশ্চয়ই তোমার আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেন, আর যাহার জন্য চাহেন পরিমিত ও সংকুচিত করিয়া দেন, তিনি তাঁহার বান্দাহদের অবস্থা সম্পর্কে খুববেশী অবহিত ও দৃষ্টিবান।

আয়াতের শেষ অংশ 'তিনি তাঁহার বান্দাহদের অবস্থা সম্পর্কে খুব বেশী অবহিত ও দৃষ্টিবান' সামগ্রিক কল্যাণের দিকে ইংগিত করিতেছে। কল্যাণের এই ভিত্তিতেই তিনি লোকদের মাঝে রিযিক বন্টনে পমিাণের কম বেশী করিয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি-লোক সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কাহারো থাকেত পারে না। কাহার জন্য রুজি-রোজগার প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং কাহার পক্ষে অভাব ও দৈন্যই সমীচীন তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানেন।

সূরা আল-শুরা'য় ও এই কথাই বলা হইয়াছেঃ

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ- يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ- اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-
(الشورا- ١٢)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর কুঞ্চিকা তাঁহারই হস্তে নিবদ্ধ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পরিমাপ করিয়া দেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানবান।

ইহাতে প্রথম বলা হইয়াছে যে, রিযিক বন্টনের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ই। এই ব্যাপারে তাঁহার শরীক কেহই নাই। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান রাখেন। অর্থাৎ তিনি নির্বিচারে ও যথেষ্টভাবে রিযিক বন্টন করেন নাই, ব্যাপক, নির্বুল ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাহা করিয়াছেন। যে লোক এই কথায় বিশ্বাসী হয় সে যতই দরিদ্র হউক না কেন সে কখনই আল্লাহ্র প্রতি এই কারণে অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। সূরা আজ্-জুমার-এ বলা হইয়াছেঃ

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّاللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-
(الزمر- ٥٢)

তাহারা কি জানেনা, আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেন, আর যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার লোকদের জন্য ইহাতে সুস্পষ্ট অকাট্য নিদর্শন রহিয়াছে।

এ আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে, রিযিকের কম-বেশী হওয়ার ব্যাপারে কতগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। ইহাতে অপরিমেয় কল্যাণ নিহিত। কিন্তু তাহা অনুধাবন করিতে পারে কেবল ঈমানদার লোকেরাই। অন্যদের পক্ষে ইহার অন্তর্নিহিত সার্বিক কল্যাণ বুঝিতে পারা সম্ভব নয় বলিয়াই এ বিষয়ে তাহারা আপত্তি তোলে ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়।

এই কারণেই দেখা যায়, এক শ্রেণীর অন্ধ সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনৈতিক অসাম্যের কথা শুনিলেই নাক ছিঁটকাইতে ও উহাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলিয়া প্রত্যাখান ও বিদ্রুপ উপহাস করিতে শুরু করে। মনে হয় তাহারা যেন সব পর্যায়ে পূর্ণ সমতা বিধানেই বদ্ধপরিকর এবং তাহাদের মনিবরা যেন তাহাদের নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সমাজে তাহা কার্যত করিয়াও ফেলিয়াছে। কিন্তু কোন সমাজেই তাহা সম্ভব হয় নাই তাহা কাহারো অজানা নয়।

কিন্তু তাই বলিয়া ইসলাম পুঁজিবাদের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মারাত্মক ধরনের অসাম্য কোনক্রমেই সমর্থন করে না। কেননা পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য শুধু অসাম্যই নয়, তাহাতে একদিকে যদি থাকে সীমাহীন প্রাচুর্য, তাহা হইলে অনিবার্যভাবে অপরদিকে দেখা দেয় নির্মম শোষণ ও বঞ্চনা। ইসলাম যেমন স্বাভাবিক অসাম্যকে জোরপূর্বক দূর করিয়া কৃত্রিম উপায়ে সাম্য সৃষ্টি করিতে চায় না, তেমনি বরদাশত করেনা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অসাম্য। পরন্তু ইসলাম সমর্থিত অর্থনৈতিক অসাম্যের পশ্চাতে অনস্বীকার্য ভিত্তি হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে সব মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারের সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। অথচ পুঁজিবাদী সমাজে এই ব্যবস্থার বর্তমানতা তো দূরের কথা, ইহার ধারণার অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলে পুঁজিবাদী সমাজের অসাম্য যেখানে এক শ্রেণীর—বরং সংখ্যাধিক বিপুল মানুষের-জীবনকে দারিদ্র জর্জরিত বঞ্চনা নিপীড়িত ও দুর্দশায় পর্যুদ করিয়া তোলে, সেখানে ইসলামী সমাজে মানুষ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভে ধন্য ও নিশ্চিত হইয়া পরম উৎসাহ উদ্দীপনায় নিজের অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা, প্রতিভা ও বৃদ্ধিমত্তার সাহয্য উত্তর উত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এই দুই সমাজের অসাম্যের মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বস্তুত ইসলাম 'সাম্যবাদ' সাম্যবাদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া, বঞ্চিত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রোলেতরী বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত নয়, প্রস্তুত নয় সমাজের একজন মানুষকে তাহার মৌল প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত থাকিবার অনুমতি দিতে। পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় ইসরাম মানব সমাজকে 'আছে' (Have) ও 'নাই' (Haves not)-এর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেয় না। সেখানে প্রত্যেকটি মানুষই 'আছে' (Hanes) শ্রেণীভুক্ত; নাই' শ্রেণীর কোন অস্তিত্বই ইসলামী সমাজে সম্ভব নয়। সেখানে সবাই কিছু না কিছুর মালিক—উহার পরিমাণে যতই পার্থক্য হউক না কেন। বস্তুত বিশ্ব-প্রকৃতিতে অবস্থিত সৃষ্টিকুলেও যে এইরূপ অবস্থাই বিরাজিত এবং ইসলামী অর্থনীতি সমর্থিত অসাম্য যে অত্যন্ত স্বাভাবিক তাহা চিন্তাশীল মাত্রই স্বীকার করিবেন।

এই অসাম্যই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভাবধারা এবং ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। ইসলাম অর্থ সম্পদের পরিমাণে সমতা বিধানের পক্ষপাতি নয়, ইসলাম সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদায় পূর্ণ সমতা বিধানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কেননা প্রথমটা প্রকৃত-পক্ষেই সম্পূর্ণ অসম্ভব; বাস্তবতার দৃষ্টিতে কেবল দ্বিতীয়টাই সম্ভব। তাই ইসলাম অসম্ভবের পিছনে না ছুটিয়া কিংবা অসম্ভবের শ্লোগান দিয়া জনগণকে প্রতারিত না করিয়া 'সম্ভব'কে বাস্তবায়তি করিতে সচেষ্ট। আর ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ সব সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরও।

# ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

# রাষ্ট্রীয় আয়

এক ব্যক্তির জীবনযাত্রা সুষ্ঠুরূপে নির্বাহ করার জন্য যেমন ধন-সম্পদের প্রয়োজন, অনুরূপভাবে একটি সরকারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও দায়িত্ব পালনের জন্য ধন-সম্পদের আবশ্যকতাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি যেখানে নিজস্ব উপায়-পন্থার সাহায্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আহরণ করে, রাষ্ট্র-সরকার সেখানে দেশবাসীর নিকট হইতে বিভিন্ন কর ও রাজস্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইহাই গোড়ার কথা।

## রাজস্বের সংজ্ঞা

অর্থনীতিবিদগণ কর বা রাজস্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক চেষ্টিবল রাজস্বের নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ

'রাজস্ব' বলিতে কোন ব্যক্তি বা দলের সেই অর্থ বুঝায়, যাহা সরকারী কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়।[১]

বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডাল্টন রাজস্বের সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেনঃ

'রাজস্ব' সরকার পক্ষ হইতে অপরিহার্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবি বিশেষ।[২]

রাজস্বের এই উভয় সংজ্ঞাই নির্ভুল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন নৈতিক দায়িত্ব বা সীমা রক্ষা করার ভাবধারা আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইসলামী অর্থনীতিতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে এই মূলনীতি মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে উহা ধার্য করার ব্যাপারে যেমন অন্যায় ও শোষণের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না; অনুরূপভাবে সংগৃহীত রাজস্বের একটি ক্রান্তি পর্যন্তও অন্যায় পথে, যথেচ্ছভাবে ব্যয় করার কাহারো অধিকার নাই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় উহার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও—ইসলামী রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয়কেও—স্থায়ী নৈতিক নিয়মের বাঁধনে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা লংঘন করার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন স্বীকৃত হয়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের ভাষায় তাহা নিম্নরূপঃ

১.পাবলিক ফিনান্স৭ঃ তৃতীয় খন্ড, প্রথম অধ্যায়, ২৬১ পৃঃ

২. প্রিন্সিপালস অব পাবলিক ফিনান্স, তৃতীয় অধ্যায় ২৬ পৃঃ

انَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ذُوْحَقٍّ فِىْ حَقِّهِ اَنْيُّطَاعَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَانِّىْ لَاَاَجِدُ هٰذَا الْمَالَ يُصْلِحُهُ الاَّ خِصَالٌ ثَلاَثٌ اَنْيُّخَذَ بِالْحَقِّوْ وَيُعْطٰى بِالْحَقِّ وَيُمْنَعَ مِنَ الْبَاطِلِ-

(كتاب الخراج ص ١١٥)

আনুগত্যের যোগ্য কোন ব্যক্তির এই মর্যাদা হইতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়াও তাহার আনুগত্য করিতে হইবে। 'তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোনই অধিকার নাই। প্রথমঃ সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহা গ্রহণ করা হইবে; দ্বিতীয়ঃ ন্যায়পথেই উহা ব্যয় করা হইবে এবং তৃতীয় এই যে, উহাকে সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখিতে হইবে।

অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সরকারী ব্যয়-বহনের জন্যই রাজস্ব আদায় করিবে না, দেশের গরীব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যেও—পথিক, বেকার ও ঋণী লোকদের সাহায্য করার জন্যও—রাজস্ব আদায় করিবে।

## প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের বিভিন্ন উপায়ের আলোচনার পূর্বে প্রত্যক্ষ কর ও অপ্রত্যক্ষ করের বিশ্লেষণ আবশ্যক। যে রাজস্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা অবস্থার লোকদের উপর আইনত ধার্য করা হয়, উহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলা হয়। আর যে কর ধার্য করা হয় একজনের উপর; কিন্তু মূলত উহার সমগ্রটি কিংবা আংশিক পরিমাণ আদায় করিতে হয় অপর একজনকে, উহাকেই বলা হয় অপ্রত্যক্ষ কর।[১]

দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ রাজস্ব ধার্য হওয়া উচিৎ না অপ্রত্যক্ষ রাজস্ব—অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। হেনরী জর্জ বলেন যে, একমাত্র ভূমি রাজস্বই দেশবাসীর উপর ধার্য হওয়া উচিত। তাহার একমাত্র কৃষি উৎপন্ন ফসলকেই প্রকৃত উৎপাদন বলা যাইতে পারে। কৃষি উৎপন্ন ফলনই মূলত মানবজীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের পরিপূরক বলিয়া প্রত্যেকেই তাহা ব্যবহার করিতে বাধ্য। ফরে দেশের সকল মানুষের উপরই এইরূপ রাজস্বের প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই রাজস্ব নীতির মূলে একটি সুস্পষ্ট ভুল বিদ্যমান। রাজস্বের এই নীতি গৃহীত হইলে নগদ সম্পদশালী লোকদের ঐশ্বর্যের উপর ইহার কোন প্রভাবই পড়িবে না। বরং কেবল গরীব-দুঃখীদের উপরই রাজস্বের দুর্বহ বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে।[২]

---

১. অধ্যাপক ডালটন ঃ পাবলিক ফিনান্স ৫ম অধ্যায়, ৩৩ পৃষ্ঠা

২. প্রিন্সিপালস এন্ড মেথড অব টেকসেশন, ২৪ পৃষ্ঠা

অপ্রত্যক্ষ রাজস্ব নীতিতে মানুষের চক্ষে ধুলি দিয়া রাজস্ব আদায় করা হয়। জনগণ জানিতেও পারে না যে, তাহাদের উপর কর ধার্য করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহা যথারিতি আদায়ও করিতে হইতেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজস্বনীতিতে জনগণের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করা হয় বলিয়া তাহাতে কোররূপ আতিশয্য দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গেই জনগণ উহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে এই রাজস্ব ধার্য এবং উহা আদায় করণের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম হওয়ার সম্ভাবনা ও অবকাশ থাকিতে পারে না। আর অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের প্রতি জাগ্রত জনগণের আন্তরিক সমর্থন থাকে বলিয়া প্রকৃত প্রয়োজন-পরিমাণ রাজস্ব আদায় কার্য ব্যাহত হয় না। ফলে জনমতের গুরুত্ব, গণ অধিকারের মৌলিক ভাবধারা ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূর্ণ করণ প্রভৃতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে ও বিকাশ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু বর্তমান কুটনৈতিক ও ষড়যন্ত্রকারী দুনিয়ার রাষ্ট্র-সরকারের অর্থ মন্ত্রীগণ সাধারণত সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে ও জনগণের অজ্ঞাতে কর আদায় করিবারই অধিক চেষ্টা করিয়া থাকে। কোলবিয়ার নামক একজন ফরাসী মন্ত্রী বলিয়াছেনঃ 'হাঁসের পালক এমনভাবে উৎপাটন কর, যেন উহা চিৎকার করারও অবসর না পায়'। বস্তুত বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রেই রাজস্ব আদায় ও অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এই নীতিই অনুসৃত হইতেছে।

উপরন্তু রাজস্ব আদায়ের এইসব নীতি ও পদ্ধতিতেই নৈতিক ভুল ও অন্তর্নিহিত মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে। এই জন্য বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সব অর্থনীতিবিদগণ উবয় পদ্ধতিতেই রাজস্ব আদায় করার পরামর্শ দিয়াছেন—যেন উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তদুদ্ভূত দোষ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করিতে পারে। এই দিক দিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতির বৈশিষ্ট্য ও নির্ভুলতা অনস্বীকার্য। কারণ তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় দিক দিয়াই রাজস্ব ধার্য হয়। এই রাজস্ব আয়ের উপর ধার্য হয়, যথা যাকাত, ওশর (ফসলের একদশমাংশ কিংবা একবিংশাংশ) এবং খারাজ ইত্যাদি 'প্রতক্ষ কর'। অথবা তাহা ধার্য হয় মূলধনের উপর, যেমন চুতষ্পদ পালিত জন্তুর যাকাত, স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত, ব্যবসায় পণ্যের যাকাত। ইহা সবই প্রত্যক্ষ কর-এর অন্তর্ভুক্ত। আর অপ্রত্যক্ষ কর, যেমন উত্তোলিত খনিজ ও নদী-সমুদ্র সম্পদ এবং শুল্ক ইত্যাদি। এই সবের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কর ধার্যকরণ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, যাহা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের কর ধার্যকরণ ব্যবস্থার সহিত পুরাপুরি সংগতি সম্পন্ন।

## ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উপায়

ইসলামী রাষ্ট্রের বিরাট জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য যে বিপুল অর্থ সম্পদের আবশ্যক, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কুরআন মজীদে নিম্নলিখিত উপায়সমূহ নির্ধারিত হইয়াছেঃ

১. সর্ব প্রকারের যাকাত, সাদ্‌কা, ওশর বা মুসলমানদের ভূমিরাজস্ব, খনিজ সম্পদের 'রয়ালটি' ইত্যাদি।

২. ভিন্ন জাতির নিকট হইতে বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, জিযিয়া, গনীমতের মাল, খারাজ বা অমুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা ইত্যাদি।

৩. দেশের সমষ্টিগত প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য নাগরিকদের নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ।

## নবী করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদুন কর্তৃক নির্ধারিত কর

নবী করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদুন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয় হিসাবে গণ্য করিয়াছেনঃ

(১)ভূগর্ভে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (২) রয়ালটি (৩) ইজারার খাজনা (৪) আমদানী ও রফতানী শুল্ক (৫) নদী-সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত সম্পদ (৬) মালিক বা উত্তরাধিকারীহীন ধন-সম্পত্তি (৭) মুদ্রাশিল্প এবং রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত জমি, বন ও শিল্প-ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা।

আয়ের উল্লেখিত উপায়সমূহকে পরিমাণের দিক দিয়া চার ভাগে বিভক্ত করা চলেঃ (ক) ভূমি রাজস্ব—ওশর, ওশরের অর্ধেক, খারাজ।

(খ) খুমুস—যেসব রাজস্ব মূল সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যথা—গণীমতের মাল, ব্যাক্তি-মালিকানার খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি।

(গ) যাকাত, সাদকা এবং নাগরিকদের নিকট হইতে লব্ধ টাকা। জিযিয়াও ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। (জিযিয়া, খারাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নাগরিকদের নিকট হইতে যাহা আয় করা হইবে, তাহার হার ও পরিমাণ নির্ধারণ ইসলামী রাষ্ট্রের বা পার্লামেন্টের কাজ।) যাকাত বিভিন্ন জিনিস হইতে বিভিন্ন হারে আদায় করার নির্দেশ রহিয়াছে।

(ঘ) মালিকবিহীন বা উত্তরাধিকারীহীন ধন-সম্পত্তি। ইহার সম্পূর্ণ ও সমগ্রটাই রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হইবে।

উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় আয়সমূহকে অপর এক দিক দিয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ

(১) যেসব আয়ের ব্রয়-ক্ষেত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) এবং যেসব আয়ের ব্যয়-ক্ষেত্র নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালকদের (পার্লামেন্টের) উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। (অবশ্য তাহাও কুরআন হাদীসের মূল ভাবধারা অনুযায়ী জনগণের কল্যাণ দৃষ্টিতেই নির্ধারণ করিতে হইবে।)

এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উল্লেখিত উপায়সমূহের বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

## ভূমি-রাজস্ব

রাষ্ট্রের সকল প্রকার ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্র-সরকারকে যে কর দেওয়া হয়, তাহাকেই ভূমি রাজস্ব বলে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ওশরি জমি ও খারাজী জমি।

যে জমির মালিক মুসলমান, মুসলমানই যে জমি সর্ব প্রথম আবাদ ও চাষোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, মুসলমান যথারীতি অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া যে সব জমি দখল করিয়াছে, এবং যে জমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, কিংবা রাষ্ট্র সরকার যে জমি নাগরিককে চাষাবাদের জন্য দান করিয়াছে তাহা সবই 'ওশরি জমি' নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু যে জমির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমগণই যে জমি আবাদ ও চাষোপযোগী করিয়া লইয়াছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র যেসব জমি অমুসলিমদের পাট্টা দিয়াছে এবং তাহাদের কবুলিয়ত লইয়া তাহাদিগকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছে তাহা সবই 'খারাজী' হইবে।

'ওশর' অর্থ এক-দশমাংশ, মুসলমানদের কর্ষিত জমির ফসলের এক-দশমাংশের অর্ধেক পরিমাণ কর বা রাজস্ব গ্রহণ করা হয় বলিয়া উহাকে 'ওশর' বলা হয়।

ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ- (البقرة-٢٦٧)

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ এবং ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর।

এই আয়াতের প্রথম অংশ হইতে যাবতীয় নগদ ধন-সম্পদ এবং ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর।

এই আয়াতের প্রথম অংশ হইতে যাবতীয় নগদ ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সার যাকাত ফরয হয়। শেষাংশ হইতে ভূমি রাজস্ব বা ওশর দেওয়ার আদেশ প্রমাণিত হয়।

ভূমি রাজস্ব আদায় করার আদেশ নিম্নলিখিত আয়াতে অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَااَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- (الانعام- ١٤١)

ফসল পাকিয়া গেলে তাহা খাও, ফসল কাটিবার দিন উহা হইতে আল্লাহ্র 'হক' আদায় কর এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লংঘন করিও না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লংগনকারীদের আদৌ ভালবাসেন না।

এখানে 'হক' অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিনিময়। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে ইহা আদায় করিতে হইবে।

## ওশর ও ওশরের অর্ধেক

নবী করীম (স) আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী ও তাঁহার অনুমতিক্রমে মুসলমানদের ভোগাধিকৃত ভূমির রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَ الْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقَى بِالسَّوَانِيْ وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ – (ابو داؤد)

যে জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা খালের পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যাহা স্বতই সিক্ত থাকে তাহারা ফসলের এক-দশমাংশ এবং যে জমি যে কোন প্রকারের পানি সিঞ্চনে কৃত্রিমভাবে সিক্ত হয় তাহার বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমির কর রূপে দিতে হইবে।

তিনি বিভিন্ন এলাকার শাসন কর্তা ও ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এই পর্যায়ে যে ফরমান জারী করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও মুসলমানদের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান লাভ করা যায়।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া নবী করীম (স) যে নিয়োগ-পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিলঃ

اِنَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ اَوْتَسْقِىْ غَيْلًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالْغُرْبِ وَالدَّلِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ–

মুসলমান জমি হইতে এক-দশমাংশ রাজস্ববাবদ আদায় করিবে, এই পরিমাণ ফসল সে জমি হইতে গ্রহণ করা হইবে, তাহা বৃষ্টি বা ঝর্ণার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয় কিন্তু যে সব জমিতে স্বতন্ত্রভাব পানি দিতে হয় তাহা হইতে এক দশমাংশের অর্ধেক—বিশ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব বাবদ আদায় করিতে হইবে।[১]

অনুরূপভাবে হেমিয়ার-এর রাজন্যবর্গের নিকট প্রেরিত ফরমানেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছিলঃ

আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর, নামায পড় যাকাত দাও, গণীমতের মাল হইতে এক-দশমাংশ আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের জন্য আদায় কর। এতদ্ব্যতীত জমির রাজস্বও দিতে থাক। যে জমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে বিনা পরিশ্রমে ও অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত সিক্ত হয়, তাহার এক দশমাংশ ফসল এবং সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সিক্ত জমির বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব বাবাদ আদায় করিতে থাক।[২]

১. তারীখ-ই-তাবারী, ফতহুল বুলদান ৮১ পৃঃ
২. ঐ

নবী করীম (স) হযরত মূয়ায ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের ট্যাক্স কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন এবং খেজুর, গম, যব, আংগুর বা কিশমিশ হইতে দশমাংশ বা উহার অর্ধেক রাজস্ব বাবদ আদায় করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।[১] মধুর উপরও ওশর ধার্য হইবে। কেননা নবী করীম (স) সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّهُ اَخَذَ مِنَالْعَسْلِ الْعُشْرَ- (ابن ماجه)

তিনি মধুর ওশর আদায় করিয়াছেন।

মুসলমানদের জমিকে পানি-সেচের দিক দিয়া দুই ভাগে ভাগ করা এবং তাহা হইতে রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে উল্লিখিত রূপ পার্থক্যের কারণ দর্শাইতে গিয়া ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেনঃ

لِاَنَّ الْمُؤْنَةً تَكْثِرُفِيْهِ وَتُقِلُّ فِيْمَا يُسْقِى بِالسَّمَاءِ اَوْسَيْحًا-

কারণ শেষোক্ত প্রকার জমিতে অধিক শ্রম নিয়োগ করিতে হয়; কিন্তু প্রথম প্রকার জমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিকভাবেই সিক্ত হয় বলিয়া উহাতে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়।[২]

এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তামী লিখিয়াছেনঃ

وان النبى صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة ماخفت مؤنته وكثرت منفعته توسعة على الفقراء وجعل ماكثرت مؤنته على التضعيف رفقا بار باب الاموال- (معالم السنن ٢ ص ٤١ سرح ابو داؤد)

যে জমিতে ফসল ফলাইতে শ্রম ও ব্যয় কম হয় এবং লাভ বেশী হয় তাহাতে নবী করীম (স) গরীবদের পাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যাহাতে শ্রম বেশী হয় তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ ওশর নির্ধারিত করিয়াছেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে জমির মালিকদের প্রতি অনুগ্রহ দেখান হইয়াছে।

মোট কথা সকল প্রকার ভূমিজাত ফসল হইতেই জমির উল্লিখিত রূপ পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক-দশমাংশ কিংবা উহার অর্ধেক পরিমাণ ফসল রাজস্ব বাবদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-এ রাখিতে হইবে। বাগান ও শষ্যক্ষেত্র—এতদুভয়ের মধ্যে রাজস্ব ধার্য হওয়া না হওয়ার দিক দিয়া কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না এবং কোন প্রকার উৎপাদনশীল জমিকে রাজস্ব আদায়ের বাধ্য-বাধকতা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ নবী করীম (স) স্পষ্ট বাসায় বলিয়াছেনঃ

مَااَخْرَجَتْهُ اللَرْضُ فِيْهِ الْعُشْرَ-

জমি যাহাই উৎপাদন করিবে, তাহাতেই এক-দশমাংশ রাজস্ব ধার্য হইবে।[৩]

---

১. ফতুহুল বুলদান ৮৩ পৃঃ

২. البخارى ج ٩ ص ٧١، فتوح البلدان ص ٨٣، عمدة القارى

৩. কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ এই ব্যাপারে স্পষ্ট দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আমার মতে ওশর কেবল সেসব ফসলের উপর ধার্য হইবে যাহা লোকদের নিকট সঞ্চিত থাকিবে। যাহা সংরক্ষণ

(পরের পৃষ্ঠায়)

## খারাজ

উপরে বলা হইয়াছে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকৃত জমি হইতে যে রাজস্ব আদায় করিতে হয়, তাহাকেই 'খারাজ' বলা হয়।[১]

'খারাজের' পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সহিত জমির জরিপ ও গুণাগুণ নির্ণয় করাইয়া-ই এই কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। হযরত উমর ফারূক (রা) ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের বিশাল বিস্তৃত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূমি বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন না করিয়া উহার উপর মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক মালিকানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। উহার চাষাবাদ করা সম্পর্কে তথাকার প্রাচীন কৃষকদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং উহার 'খারাজ' নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু খারাজ নির্ধারণের পূর্বেই তিনি উসমান বিন হানীফ (রা)-কে এই সকল জমির জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় জরুরী কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেননা উসমান ভূমি রাজস্ব—বিশেষতঃ খারাজ ধার্য করণ সম্পর্কে—বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

ফলে তিনি দীবাজ কাপড় পরিমাপ করার ন্যায় এই সকল জমির জরিপ করিয়াছিলেন।

অমুসলিমদের জমি হইতে খারাজ হিসাবে যে রাজস্ব আদায় হইবে, তাহা রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থ-ভাণ্ডারে—বায়তুলমালে—জমা হইবে এবং দেশের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ ও সার্বজনীন কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনের কাজে ব্যয় করা হইবে। প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনৈতিক গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজে' বলা হইয়াছেঃ

'খারাজ, সমগ্র মুসলমানের—ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত সম্পদ।'

প্রথমতঃ খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে জমির গুণাগুণ, উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজনীয় চাষের পরিমাণ পার্থক্য, পানি সেচের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন জমির প্রকৃত গুণ অনুপাতেই রাজস্ব ধার্য হইতে পারে। অন্যথায় ভূমি মালিকের উপর অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা রাজস্ব কম ধার্য হইলে তাহাতে সমষ্টির অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া নিশ্চিত।

---

(আগের পৃঃ পর)

যোগ্য নয়—তাহাতে ওশর ধার্য হইবে না। আর যাহা সাধারণতঃ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় না তাহাতেও ওশর হইবে না। —কিতাবুল খারাজ

এই পর্যায়ে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ওশর বা অর্ধেক ওশর আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের উৎপন্ন ফসলের উপর কার্যকর হইবে, তাহা জমি খারাজী হউক কি ওশরি। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ও খুলাফায়ে রাশেদুনের অনুসৃত নীতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়।

১. 'খারাজ' ফার্সী শব্দ, আরবী ভাষায় বলা হয়, طسق—কতাবুল আমওয়াল গ্রন্থ বলা হইয়াছে وعلى ارضهم الطسق —"তাদের (অমুসলিমদের) ভূমির উপর ট্যাক্স ধার্য হইবে।" এই আরবী طسق কেই ইংরেজীতে Task কিংবা Tax বলা হয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে—'এই শব্দটি মূল আরবী ভাষায় Choregia শব্দ হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ রাজস্ব।

খারাজ এবং ওশরের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ইহাই বলা হয় যে, খারাজ জমি হইতে আদায় করা হয় এবং ওশর আদায় করা হয় জমির উৎপন্ন ফসল হইতে। একাধিক সহোদর ভাইয়ের কোন 'এজমালি' জমি থাকিলে এবং তাহাতে সকলে নয়—কেহ কেহ ইসলামে দীক্ষিত হইলে— তখন ভূমি-রাজস্বও অনুরূপভাবে আদায় করিতে হইবে। অর্থাৎ মুসলমানের অংশ হইত ওশর এবং অমুসলিমের অংশের জমি হইতে খারাজ আদায় করিতে হইবে।

মুসলমানদের জমি হইতে 'ওশর' এবং অমুসলিমদের জমি হইতে 'খারাজ' আদায় করার ব্যাপারে কোনরূপ জোর-জুলুম, অবিচার কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকগণই প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার সার্বজনীন দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে জন্য তাহাদিগকে অন্যান্য দায়িত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে—অমুসলিমদের অপেক্ষাও অনেক বেশী—অর্থ দানের দায়িত্ব পালন করিতে হয়। কাজেই জমির রাজস্বের দিক দিয়া সামান্য পার্থক্য হইলেও মোটামুটিভাবে মুসলমানকেই অধিক পরিমাণে অর্থ দান করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ 'ওশর' কখনই এবং কোন অবস্থায়ই রহিত হইতে পারে না। উহার পরিমাণ চির-নির্দিষ্ট-হ্রাস—বৃদ্ধির বিন্দুমাত্র অবকাশও তাহাতে নাই। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তাহা হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিতে পারেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে—উপযুক্ত কারণ থাকিলে—খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা, এমনকি অবস্থা বিশেষে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেওয়ারও রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ খারাজ বৎসরে একবার আদায় করা হয়, কিন্তু ওশর আদায় করা হয় প্রত্যেকটি ফসল হইতেই। বৎসরের মধ্যে যত প্রকারের ফসল যতবার ফলিবে, তত প্রকার ফসলের উপর ততবারই 'ওশর' ফরয হইবে।

মুসলমানদের জমি হইতে যে 'ওশর' গ্রহণ করা হইবে; তাহা নিশ্চিতরূপে ফসল হইতে গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু অমুসলিমদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ যে খারাজ আদায় করা হইবে, তাহা ফসল কিংবা নগদ টাকা উভয়রূপেই আদায় করা হইতে পারে। খারাজ কিসে আদায় করা হইবে, তাহা নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য; যেমন কর্তব্য উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করা এখানে বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। খারাজ বা ভূমিরাজস্ব ফসলে আদায় করিলে কৃষক বা ভূমি মালিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা লাভ করা সম্ভব। কারণ তাহাতে ফসলের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ খাজনা হইবে না, খাজনা হইবে মোট উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ। কাজেই ফসল কম হউক বেশী হউক উহা হইতে ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করায় কৃষক বা ভূমি-মালিককে বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। কিন্তু খাজনা নগদ টাকায় দিতে হয় বলিয়া তাহাতে কৃষক ও ভূমি-মালিকের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার

আশংকা রহিয়াছে। এই জন্য যে, কৃষক ও ভূমি-মালিককে রাজস্ব বাবদ দেয় টাকা জমির উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়াই সংগ্রহ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় ফসল কম হইলে কিংবা শস্যের মূল্য হ্রাস পাইলে খাজনা বাবদ দেয় টাকা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব খারাজ আদায় কিসে করা হইবে, তাহা নির্ধারণ করার পূর্বে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক।

খারাজ আদায় করার ব্যাপারে খারাজ-দাতার প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। হযরত উমর ফারূক (রা) এক ঘোষণায় বলিয়াছিলেন, 'সরকারী কর্মচারীদিগকে জনগণের উপর জোর-জুলুম, অত্যাচার-নিষ্পেষণ চালাইবার জন্য কিংবা খাজনা ও বিবিধ প্রকার কর বাবদ তাহাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ লুটিয়া লইবার জন্য কখনই প্রেরণ করা হয় না, তাহাদের প্রেরণ করা হয় দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য—জনগণের জীবনকে সকল দিক দিয়া সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য। ইসলামের পতনযুগেও যে এই দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য আরোপ করা হইত, ইতিহাস হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ তাঁহার শাসন-এলাকায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য তদানীন্তন বাদশাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন। উত্তরে বাদশাহ বলিয়াছিলেনঃ "সাধারণভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই যথেষ্ট মনে কর, যাহা সহজলভ্য নয়—যাহা লইতে জোর-জবরদস্তি করিতে হয়—তাহার লালসা করিও না। চাষী ও ভূমি মালিকদের জন্যও এমন পরিমাণ সম্পদ থাকিতে দাও যাহা দ্বারা তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে সমর্থ হইবে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাসগৃহ যে জমির উপর থাকিবে, উহার মালিক গরীব হইলে উহার খাজনা আদায় করা যাইবে না।

## বিভিন্ন সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ

গণীমতের মাল, খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রভৃতির প্রত্যেকটি হইতে এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করা হইবে।

কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইসলামী মুজাহিদগণ যে ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র লাভ করিয়া থাকে, ইসলামী পরিভাষায় উহাকেই বলা হয় গণীমতের মাল (Booty)। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ – (انفال-٤١)

তোমরা জানিয়া রাখ, গণীমতের যে কোন মাল তোমাদের হস্তগত হইবে, তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং ইয়াতীম, অভাবী ও নিঃসম্বল পথিকদের জন্য।

অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের যে সব ধন-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র যানবাহন ও খাদ্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হইবে, উহার পাঁচ ভাগের চার ভাগ বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হইবে, আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবী ও নিঃসম্বল পথিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করা হইবে।[১]

খনিজ সম্পদের 'রয়ালটি' বাবদ উহার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা হইবে। কোন কোন ইসলামী অর্থনীতিবিদের মতে উহার শতকরা চল্লিশভাগ রাষ্ট্রের প্রাপ্য হইবে। এই মতের সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, হযরত উমর বিন্ আবদুল আজীজ (রা) খনিজ সম্পদের শতকরা চল্লিশভাগ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

কিন্তু আমাদের মতে 'রয়ালটি'র পরিমাণ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপার। সকল খনির অবস্থা একইরূপ নহে। সকলটির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও কখনো সমান হয় না। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের রকম-ভেদের দরুন মূল্যের দিক দিয়াও যথেষ্ট পার্থক্য হইয়া থাকে। এমন কি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়ও সকল খনিতে সমান হয় না। কাজেই প্রত্যেকটি খনির 'রয়ালটি'র কোন স্থায়ী পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নহে। বরং উহার পরিমাণ নির্ধারণের ভার ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু খনিজ সম্পদ হইতে গৃহীত পরিমাণকে 'যাকাত' মনে করা হইবে কি গণীমত, সে সম্পর্কেও ইসলামী রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিকদের মতে খনির 'রয়ালটি' কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা বাঞ্ছনীয়। সে জন্য বৎসর সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে হইবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রয়ালটি বাবদ খনিজ দ্রব্য কিংবা রয়ালটির পরিমাণের মূল্য—উভয়ের যে কোন একটি আদায় করা যাইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালকে এই খনিজ সম্পদই বিপুলভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেনঃ

وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا اُصِيْبَ فِي الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيْدِ وَالرَّصَاصِ فَاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْخُمُسُ-

এইভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতির যাবতীয় খনিজ সম্পদ হইতে (এক-পঞ্চমাংশ) রাজস্ব আদায় করিতে হইবে।

---

১. মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামের প্রথম দিকে মুজাহিদদের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিল না। এই জন্য গণীমতের মালের চার-পঞ্চমাংশই তাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইত। বর্তমান যুগে যেখানে সৈনিকদের বেতন নির্দিষ্ট রহিয়াছে বা নির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে সেখানে গণীমতের মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করার প্রয়োজন নাই। বরং এই সম্পদ সৈনিকদের বেতন বাবদ খরচ করার জন্য সরকারী কোষে নির্দিষ্ট রাখা হইবে।

২. কিতাবুল আমওয়াল—আবূ উবাইদ ৩৩৯ পৃঃ

খনিজ সম্পদের ন্যায় 'রোকাজ'—'ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত ধন'—হইতেও ইসলামী রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হইতে পারে। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ فى الركاز خمس 'রোকাজ বা ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হইবে'। (কিতাবুল আমওয়াল ৩৩৬ পৃঃ) ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেনঃ

وَفِيْمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ حُلْيَةٍ وَ غَيْرِهَا فَالْخُمُسُ يُوْضَعُ فِى مَوَاضِعِ الْغَنَائِمِ- (كتاب الخراج ص ٢١)

সমুদ্র হইতে যেসব সম্পদ লব্ধ হইবে তাহা হইতেও গণীমতের মালের মতই রাজস্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

## একাধিকারভুক্ত ব্যবসায়ের রাজস্ব

ইসলামী রাষ্ট্র ন্যায়-নিষ্ঠার সহিত কাহাকেও বিশেষ কোন ব্যবসায় বা শিল্পকর্মের (Industries) একচেটিয়া অধিকার দান করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলে তাহা কার্যকর করিতে পারিবে, ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাহাতে সাধারণভাবে জনগণের কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইলে যে এইরূপ একচেটিয়া অধিকার দান সঙ্গত হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। হযরত নবী করীম (স) তায়েফ ইত্যাদি এলাকায় কোন কোন লোককে মধুমক্ষিকা পালন ও মধু উৎপাদন শিল্পের একচেটিয়া অধিকার দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, এইজন্য তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য এক একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেইসব উপত্যকায় অন্য কাহারো কিছু করিবার অধিকার ছিল না। সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকগণ উৎপন্ন পণ্যের এক-দশমাংশ রাজস্ব বাবদ বায়তুলমালে জমা করিত। কারণ হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন فى العسل العشر 'মধুতেও ওশর (এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব বাবদ) ধার্য হইবে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে এইসব একচেটিয়া শিল্প সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা হয়। তখন আমীরুল মু'মিনীন এক ফরমানে বলিয়াছেনঃ

اَنْاَدّٰى اِلَيْكَ مَاكَانَ اِلٰى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ فَاَقِمْ لَهُ سَلَبَةً وَالاَّفَانَّمَا هُوَنُهَابُ غَيْثٍ يَاكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ- (ابو داؤد)

তাহারা নবী করীমের জীবদ্দশায় রাজস্ব বাবদ যাহা দিত, আজও তাহাই রীতিমত আদায় কর। তবে সংশ্লিষ্ট উপত্যকা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট উপত্যকা ফেরত লওয়া হইবে। কেননা মধু মৌমাছির ফসল। যাহার-ই ইচ্ছা উহা খাইবে।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এইরূপ একচেটিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের সুযোগ ইসলামী সমাজে ধন-বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করিবে না কি? ...... এই সম্পর্কে অধ্যাপক বেন্হাম-এর নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ

'একচেটিয়া শিল্প ব্যবসায় ধন-বন্টনে অসাম্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আশংকা অনেক সময় বাস্তব না-ও হইতে পারে।[১]

বস্তুত বাহ্যদৃষ্টিতে 'মনোপলি' ব্যবসায়ে পুঁজিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা কেবলমাত্র অনৈসলামিক সমাজেই থাকিতে পারে। ইসলামী সমাজে 'মনোপলি' ব্যবসায়েও কোন প্রকার পুঁজিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই।

তাহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এইরূপ ব্যবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করিতে হইবে। ইহাতেই পুঁজিবাদের মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়া যাইবে। এতদসত্ত্বেও কাহারো নিকট অধিক পরিমাণ পুঁজি জমা হইলে তাহার যাকাত, সদকা, ইত্যাদি আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য হইবে। ফলে একজনের চেষ্টা, শ্রম ও তত্ত্বাবধানে সঞ্চিত পুঁজি বহুজনের জন্য—অন্য কথায় সমগ্র দেশের জনসমষ্টির সাধারণ কল্যাণে—ব্যয়িত হইবে। বস্তুত এই সুনিয়ন্ত্রিত পুঁজির সমাবেশে কাহারোই আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ধন-সম্পদের এইরূপ সমাবেশকে রাজবাড়ীর রিজার্ভ ট্যাংকের সহিত নয়—পর্বত নির্ঝরের নিরন্তর পানি নিস্কাশনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

## বন-সম্পদ আয়

ইসলামী রাজ্যের বন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আমদানীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপায়। ইহা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং উহার যাবতীয় আয় রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হইবে।

## সামুদ্রিক সম্পদের আয়

সকল প্রকার সামুদ্রিক সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উপায়। সামুদ্রিক সম্পদ—বিশেষ করিয়া মৎস্য, মুক্তা ও সুক্তি—উৎপাদনের উপর কর ধার্য হইতে পারে। হযরত উমর (রা) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করা এবং তাহা যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোন এক কর্মচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য হইতেই রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করিতে হইবে। কারণ, ইহাও আল্লাহ্ তা'আলারই একটি দান, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মতই প্রচার করিয়াছেন। নদী, ঝিল, বিল ইত্যাদি হইতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল পমিরাণে যে মৎস্য উৎপাদন হইবে তাহারও এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রাপ্য হইবে। হযরত আলী (রা) কার্যতঃ ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের মতেও জলভাগ হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেও রাজস্ব আদায় করিতে হইবে। কারণ তাহা স্থলভাগের খনিজ সম্পদেরই সমতুল্য। হযরত উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

فِيمَا اَخْرَجَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاءُهُ مِنَ الْبَحْرِ الْخُمُسُ-

১. বেনহাম-কৃত ইকনমিকস-২২৫ পৃঃ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র হইতে যাহা উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব বাবদ দিতে হইবে।[১]

## মালিকবিহীন সম্পদ

ইসলামী রাষ্ট্র সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্থানীয়—আল্লাহ্ এবং রাজ্যের জনগণের খলীফা। অতএব দেশের যে সব ধন-সম্পদের বস্তুতই কেহ মালিক বা উত্তরাধিকারী থাকিবে না, তাহার মালিক হইবে ইসলামী রাষ্ট্র। বায়তুলমালেই তাহা জমা করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই তাহা ব্যয় করা হইবে। হযরত উমর ফারূক (রা) মিসরের শাসনকর্তার এক প্রশ্নের জওয়াবে বলিয়াছেন, 'মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যেই বন্টন করা হইবে। আর যাহার কোন ওয়ারিস নাই তাহার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি বায়তুলমালে জমা হইবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ اَرِثُهُ وَاَعْقِلُ عَنْهُ- (كتاب الاموال ص ٢٢١)

যাহার কোন উত্তরাধিকারী নাই, তাহার উত্তরাধিকারী আমি। আমি-ই তাহার ত্যাক্ত সম্পত্তি পাইব এবং তাহার তরফ হইতে দায়িত্ব পালন করিব।

বস্তুত নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-ও এইরূপ নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেনঃ

مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَقَبُ فَادْفَعْ مِيْرَاثَهُ اِلٰى عَقَبِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَبُ فَاجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنَّ وَلاَئَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ-

(فتوح مصرو اخبارها)

যাহাদের উত্তরাধিকারী থাকিবে, মৃতের ধন-সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন কর। আর যাহার উত্তরাধিকারীরূপে পাশ্চাতে কেহ নাই, তাহার ধন-সম্পদ মুসলমানের বায়তুলমালে জমা করিয়া দাও।

মুর্তাদ—ইসলামত্যাগী ব্যক্তির সম্পত্তিও সরকারে বাজেয়াফত হইবে। যেসব পড়িয়া থাকার মাল কোথাও পাওয়া যাইবে এবং যাহার মালিক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহাও অনুরূপভাবে বায়তুলমালে শামিল হইবে।

---

১. কিতাবুল খারাজ—আবূ ইউসুফ (৭০ পৃঃ)। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) যদিও ভিন্নমত পোষণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার-ই প্রধান শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ হযরত উমর ফারূকের উদ্ধৃত ঘোষণার ভিত্তিতে সে মত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। হযরত উমর ফারূক ইয়ালা ইবন উমাইয়াকে যে ফরমান লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে সমগ্র সম্পদকে سَيْبٌ مِنْ سَيْبِ اللّٰه 'আল্লাহ্র অপরিমেয় দানের মধ্য ইহাও একটি দান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (ঐ ৭০ পৃঃ)

মুদ্রাশিল্প হইতেও ইসলামী রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হইতে পারে। টাকশালের শ্রমিকদের মজুরী এবং অন্যান্য খরচাদি ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাহা ব্যয় করা হইবে।

## যাকাত ও সাদকা

সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপর যাকাত ফরয করা হইয়াছে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ইহা বন্টন করা হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ- (بخارى، كتاب الزكواة ج ١ ص ١٨٧)

যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং সেই সমাজেরই গরীবদের মধ্যে তাহা বন্টন করা হইবে।

বস্তুত সকল প্রকার বর্ধিষ্ণু বা পরিবর্ধনযোগ্য সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হইবে। ইহার লক্ষ্য হইতেছে যুগপৎভাবে ধনীর হৃদয় ও তাহার ধন-মালের পরিশুদ্ধি। আর যাকাত সঠিকভাবে আদায় করিলে যে এই উদ্দেশ্য পুরাপুরিভাবেই বাস্তবায়িত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যাকাত ধার্যযোগ্য সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম, সাধারণ প্রকাশ্য সম্পদ, যথা—গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণ প্রকাশ্যভাবেই উহাদের যাঁচাই করিতে পারে। দ্বিতীয়, অপ্রকাশিত সম্পদ, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য বা টাকা ও ব্যবসায়পণ্য।

ব্যবসায়-পণ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্যঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَالَّذِى نَعِدُّ لِلْبَيْعِ- (ابو داؤد)

সামুরা বিন্ জুন্দুব হইতে বর্ণিত হইয়াছে—তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (স) আমাদিগকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি হইতে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেছিলেন।

ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ

زكواة التجارة ثابتة بالاجماع- (بذل المجهود ج ٣ ص ٦)

ব্যবসায় পণ্যের যাকাত দেওয়া যে ফরয, তাহা ইসলামে ইজমা'র দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত পশুর উপর যাকাত ফরয হইবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত পৌছিলে। যেমন—বিশটি গরুর মধ্যে একটি যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে। আর ব্যবসায়ের জন্য পালিত হইলে ব্যবসার পণ্য হিসাবে মোট মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা (৪০ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করিতে হইবে। এই উভয়বিধ দ্রব্য-সম্পদের যাকাত আদায় করার জন্য পূর্ণ একটি বৎসর অতিবাহিত হইতে হইবে। কেননা নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَازَكوٰةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

মালিকের মালিকানাধীন কোন সম্পদের পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে উহার উপর কখনো যাকাত ধার্য হইবে না।

স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়-পণ্য ও কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ সাড়ে ৫২ তোলা। অলংকারে ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্যেও উক্ত হিসাব অনুসারে যাকাত ফরয হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

فِى الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَلَيْسَ فِىْ مَادُوْنَ خَمْسِ اَوَاقِىَ صَدَقَةٌ-

রৌপ্যে শতকরা আড়াই টাকা (শতকরা এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—অর্থাৎ আড়াই টাকা) ধার্য হয়। ইহার কম পরিমাণ হইলে তাহাতে কোন যাকাত নাই।

ফকীহ আল-কাসানী লিখিয়াছেনঃ

وما اموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنا نير والدراهم فلاشئ فيها مالم تبلغ قيمتها- مائتى درهم اوعشرين مثقال من دقب فتجب فيها الزكواة وهذا قول عامة العاما- (البدائع والصنائع)

ব্যবসায় পণ্যে যাকাতযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে উহার আর্থিক মূল্য অনুযায়ী টাকার ভিত্তিতে। তাই যাহার মূল্য দুইশ' বিশ মিসকাল স্বর্ণ পরিমাণ হইবে না, উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। এই পরিমাণ হইলে তাহাতে অবশ্য যাকাত ধার্য হইবে। সর্বসাধারণ আলিম এই মতই পোষণ করেন।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مُرْنِسَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ يُزَكِّيْنَ عَنْ حُلِيِّهِنَّ-

মুসলিম নারীদেরকে তাহাদের অলংকারের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দাও।

ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট উভয়ের উপর যাকাত ফরয হইবে। কারণ, এই উভয় প্রকার মুদ্রারই সমান পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা বিদ্যমান। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকায়ও এক বৎসরান্তে যাকাত ফরয হইবে। অন্যান্য রেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত টাকায়ও অনুরূপভাবে যাকাত ফরয হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করা সহজ হইলে তাহা নিঃসন্দেহে নগদ টাকার সমতুল্য। অতএব তাহা হইতেও যাকাত আদায় করিতে হইবে, কিংবা তাহাতে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণের স্বর্ণ-রৌপ্য থাকিলে উহার উপরও যাকাত ধার্য হইবে।

(১) ওরুয়া ইবনে জুবাইর, সায়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যেব ও কাসেম প্রমুখ মণীষী বলিয়াছেনঃ

تُدَارُ الزَّكَوٰةُ كُلَّ عَامٍ لَايُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَوٰةُ حَتّٰى تَاْتِىْ ذٰلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ- (بدل المجهود ج ص٦)

এই যাকাত প্রতি বৎসরই আবর্তিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরের সেই নির্দিষ্ট মাস—যে মাসে একবার যাকাত দেওয়া হইয়াছে—না আসা পর্যন্ত যাকাত আদায় করা যাইবে না।

যাকাত সম্পর্কে নীতিগতভাবে মনে রাখা দরকার যে, ইহা কোন ট্যাক্স নয়—মূলত, ইহা অর্থনৈতিক ইবাদাত মাত্র। ট্যাক্স ও ইবাদাতের মৌলিক ধারণা ও নৈতিক ভাবধারার দিক দিয় উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই যাকাতকে কোন দিনই যেন ট্যাক্স মনে করা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ইসলামী জনতার অন্যতম দায়িত্ব।

যাকাতকে রাষ্ট্রীয় আয় হিসাবে গণ্য করার কারণেও কাহারো মনে উক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। কেননা, মুসলমানদের সকল প্রকার সমষ্টিগত ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ও সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব বলিয়া অর্থনৈতিক ইবাদাত—যাকাত—আদায়কেও উহারই একটি খাত হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে মাত্র। প্রসঙ্গত স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাকাতের যে হার নবী করীম (স) ইসলামী শরীয়াতের বিধানদাতা হিসাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কাহারো ক্ষমতা নাই। আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাঁচাই করিলে উহার অপ্রয়োজনীয়তাও সপ্রমাণিত হয়। কারণ, অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য শুধু যাকাতের অর্থ যথেষ্ট না হইলে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় যাকাতের হার স্বল্প মনে করিয়া উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা আল্লাহ্‌র শরীয়াতের উপর হস্তক্ষেপ এবং বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সেই জন্য এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

فِىْ مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ - (كتاب الاموال)

তোমার ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও (সমাজের) অধিকার রহিয়াছে।

## সাদকায়ে ফিতর

রমযান মাসান্তে ঈদের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা উহার মূল্য রোযার ফিত্‌রা বাবদ বন্টন করে, উহার নাম সাদকায়ে ফিতর। এই সাদকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তাহার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হইতে আদায় করিতে বাধ্য। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহাকেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) লিখিয়াছেন—'ইসলামী খিলাফতের যুগে এই সাদকাও বায়তুল মালে জমা করা হইত এবং তথা হইতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী এলাকার গরীবদের মধ্যে উহা বন্টন করা হইত।'

## জিজিয়া কর

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হইবে। ইসলামের অর্থনৈতিক পরিভাষায় ইহাকে 'জিজিয়া কর' বলা হয়। 'জিজিয়া' অর্থ 'বিনিময়'; রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহাদিগকে যে নিরাপত্তা দান করে, রাষ্ট্র তাহারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমাণে কর আদায় করার অধিকার লাভ করিয়া থাকে। 'জিজিয়া' অনুরূপ একটি কর। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই কথাই বলা হইয়াছেঃ

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ- (التوبه. ٢٩)

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা অধীনতা ও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া 'জিজিয়া' দিতে প্রস্তুত হইবে।

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে। প্রথম, রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধ্যানুসারে অর্থ দান করা।

## জিজিয়ার অর্থনৈতিক মূল্য

'জিজিয়া' সম্পর্কে যত প্রশ্নই উত্থাপিত হউক না কেন উহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যৌক্তিকতা এবং মূল্য অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ রাষ্ট্র-সরকার দেশের সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত ও বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশের রক্ষণাবেক্ষণের, জীবিকা পরিবেশন ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেরই উপরই অর্পিত হইয়া থাকে। অতএব ইহার আর্থিক প্রয়োজন সর্বাধিক, তীব্রতর ও অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে দেশরক্ষা ও যুদ্ধসংক্রান্ত কাজের নীতিগত ও মূলগত দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাসী (মুসলিম) নাগরিকদের উপর ন্যস্ত হয়,—তাহাতে অবিশ্বাসী লোকদের (অমুসলিমদের) উপর

নহে। রাষ্ট্রের উপর কোনরূপ বহিরাক্রমণ হইলে দেশরক্ষা কাজের জন্য সর্বতোভাবে ঝাঁপাইয়া পড়া দেশের সমগ্র মুসলিমদের ধর্মীয় ফরয বিশেষ, কিন্তু অমুসলিমদের অবস্থা অনুরূপ নহে।

এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে দেশরক্ষা খাতে একটি বিশেষ কর আদায় করার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই হিসাবে এই ব্যবস্থাকে 'সুবিচারপূর্ণ কর্মবন্টন' বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার ফলে দেশরক্ষার ব্যাপারে মুসীলমগণ জনশক্তি (man power) সরবরাহ করিবে, আর দেশের অমুসলিমগণ করিবে আর্থিক প্রয়োজন পূরণ। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিগত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে এইরূপ নীতি অবলম্বন—আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান দায়িত্ব উক্ত আদর্শে বিশ্বাসীদের উপর ন্যস্তকরণ—এক বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যেহেতু আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও আক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যাপারেও উক্ত আদর্শের পূর্ণ অনুসরণে অপরিহার্য এবং এই কাজ রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজে ঝাঁপাইয়া পরার মৌলিক দায়িত্ব আদর্শে বিশ্বাসীদের উপর ন্যস্ত করা এবং সে জন্য আর্থিক প্রয়োজন পূরণের প্রধান দায়িত্ব আদর্শে অবিশ্বাসীদের উপর অর্পণ করার মূলে কোন পক্ষপাতমূলক বা বৈষম্যমূলক ভূমিকা বর্তমান নাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এইরূপ করার নাম 'জিজিয়া'ই রাখিতে হইবে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অমুসলিমগণ ইচ্ছা করিলে ইহার পরিবর্তে মুসলিমদের ন্যায় যাকাত দেওয়ার প্রথাও চালু করিতে পারে। 'জিজিয়া' কিংবা অনুরূপ অর্থ কেবল সেসব লোকের নিকট হইতে আদায় করা হইবে, সাধারণতঃ যাহাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এবং সেই সঙ্গে এইরূপ অর্থদানের সামর্থ্যও রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহাদের অনুরূপ ক্ষমতা নাই—যেমন স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম বৃদ্ধ, পাগল, অন্ধ ও পংগু লোক কিংবা যাহারা নীতিগতভাবে যুদ্ধ বিমুখ বা যুদ্ধবিরোধী যথা পাদ্রী, পুজারী, ঠাকুর, গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি—তাহাদের উপর এই ধরনের কোন কর-ই ধার্য হইবে না।

বস্তুত সকল প্রকার ধনী মুসলমানের উপরই যাকাত আদায় করা যখন ফরয তখন অমুসলিমদের উপর একমাত্র 'জিজিয়া' কর আদায়ের নীতি প্রয়োগে তাহাদের প্রতি যে কোনরূপ অবিচার করা হয় নাই, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

জিজিয়া যে অমুসলিমদের সর্ববিধ রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়, তাহার একটি প্রকাশ্য প্রমাণ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র যদি কখনো এই দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম হয় তবে ইহা তাহাদের নিকট হইতে মোটেই গ্রহণ করা হয় না, আর একবার গ্রহণ করা হইয়া থাকিলেও তাহা প্রত্যর্পণ করা হয়।[১]

১. তারীখ-ই-তাবারী ১২ হিজরী সনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণীয়।

জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের কাজ রাষ্ট্র-সরকার ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই সঠিক ইসলামী পন্থা। প্রত্যেক ধনশালী উপার্জনশীল ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন—এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে দাতা ও গৃহীতা—কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার না হয় সেদিকে উভয়কেই তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জিজিয়া সাধারণতঃ টাকায় আদায় করা হইবে। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশেষ কোন শিল্পপণ্যের আকারেও তাহা আদায় করা অসংগত হইবে না। নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট হইতে জিজিয়া বাবদ শিল্পপণ্যও গ্রহণ করিয়াছেন।[১] ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেনঃ

انَّالْجِزْيَةَ غَيْرُ مُقَدَّرَةَ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ

জিজিয়ার পরিমাণ কি হইবে এবং কিসের মাধ্যমে তাহা আদায় করা হইবে, শরীয়াতে তাহা পূর্ব নির্ধারিত নহে।

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেনঃ

اِنَّمَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْهُمْ دُوْنَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَةَ-

জিজিয়া কেবলমাত্র সক্ষম পুরুষদের উপরই উহা ধার্য হইবে, স্ত্রী ও শিশু বালক ইত্যাদি অক্ষম ও সামর্থহীনদের উপর উহা ধার্য হইবে না।

(কিতাবুল খারাজ, ১১২ পৃঃ)

তিনি আরো লিখিয়াছেনঃ 'দান গ্রহণযোগ্য গরীব-মিসকীন, আয়-উপার্জনহীন অন্ধ ও ভিক্ষাবৃত্তি-নির্ভর অমুসলিমের উপরও জিজিয়া ধার্য হইবে না। (ঐ) বলা বাহুল্য, জিজিয়া বৎসরে মাত্র একবারই আদায় করা হইবে, তাহার অধিক নহে। এই ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর নিম্নলিখিত বাণীটি চূড়ান্ত ঘোষণা হিসাবে মানিয়া লইতে হইবেঃ

وَمَنْ ظَلَمَ مَعَاهِداً اَوْكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَةِ- فَانَا حَجِيْجُهُ-

যে ব্যক্তি কোন "চুক্তিবদ্ধ জাতি" (অমুসলিম সংখ্যালঘুর) প্রতি জুলুম করিবে কিংবা তাহাদের সামর্থ্যের অধিক কোন কাজের বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবে, (কিয়ামতের দিন) আমিই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিব ও প্রতিবাদী হইব।[২]

১. আল-আহকামুস্ সুলতানীয়া, কিতাবুল আমওয়াল ও কিতাবুল খারাজ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

زاد المعاد ج ١١٣٣

২. কিতাবুল খারাজ — আবু ইউসুফ, ৩২৫ পৃঃ

হযরত উমর ফারূক (রা) ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে ইহারই ভিত্তিতে বলিয়াছেনঃ

اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىْ بِذِمَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّوْفِىْ لَهُمْ بِعَهْدِ هِمْ وَاَنْ يُّقَاتَلَ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَلَايُكَلِّفُوْهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ-

আমার পর যিনি খলীফা পদে বরিত হইবেন তাঁহাকে আমি অসিয়ত করিতেছি, তিনি যেন রাসূলের গৃহীত দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন-করেন, যিম্মীদের সহিত করা সব ওয়াদা যথাযথভাবে পূরণ করেন। তাহাদের পক্ষ হইতে প্রয়োজন হইলে যেন যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের অধিক কোন কাজের দায়িত্ব যেন তাহাদের উপর চাপাইয়া না দেন। (কিতাবুল খারাজ-আবূ ইউসুফ, ১২৫ পৃঃ)

## আমদানী শুল্ক

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সধান এবং বৈদেশিক শিল্পপণ্যের আমদানীর প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রকেও এজন্য সর্বপ্রথম বৈদেশিক পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং উহার উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইবে। অনুরূপভাবে বৈদেশীক রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবে, তাহাদের উপরও এই শুল্ক ধার্য হইবে। কারণ তাহাদের জানমাল ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পিত এবং এই দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে কিংবা এই কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থানের জন্য তাহাকে অবশ্যই শুল্ক আদায় করিতে হইবে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সময়ই এই শুল্ক সর্বপ্রথম ধার্য হইয়াছিল।[১] বস্তুত এই শুল্ক প্রদান করিয়াই বিদেশী নাগরিকগণ ইসলামী রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে।

## আমদানী শুল্কের পরিমাণ

বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়পণ্যের যে শুল্ক আদায় করে, তাহা তাহার নিজ পকেট হইতে কখনও আদায় করে না, আদায় করে ক্রেতার পক্ষ হইতে। কারণ উহাই পণ্যের আসল মূল্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং সাধারণ ক্রেতাগণই তাহা আদায় করিয়া থাকে। এইভাবে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই শুল্ক আদায় করা হইলে, ও দেশীয় মুসলিম-অমুসলিম ব্যবসায়ীদের শিল্পপণ্য হইতে তাহা আদায় না করিলে তাহাদের পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হইবে। পরিমাণে তাহাদের পণ্য অবিলম্বে বিক্রয় হইয়া যাইবে; কিন্তু বৈদেশিক পণ্যের মূল্য বেশী হওয়ার কারণে তাহা সহজে বিক্রয় হইবে না। তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া পণ্যমূল্য হ্রাস করিয়া দেশীয় শিল্পের সমানস্তরের মূল্য ধার্য করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার পণ্য অবিক্রিতই থাকিয়া যাইবে। এই জন্য যে, একই প্রকার পণ্যের মূল্যে একই বাজারে কখনো অত্যধিক পার্থক্য থাকিতে পারে না।

১. কিতাবল আমওয়াল, আবূ উবাইদ, ৪ ঃ ৫ পৃঃ; কিতাবুল খারাজ আবূ ইউসুফ, ১৩৫ পৃঃ

বৈদেশিক পণ্যের শুল্ক মূল পণ্য মূল্যের এক-দশমাংশ ধার্য করা যাইতে পারে। আর কোন কারণবশতঃ যদি দেশী পণ্যের উপরও শুল্ক ধার্য করিতে হয়, তবে দেশের অমুসলিমদের পণ্যে এক-দশমাংশের অর্ধেক ধার্য করিতে হইবে। কারণ তাহাদের উপর জিজিয়া নামক আর একটি কর পূর্ব হইতেই ধার্য হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানদের পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক বাবদ আদায় করা যাইতে পারে। যেহেতু নগদ টাকার ও পালিত জন্তুর যাকাত তাহাদিগকে অনিবার্যরূপে প্রদান করিতে হয়।

কিন্তু দুইশত মুদ্রার কম পুঁজির ব্যবসায়ের উপর এই শুল্ক আদৌ ধার্য হইতে পারে না। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বিভিন্ন নির্দেশনামা হইতে উল্লিখিত পরিমাণটি জানিতে পারা যায়।[১] বর্তমান সময় সেই পরিমাণকেই যে বজায় রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং আধুনিক প্রয়োজন, পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরিপূর্ণ সহৃদয়তার সহিত এই শুল্কের পরিমাণ ধার্য করিতে হইবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের চলাচল—একই স্থান হইতে অন্য স্থানে আমদানী-রফতানী করার উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য হইতে পারে না। ইজতিহাদের সাহায্যেও ইহাতে কোনরূপ রদ-বদল করার অবকাশ নাই। যেসব ফল অল্প সময়ের মধ্যে খারাপ হইয়া যায়, তাহার উপর শুল্ক ধার্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[২] বৈদেশিক পণ্যের উপর একবারই শুল্ক ধার্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ বৈদেশিক পণ্যের সীমান্ত পার হইয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় তাহা হইতে একবার শুল্ক আদায় হইয়া গেলে, উহাকে যদি পুনরায় সীমান্ত পার হইতে হয়, তবে আবার উহা হইতে শুল্ক আদায় করা হইবে না। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালে একজন বিদেশী খৃস্টান ব্যক্তি ঘোড়া বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করিয়াছিল এবং সীমান্ত পার হওয়ার সময় উহার শুল্ক আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঘোড়া বিক্রয় করিতে না পারায় তাহা লইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে সীমান্ত পার হইতে চাহিলে তখন পুনরায় তাহার নিকট শুল্কের দাবি করা হইল। খৃস্টান ব্যবসায়ী অসন্তুষ্ট হইয়া হযরত উমরের নিকট আসিয়া বিষয়টি পেশ করিলে আমীরুল মু'মিনীন শুল্ক অফিসারকে লিখিয়া পাঠাইলেন—একবার যখন ঘোড়ার শুল্ক আদায় করিয়াছ, তখন পুনরায় উহা হইতে তাহা আদায় করিতে পারিবে না।[৩]

শুল্ক সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, ইসলামী অর্থনীতি মূলত স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী। সকল দেশের সকল পণ্যের উপরই যে শুল্ক ধার্য করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নাই। ইসলামী রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত শুল্ক গ্রহণ না করারও চুক্তি করিতে পারে এবং চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায় চলিতে পারে। কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্র যখনই ইসলামী রাষ্ট্রের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিবে, তখনই ইসলামী রাষ্ট্রও সকল প্রকার বিদেশী শিল্প-পণ্যের উপর অনুরূপ হারে শুল্ক ধার্য করিবে।

১. কিতাবুল খারাজ আবূ ইউসুফ ১৩৫ পৃঃ

২. কিতাবুল খারাজ, ৮৬ পৃঃ

৩. মবসুত—২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ

## জরুরী পরিস্থিতিতে কর ধার্যকরণ

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল কোন সময় এমন কোন পরিস্থিতিতে যদি সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া পড়ে; কিংবা ব্যয় অপেক্ষা আয় অত্যন্ত কম হইতে শুরু হয়, অথবা জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কারণে—কি কোন নতুন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য—অধিক অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অথবা সকল প্রকার আয়ের পরেও রাজ্যের সকল মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব না হয়; বা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর আরো অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে পারিবে। ইসলামী রাজনীতিবিদ ইমাম মা-অর্দীর 'আল-আহ্‌কামুস্‌-সুলতানীয়া' গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে (২০৪পৃঃ) লিখিয়াছেন—'জরুরী অবস্থায় সকল প্রকার ব্যয় বহনের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমানদের উপরই বর্তিবে, প্রয়োজনের সময় তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ আদায় করা যাইতে পারিবে।

তবুও যুদ্ধের সময় নবী করীম (স) যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করার পরও আকস্মিকভাবে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিকট তিনি সে জন্য অর্থ সাহায্যের দাবি পেশ করিয়াছিলেন। হযরত উমর ফারূক ও উসামন (রা) এই সময় তাহাদের যাবতীয় ধন-সম্পদের অর্ধেক উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার সম্পূর্ণ বিত্ত-সম্পদ আনিয়া নবী করীম (স)-এর খিদমতে পেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া আসিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেনঃ তাহাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলই যথেষ্ট, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।

এইরূপ জরুরী অবস্থায় যে কর ধার্য করা হয় তাহা দুই প্রকারের হইয়া থাকেঃ

প্রথম, সেইসব কর, যাহা সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য ধার্য করা হয়।

দ্বিতীয়, সেই সব কর, যাহা অত্যাচারী ও শোষক-শাসনকর্তা কেবল বিলাসিতার পানপাত্র উচ্ছাসিত করিয়া তুলিবার জন্য আদায় করিয়া থাকে এবং প্রকৃত জনস্বার্থের সহিত যাহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। এই উভয়বিধ কর কখনো সাময়িকভাবে ধার্য করা হয়, আবার কখনো কখনো স্থায়ীভাবেও ধার্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারের কর সম্পর্কে এ কথা স্থির নিশ্চিত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইহার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু প্রথম প্রকারের কর ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ সংগত—অবশ্য যদি তাহা সংগত ও ন্যায়নীতি অনুসারে ধার্য হয় এবং এইরূপ কর কোন ইসলামী রাষ্ট্রকর্তৃক ন্যায়সঙ্গতভাবে ধার্য করা হইলে তাহা প্রদান করা দেশবাসীর একান্ত কর্তব্য—ফরয, এই সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতিবিদ সকলেই একমত। ইবনে হুম্মান নামক একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইহার কারণ দর্শাইয়া লিখিয়াছেন যে, এই ধরনের নূতন কর আদায় করা প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানের (নাগরিকের) কর্তব্য। কেননা ইহা

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ এবং ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়সঙ্গত ও জনকল্যাণকর সকল আদেশ পালন করা সকল নাগরিকেরই কর্তব্য।

কিন্তু অন্যায়ভাবে জনস্বার্থ হানিকর কোন কাজের জন্য যদি অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা হয় তবে তাহা প্রদান করা মুসলমানদের কর্তব্য নয়। কারণ এই ধরণের ট্যাক্স ধার্য করা সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْاَئِمَّةَ اَنْ يَّكُوْنُوْا رُعَاةً وَلَمْ يَتَقَدَّمْ اِلَيْهِمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا جُبَاراً- (مشاهير الاسلام جلد )

অতঃপর জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা শাসক ও রাষ্ট্র কর্তাদিগকে জাতি ও জনগণের সংরক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়ার আদেশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এই জন্য রাষ্ট্রকর্তা নিযুক্ত করা হয় নাই যে, তাহারা জাতি ও দেশবাসীকে নূতন নূতন করভারে জর্জরিত ও নিঃস্ব করিয়া দিবে।

মুসলমানগণ এই ধরনের কর কেবল যে প্রদান করিবে না তাহাই নয়, ইহার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিরোধ গড়িয়া তোলাও একান্ত আবশ্যক।

## সামরিক কর

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে অর্থসম্পদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা—এমনকি যুদ্ধের জন্য হইলেও—মাত্রই উচিত নয়। কারণ,

لِاَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُعِدٌّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ-

—'বায়তুলমালের ধন জনগণের প্রয়োজনের সময় ব্যয় হওয়ার জন্যই মওজুদ আছে'।

কিন্তু তাহা না থাকিলে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ—দেশ ও স্বাধীনতা—রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ও সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।

## সরকারী ঋণ

সাধারণভাবে রাষ্ট্র-সরকারের যে আয় হইয়া থাকে, সেই অনুসারেই রাষ্ট্র-সরকারের যাবতীয় খরচ বহন করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য জরুরী পরিস্থিতিতে আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরী কর ধার্য করিয়া তাহা পূরণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয়,—কাজ সম্পন্ন না হয়—তাহা হইলে সরকারকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

সাধারণত লোকেরা আমদানী অনুসারেই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র-সরকার ইহার বিপরীত—নিজের প্রয়োজন অনুসারেই আয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কর ধার্য করণেরও একটা সীমা

আছে। এই ব্যাপারে যদি সেই সীমা লংঘন করা হয়,—যদি অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়, তবে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান মারাত্মকরূপে নিম্নগতি ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে চরম গণবিক্ষোভ দেখা দেওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার পরিবর্তে হীন হইয়া পড়িলে দেশবাসীর মারাত্মক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার ফলে পরবর্তী বৎসরের মূল আয় বর্তমান বৎসর অপেক্ষাও নিশ্চিতরূপে কম হইবে। বস্তুত সোনার ডিম দাত্রী মুরগীর পেট চিরিয়া একবারেই সব বাহির করিয়া লওয়ার মত চরম নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? একটা দেশের পক্ষে ইহা খুবই মারাত্মক নীতি। এমতাবস্থায় নূতন কর ধার্য করার পরিবর্তে রাষ্ট্র-সরকারকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বাধ্য হইয়া ঋণই গ্রহণ করিতে হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারের ঋণ গ্রহণ করার অধিকার রহিয়াছে। রাষ্ট্র-প্রধান দেশে বিপর্যয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা করিলে বায়তুলমালের দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (স) এইরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

## সরকারী ঋণের প্রকারভেদ

রাষ্ট্র-সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা সাধারণত দুই প্রকার হইয়া থাকে। হয় তাহা দেশে অতিরিক্ত অর্থোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হয়, নয় তাহা বিশেষ প্রয়োজনের কাজে ব্যয় করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারের বায়তুলমাল হইতে জনগণ এই উভয় উদ্দেশ্যেই ঋণ গ্রহণ করিত। অতএব জনসাধারণ যদি রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে বায়তুলমালও প্রয়োজন অনুসারে জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এবং এই ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে উহাকেও সেই সব শর্ত পালন করিয়া চলিতে হইবে যাহা সে ঋণ-গৃহীতা জনগণের উপর আরোপ করিয়া থাকে।

আধুনিক কালের রাষ্ট্র-সরকারসমূহ জনস্বার্থের খাতিরে এবং সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা—সেচ পরিকল্পনার জন্য খাল ও পুকুর খনন, বাঁধ বাধা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, সামুদ্রিক বন্দর ও বিমানঘাঁটি তৈয়ার করা, প্রাচীর ও সামরিক ঘাঁটি তৈয়ার করা, রেল লাইন, ট্রাম লাইন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন, প্রভৃতি অর্থোৎপাদক কজের জন্য প্রত্যেক সরকারই জনগণের নিকট সাময়িক ঋণের দাবি করে এবং এই ঋণ গ্রহণের জন্য সিকিউরিটি সার্টিফিকেট জারী ও সার্টিফিকেট গ্রহণকারীদিগকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রও প্রয়োজন হইলে এইরূপ অর্থোৎপাদক কাজের জন্য জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সে ঋণ কোন মতেই সুদভিত্তিক ঋণ হইবে না। বরং তাহার পরিবর্তে সম্মিলিত মূলধনের ভিত্তিতে পারস্পরিক ব্যবসায় হিসাবেই এই ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রকল্পের মূল মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট অংশ ঋণ-দাতাদের

মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। এই মূল প্রতিষ্ঠান হইতে সরকার নিজের সাংগঠনিক শ্রম ও দায়িত্বের বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকার যদি সাধারণ ঋণের সুদ দেওয়ার পরিবর্তে মূল ব্যবসায়ের লাভ-লোকসনে সমানভাবে শরীক থাকিবার 'সিকিউরিটি' দান করে, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাতে মুনাফার আশায় মূলধন বিনিয়োগ করিতে—অন্ততঃ সাময়িক ঋণ দিতে—বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অনুৎপাদক কাজের জন্য—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড়, প্লাবন প্রভৃতি জাতীয় ও আকস্মিক বিপদ-আপদ প্রতিরোধের জন্যও রাষ্ট্র-সরকার জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এই ঋণ দান এবং উহা পরিশোধ করা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতই মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত হইবেঃ

لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ- (بقرہ - ۲۷۹)

তোমরাও কাহারো উপর জুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হইবে না।

# রাষ্ট্রীয় ব্যয়

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয় এবং ব্যয়ের সংগত খাতের আলোচনা করা যাইতেছে।

কিন্তু এই আলোচনার সূচনায়—ইসলামী রাষ্ট্রকে কি কি দায়িত্ব পালন করিতে হয় এবং কোন কোন খাতে উহাকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়ার পরই উহার ব্যয়ের খাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

## ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ যথাযথরূপে পালন করিতে হয়ঃ

(১) দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করা ও সেই অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠনে ব্যবস্থা করা।

(২) দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা, সেই জন্য শক্তিশালি সশস্ত্র বাহিনী এবং নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামী আদর্শে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করিয়া তোলা। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - (الانفال - ٦٠)

তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সামর্থ্য অর্জন কর ও প্রস্তুত রাখ, প্রস্তুত রাখ প্রয়োজনীয় যানবাহন, যেন তোমরা উহার সাহায্যে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত ও বিতাড়িত করিতে সক্ষম হও।

(৩) অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সেজন্য পুলিশ ও দেশরক্ষা বাহিনী এবং আদার ও সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী উহার পরিচালানা করা।

(৪) দেশবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, অভার-অভিযোগ ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা। দুর্ভিক্ষ, বন্য, অজম্মা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা।

(৫) নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ কারার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মীরাসী আইন কার্যকর করণ, সামাজিক জটিলতার মীমাংসা করণ। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন, বিনামূল্য শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন ও বিধিব্যবস্থা করা।

(৬) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-রাস্তা, পুল—রেললাইন, বিমানপথ টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইন ও বেতারকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি ।

(৭) বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমাদানী-রফতানীর জন্য সামুদ্রিক যান বাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক-স্তম্ভ ও বিমানঘাটি প্রস্তুত করণ ।

(৮) কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেচের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন, বড় বড় পুষ্করিনী, খাল ও কূপ খনন, বাঁধ বাধার আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী ও সার প্রয়োগে উৎপাদন হার বৃদ্ধি

(৯) প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন, জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী দরকারী দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করিতে পারে।

(১০) দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মকল মিত্র দেশে রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার স্থয়ীভাবে নিয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন; দেশ-বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন করা, যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাত বা গাছ তলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য না হয়।

(১১) ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান; কৃষক, মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থব্যয়ের এই মোট এগারোটি খাতের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। ইহা হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরাট ব্যয়-ভার সম্পর্কে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এই অর্থ অন্ধ শোষক ও লুণ্ঠনকারীর ন্যায় নির্বিচারে দুই হাতে লুটিয়া সংগ্রহ করিতে পারে না। বরং নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি,সহৃদয়তা ও সহনুভূতি এবং বৃহত্তর কল্যাণ কামনাই হইবে উহার জন্য কর ধার্য করণ ও আদায় করার মূল ভিত্তি।

কারণ, প্রথমত সরকারী ব্যয়-নীতির সহিত সমগ্র দেশ ও জাতির স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত। সরকারী ব্যয়-নীতি যত সুষ্ঠু, সংযত ও সুবিচার পূর্ণ হইবে, দেশ ও দেশবাসীর ততই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশের রাজকোষে জনগণের হার ভাঙা খাটুনী খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, বুকের রক্ত পানি করিয়া উপার্জন করা”

অর্থসম্পদই সঞ্চিত হইয়া থাকে, এই জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ে ব্যাপারে পরিপূর্ণ সতর্কতা, বিচক্ষণতা, সামগ্রিক সামঞ্জস্য ও মিতব্যয়িতা রক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শুধু নৈতকিতার কথাই নয়, ইসলামী শরীয়াতে এ সম্পর্কে রীতিমত আইন ও বিধান রহিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রীয় অর্থ সাধারণতঃ রাষ্ট্রের পরিচালক মণ্ডলীরাই ব্যয় করিয়া থাকে, আর মূলত রাষ্ট্রীয় অর্থ তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বা নিজেদের পরিশ্রম-লব্ধ নয়, তাহা দেশের আপামর জভগণেরই শ্রমার্জিত ধন। কাজেই ইসলামের রাষ্ট্রীয়<অর্থ ব্যয় করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিকের এই ব্যাপারে কিছুতেই অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে০না—নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ও সুযে"গ দেওয়া যাইতে পারে না। অন্যথায়, রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ে মারাত্মক অপচয় দেখা দেওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঠিক এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিদাতা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন আয়কে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, অপরদিকে ব্যয়কেও সুষ্ঠু ও সুসংযত করা হইয়াছে।

ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যেমন আয়ের কতকগুলি খাত সুনির্দিষ্ট তদনুরূপ ব্যয়েরও কতকগুলি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আয় ব্যয়ের কতকগুলি খাত এমনও আছে যাহা মজলিসে শু'রা—তথা গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারণ করার অধিকার রাষ্ট্রনেতাকে দেওয়া হইয়াছে।

এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের আয়-ব্যয়কে দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারেঃ

(১) কুরআন মজীদ যেসব ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেঃ গণীমতের মাল, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অর্থ এবং বিনা যুদ্ধে সাধারণ নিয়মে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ 'ফাই' এই ভাগে গণ্য হইতে পারে।

এই সব খাত লব্ধ অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল এবং রাষ্ট্র-সরকার শুধু আমানতদার ও মাধ্যম মাত্র; ইহাতে কোন ব্যক্তি বা শক্তিকেই নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও রুচি অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই দান করা হয় নাই। তবে এই নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করার অধিকার থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) যে আমদানীর ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা রাষ্ট্র সরকারের বিচার বিবেচনার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছেঃ খারাজ, জিজিয়া, শুল্কের তিন-চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য আমদানী। এইসব আমদানী ব্যয় করার ব্যাপারে মজলিসে শু'রা (পার্লামেন্টের) পরামর্শ ও মঞ্জুরী গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

বায়তুলমালের আমদানীকে ব্যয়ের খাতের দৃষ্টিতে পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হইয়াছেঃ

(১) গণীমতের মাল, খনিজ সম্পদ ও তৎলব্ধ অর্থ এবং ভূ-গর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ।

(২) যাকাত, জমির ওশর ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শুল্ক।

(৩) 'ফাই ও বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ'।

(৪) খারাজ, জিজিয়া, অমুসলিম সংখ্যালঘু ও বৈদেশিক আশ্রয়প্রার্থী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৫) লা-ওয়ারিশ মাল।

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকার আমদানীর জন্য আলাদা আলাদা খাত ঠিক করা আবশ্যক। যেন এক খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অন্য খাতের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং ইহা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে জায়েয।[১]

## কুরআনের নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত

(১) গণীমতের মাল ঃ ইহার ব্যয়ের খাত কুরআন মজীদে নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - (الانفال- ٤١)

জানিয়া রাখ, গণীমত হিসাবে যে মাল-সম্পদই লাভ হইবে, উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, তাহার রাসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃসম্বল পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।

কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে নবী করীম (স) গণীমতের মালের বিরাট অংশ—পাঁচ ভাগের চার ভাগ—সামরিক লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র উল্লিখিত খাতে ব্যয়ের জন্য বায়তুলমালে জমা দিয়াছিলেন।

নবী করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর গণীমতের মাল পাঁচ ভাগের পরিবর্তে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হইত। খুলাফায়ে রাশেদুন কুরআনে উল্লিখিত রাসূল এবং তাঁহার নিকটাত্মীয়দের অংশ বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।[২] বর্তমানকালে উল্লিখিত অংশ দুইটি বাতিল করার পরিবর্তে তাহা সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত হইবে।[৩]

**(২) 'ফাই' ও বিনাযুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদঃ** ইহার ব্যয়ের খাতও কুরআন মজীদে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং

১. দুররে মুখতার—২য় খণ্ড।
২. কিতাবুল খারাজ. ১১পৃঃ কিতাবুল আমওয়াল, ৩২৫ পৃঃ।
৩. কিতাবুল খারাজ, ১১পৃঃ, কিতাবুল আমওয়াল, ৩২৬ পৃঃ।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে। হযরত নবী করীম (স) এই ধরণের যাবতীয় মাল-সম্পদকে নিজেরই তত্ত্বাবধানে ব্যয় ও বন্টন করিয়াছেন। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً، بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ- (الحشر- ٧)

আল্লাহ গ্রামবাসীদের—রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের—নিকট হইতে তাহার রাসূলকে যাহা কিছু বিনা যুদ্ধে দান করিয়াছেন, তাহা আল্লাহ, তাহার রাসূল, তাহার নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য (বন্টন করা) হইবে, যেন ধন-সম্পত্তি তোমাদের কেবল ধনীদেরই কুক্ষিগত হইয়া না থাকে।

আয়াতে উল্লিখিত 'রাসূল এবকং তাঁহার নিকটাত্মীয়ের অংশ বর্তমান সময় বাতিল হইয়া যাইবে এবং যাহা দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণকর কাজে—রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণ করা এবং দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায়—ব্যয় করা হইবে। ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্যই ব্যয় করিতে হইবে।

মুসলমানদের কল্যাণ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে অন্য কোন জাতির উপকার করা, তাহাকে ঋণ দেওয়া কিংবা তাহাদের সহানুভূতি লাভ করার জন্য অর্থদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে এই অর্থ সেজন্যও খরচ করা যাইবে।

মনে রাখিতে হইবে, কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতে 'ফাই' বা সাধারণ রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ ব্যয় করার ভার ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গণীমত ও ফাই'র ধন-সম্পদের খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করার ব্যাপারে যদি কোনরূপ মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানই উহার মীমাংসা করিয়া দিবে।

এখন চূড়ান্ত কথা এই যে, খারাজ, জিজিয়া ও আমদানী শুল্ক—প্রভৃতি সকল ধন-সম্পদই ফাই'র অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাহা সবই উল্লিখিতরূপে ব্যয়-ব্যবহার করা হইবে।

**(৩) যাকাতঃ** যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার খাতও কুরআন মজীদ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- (التوبه - ٦٠)

যাকাতের সম্পদ কেবল ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, তাহাদের জন্যও যাহারা তাহা সংগ্রহ করার কাজে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া আছে। তাহাদের জন্যও যাহাদের মন আকৃষ্ট করার জন্য সাহায্য দান প্রয়োজন বোধ হয়। ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে এবং ঋণগ্রস্তকে জগদ্দল ঋণভার হইতে মুক্ত করার জন্যও উহা ব্যয় হইবে। আর তাহা আল্লাহর পথেও ব্যয় হইবে, নিঃস্ব পথিকদেরও তাহা হইতে দান করা যাইবে। বস্তুত ইহা আল্লাহ তা'আলার ধার্যকৃত ফরয; আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান।

## (ক) বেকার শ্রমজীবী ও রুজিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা

কুরআনের পরিভাষায় 'ফকীর' এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়া যে খুব মজবুত এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার করণে সে বেকার ও উপার্জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। কুরআন শরীফে ঠিক এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দিক দিয়া সেই সব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও 'ফকীর' বলা যাইতে পারে, যাহারা কোন জুলুম হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কোন সামরিক এলাকা হইতে বিতাড়িত লোকদেরও 'ফকীর' বলা যাইতে পারে। কুরাইশদের অত্যাচারে যেসব মুসলমান হিজরাত করিয়া মদীনায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, কুরআন মজীদে তাহাদিগকে 'ফকীর' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছেঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا- (الحشر ٨)

যাকাতের সম্পদ সেই সব ফকীর-মুহাজিরদের জন্য, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং আল্লাহর 'অনুগ্রহ' ও 'সন্তুষ্টির সন্ধান করিতেছে।'

## (খ) মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গরীবদের সাহায্য দান এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্ভোগ ও অভাব-অনটন হইতে মুক্তিদানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য, যেন সমাজ-ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তাহারা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারে—যেন তাহাদের বুনিয়াদি প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যায়। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের জন্য ইহা এক চিরস্থায়ী রক্ষা

কবচ। ইহার আরো একটি দিক এই যে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকার কারণে ইসলামী সমাজে পুজি ও কারখানা মালিকগণ শ্রমিক-মজুরদের কখনই শোষণ করিতে পারিবে না। তাহারা উপযুক্ত বেতন দিয়া মজুর রাখিতে বাধ্য হইবে এবং মজুর রাখিয়া যথাসময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে তাহাদের বেতন আদায় করিতেও বাধ্য থাকিবে। আর তাহারা যদি শ্রমিকদের বিপদগ্রস্ত করার জন্য সহসা কারখানা বন্ধ করিয়া দেয় বা সহসা কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শ্রমজীবীগণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে, তবে তাহাতেও মালিক শ্রেণীরই পরাজয় হইবে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের এই বিভাগ এইসব শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের জন্য পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

মজুর-শ্রমিকদের সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ দায়ী। সেখানে কোন ট্রেড ইউনিয়নের বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা নাই। বস্তুত যাকাতের এই ব্যবস্থা পুঁজিদার ও মালিকদের শোষণক্ষমতার বিষদাঁত একেবারে চূর্ণ করিয়া দেয়। পুঁজিদার যদি নিজের মূলধন কোন অর্থকরী কাজে নিযুক্ত না করে, তবুও তাহাদের সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত অর্থে যাকাত ধার্য হইবে। ফলে তাহারা মজুর-শ্রমিকদিগকে ঠিক সেই পরিমাণ মজুরী দিতে বাধ্য হইবে, যতখানি ইহারা পণ্যোৎপাদনের মূল ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে।

## (গ) অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরপত্তা

'ফকীর'দের ন্যায় মিসকীনদের জন্যও যাকাতের অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 'মিসকীন' তাহাকেই বলা হয়, দৈহিক অক্ষমতা যাহাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন করিয়া দিয়াছে; বার্ধক্য, রোগ অক্ষমতা ও পংগুতা যাহাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু যাহা উপার্জন করে তাহা দ্বারা তাহার প্রকৃত প্রয়োজন মাত্রই পূর্ণ হয় না; অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পংগু ইত্যাদি সকল লোককেই 'মিসকীন' বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, মিসকীনের অবস্থা ফকীর অপেক্ষাও বেশী বিপর্যস্ত হইয়া থাকে। কারণ অর্থনৈতিক অসামর্থ্যই তাহাকে দারিদ্র ও অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হইবে যাহাতে তাহাদের প্রয়োজন মেটে এবং দারিদ্র্যের দুঃখময় পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাচ্ছন্দ্যলাভের দিকে পদক্ষেপ করিতে পারে।

ইসলাম একদিকে যেমন লোকদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বেকার, পংগু, অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও উপার্জন ক্ষমতাহীন লোকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দানেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছে। ইসলামের অর্থনীতি যে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়।

## (ঘ) যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। এক ভাগ যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত থাকিবে, আর অপর ভাগ তাহা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় বন্টন করার

কাজ সম্পন্ন করিবে। এই উভয় কাজেই যত কর্মচারী নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের সকলের প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেওয়া এবং এই গোটা বিভাগের যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা যাকাতের আমদানী হইতেই খরচ করার অনুমতি আল্লাহ্ দিয়াছেন। এই বেতন প্রত্যেক কর্মচারী যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার অনুপাতে দিতে হইবে। কিন্তু উহার নিম্নতম হার হইতেছে নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ।

## (ঙ) মুসলিমদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা

যাকাতের পঞ্চম অংশ ব্যয় করা হইবে 'মানুষের মন আকৃষ্ট' করার জন্য। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের মূল হইতেছে 'তালীফে কুলুব'। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, ইসলাম প্রচারের কাজ কোথাও প্রতিরুদ্ধ ও প্রতিহত হইলে, কিংবা মুসলমানদের উপর কোথাও অত্যাচার হইলে এবং তাহা টাকা দ্বারা দূর করা সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে যাকাতের এই অংশের অর্থ ব্যয় করা হইবে। যেন ফেতনা ও ফাসাদ, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি না হইতে পারে। অত্যাচারীও অনেক সময় টাকা পাইয়া অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করে; এমনকি, কখনো কখনো এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ-বিস্মিত হইয়া শুধু জুলুমই বন্ধ করে না, অনেক সময় ইসলামও গ্রহণ করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে সংগতিহীন নও মুসলিমকেও ইহা দ্বারা নিজ পায়ে দাড়াইবার যোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইবে।[১]

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও জনতা যদি কখনো সামগ্রিকভাবে সমধিক ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠে এবং তখন নিজদেশে এইরূপ অর্থদানের আর কোন প্রয়োজনই না থাকে, তবে এই খাতের অর্থ বৈদেশিক মুসলমান তথা মিত্র রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করা যাইতে পারিবে।

## (চ) ক্রীতদাসদের মুক্তিবিধান

যাকাতের ষষ্ঠ অংশ ব্যয় হইবে দাসত্বের বন্ধনগ্রস্ত লোকদের মস্তক মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজে। এই অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস খরিদ করিয়া তাহাকে মুক্তি করা হইবে; ক্রীতদাস নিজে এই অর্থ লাভ করিয়া উহার বিনিময়ে নিজেকে গোলামীর বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবে।

ইসলাম-সূর্যের প্রথম উদয় লগ্নে আরবদেশে দাস-প্রথার খুব বেশী প্রচলন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারী অর্থের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রথার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে। ফলে খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এই প্রথা চূড়ান্তভাবে রহিত হইয়া যায়।

আমেরিকার দাস-প্রথা বন্ধ করার জন্য রীতিমত গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামী হুকুমাত এমন এক অর্থনীতির প্রচলন করিয়াছে যে, ইহার সাহায্যে প্রথমবার আরব দেশের এই যুগ-যুগন্তকালের প্রথাটিকে নিঃশেষে খতম করা সম্ভভ হইয়াছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যখনই যে দেশেরই এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে, সেখানেই এই

১. তাফসীরে বাইজবী—প্রথম খণ্ড।

অর্থনীতির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে মানবসমাজের এই বিরাট ও জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যাইতে পারিবে।

শুধু তাহাই নয়, কাফিরদের সহিত যুদ্ধ সংগ্রাম হওয়ার ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ যদি শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া পড়ে, তবে এই অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করার ব্যবস্থা বা চেষ্টা করা যাইতে পারিবে।[১]

## (ছ) ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা

যাকাতের সপ্তম অংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে। ঋনগ্রস্ত লোক সাধারণত দুই প্রকার ঃ (১) যাহারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাহাদিগকে যাকাতের এই অংশ হইতে সাহায্য করা হইবে। (২) দ্বিতীয় সেই সব লোক, যাহারা মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। ইহারা ধনী হউক নির্ধন হউক—ঋণ শোধ করার পরিমাণ অর্থ যাকাতের এই অংশ হইতে তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ কিতাবুল খারাজে লিখিয়াছেন 'গা-রিমীন'—তাহাদিগকে বলা হয়, যাহারা নিজেদের ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ। 'হিদায়া' নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 'গারিম' তাহাকে বলে যাহাদের নিজেদের ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন অর্থ সম্পদ নাই। তাফসীর-ই তাবারী গ্রন্থে 'গারিম' শব্দ হইতে সেই সব লোক বুঝান হইয়াছে, যাহারা ঋণের দুর্বহ ভারে বন্দী ও অবনত মস্তক; কিন্তু তাহাদের এই ঋণ অপচয়, অপব্যয়, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি কিংবা দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে হয় নাই। যাহার বাড়ি-ঘর জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, কিংবা বন্যা-প্লাবনে মাল-আসবাব ভাসিয়া গিয়াছে, এই জন্য সে তাহার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না; তাহাকেও 'গারিম' বলা হয়। এই সকল ব্যক্তির পক্ষ হইতেইঃ

يَنْبَغِى لِلْاِمَامِ اَنْ يَقْضِىَ عَنْهُمْ مِّنْ بَيْتِ الْمَالِ-

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমার হইতে এই সব লোকের ঋণ আদায় করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য।

নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবেই ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا- (مسلم)

যে লোক ধন-সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া যাইবে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। আর যে লোক কোন ঋণের বোঝা অনাদায় রাখিয়া যাইবে (তাহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে যদি উহা আদায় করা না যায়, তবে) তাহা আদায় করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে।

১. মা-অর্দী প্রণীত 'আল আহ্কামুস্ সুলতানীয়া'।

অপর এক হাদীসে তাহার কথাটি এ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَنْ تَرَكَ كَلاً فَالَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَلاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ لَهُ وَاَرِثُهُ - (ابو داؤد، كتاب الفرائض)

যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বভার রাখিয়া যাইবে তাহা বহন করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে। যে ব্যক্তি ধন-মাল রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের হইবে। আর যাহার কেহই উত্তরাধিকারী থাকিবে না, আমিই তাহার উত্তরাধিকারী হইব। আমি তাহার অসিয়ত পূরণ করিব।

নবী করীম (স)-এর এই ঘোষণায় নিঃস্ব ঋনগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করার এবং তাহাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা-ব্যবস্থার ভার সরাসরিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা কোন বাহ্যিক প্রতিকূলতার কারণে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, যাকাতের এই অংশ হইতে তাহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে হইবে।

## (জ) বিনাসুদে ঋণ দান

ইসলামী রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদিগকে কেবল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবে তাহাই নয়, ইতিবাচকভাবে জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু তাহা সুদের ভিত্তিতে হইবে না। উপরন্তু যাকাতের যে অংশ ঋণ শোধ করার জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতে লোকদিগকে পূর্বাহ্নেই ঋণ দেওয়া যাইতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদী কারবার ও সুদের লেন-দেন একেবারেই জায়েয নহে। কাজেই কেহ কাহাকেও টাকা ঋণ দিলে তাহাতে কোন ক্রমেই সুদ লওয়া বা দেওয়া যাইতে পারে না। কোন নাগরিকই যাহাতে সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করিতে না পারে বা ঋণ লইয়া সুদ দিতে বাধ্য না হয়—ইসলামী রাষ্ট্রে তাহার পুরাপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদিগকে এই সুদ দেওয়া ও নেওয়ার পাপ-অভিশাপ হইতে চিরতরে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে বিনাসুদের ঋণ দেওয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার জন্য বায়তুলমালের একটি বিভাগ স্থায়ীভাবে কাজ করিবে। দেশের জনগণ—এমনকি স্বয়ং খলীফাও এই ফান্ড হইতে প্রয়োজন অনুসারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বায়তুলমালসমূহ এই জন্য তৎপর থাকিত বলিয়া সেকালে সুদী কারবারের অস্তিত্ব পর্যন্ত কোথায়ও ছিল না।

যে সব দেশে অবাধ-স্বাধীন অর্থনীতির (Laissez faire) প্রচলন থাকে এবং রাষ্ট্র-সরকার যে দেশের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র

হস্তক্ষেপ করে না, সে দেশে অসংখ্য প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জটিল সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। সেখানে মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের বিনিময়ে ঋণ দান করিয়া অভাবী লোকদিগকে জোঁকের মত শোষণ করিতে পারে। ইউরোপ আমেরিকা—এমনকি রাশিয়া, কোথায়ও ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। একদিকে শোষকগণ মারাত্মকভাবে সুদের জাল বিস্তার করিয়া অর্থ-লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে এবং অন্যদিকে ইহাদের নামে স্থাপিত আদালতসমূহ সেই শোষণকে আইনসম্মত গণ্য করিয়া উহাকে অধিকতর কার্যকর করিয়া তোলে। পরিণামে পাঁচ-দশ টাকা ঋণ গ্রহণের কারণে এক এক ব্যক্তির যাবতীয় বিত্ত-সম্পত্তি নিলামে উঠিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। মিঃ এইচ, উলফ-এর কথায়, সমগ্র দেশ সুদখোরদের উদগ্র গ্রাসের মধ্যে বন্দী হইয়া আছে, ঋণের লৌহ শলাকা দেশের শৈল্পিক ও কৃষি ক্ষেত্রের সর্ব প্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াইয়া আছে। অথচ কোন মানুষই এমন সমাজব্যবস্থা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারে না, যাহাতে অধিকাংশ লোকই ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ঋণী হইয়া তিক্ত জীবন যাপন করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু তাহাই নয়, মৃত্যুর পরও এই ঋণের জাল ছিন্ন হয় না, নিজের সন্তানদিগকেও তাহারা এই ঋণভারে জর্জরিত করিয়া রাখিয়া যায়।

এই চিত্র পুঁজিবাদী সমাজের সঠিক রূপই উদ্ভাসিত করে; কিন্তু ইসলামী সমাজের রূপ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলাম একদিকে যেমন সুদকে চিরতরে হারাম করিয়া দিয়াছে, অপর দিকে যাকাতের অর্থ হইতে অভাবী লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সুদের শর্তে ঋণ গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতাই অবশিষ্ট থাকিতে দেয় নাই।

ইসলাম যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ইসলামী জনতাকে উৎসাহিত করিয়াছে, ঠিক সেই সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়েছে। কুরআন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে ঃ

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً –
(البقره – ٢٤٥)

আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ যে লোকই দান করিবে ....... আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অসংখ্যগুণ বেশী ফিরাইয়া দিবেন।

এখানে 'উত্তম ঋণ' এর অর্থ বিনাসুদে ঋণ দান এবং আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ অভাবগ্রস্ত লোককে কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কাজে কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঋণদান করা। কৃষিজীবীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে কৃষি ঋণ দেওয়া বায়তুলমালের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে ফিকাহবিদদের ফয়সালা হইলঃ

اِنَّ صَاحِبَ الْاَرْضِ الْخَرَاجِيَّه اِذَا عَجزَ عَنْ زِرَاعَةِ اَرْضِه لِفَقْرِه دُفِعَ اِلَيْه كِفَا يَتُهٗ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَرْضًا لِيَعْمَلَ وَيَسْتَغِلَّ اَرْضَهٗ – (ابن عابدين ج ٣ ص ٣٦٤)

জমির মালিক যদি দারিদ্র্যের কারণে তাহার জমি চাষ করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে প্রয়োজন মত তাহাকে বায়তুলমাল হইতে বিনাসুদে ঋণ দিতে হইবে, যেন সে কৃষিকাজ করিতে ও তাহার জমিতে ফসল ফলাইতে সক্ষম হয়।'

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সমাজে সুদের হার একেবারে শুণ্যের কোঠায় পৌঁছিয়াছে এবং বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রহিয়াছে, বস্তুত তাহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সুসভ্য সমাজ। নীতিগতভাবে বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কার্যকররূপে চালু করার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত তাহারা পেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে সমবায় ঋণ দান সমিতি' বা ব্যাংকের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের পরিবর্তে সুদের অক্টোপাশে সমগ্র দেশকে দুশ্ছেদ্যভাবে বাধিয়া ফেলিয়াছে।

ইংলন্ডের অষ্টম হেনরীর শাসনকালের পূর্বেই খৃস্টান প্রজাদিগের জন্য সুদী কারবার ও সুদী লেন-দেনকে আইনত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন শুধু এই জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল যে, সেই সঙ্গে বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার কোন বাস্তব ব্যবস্থাই ছিল না। অন্য দিকে ইয়াহুদীদিগকে সুদী কারবার করার আবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ইহাদের পদাংক অনুসরণ করিয়া খৃস্টানগণও সুদী কারবার করিতে শুরু করিয়াছিল। অতঃপর সরকারকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা দিয়াই ক্ষান্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইল।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি সুদকে হারাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নাগরিকগণ যাহাতে বিনাসুদে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ লাভ করিতে পারে, তাহার সুষ্ঠু ও স্থায়ী ব্যবস্থাও করিয়াছে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতে।

ইসলাম নাগরীকদিগকে শুধু অবাধ স্বাধীনতা দান করে না, স্বেচ্ছাচারিতার সহিত ধন লুন্ঠন ও শোষণ পীড়ন চালানোর কোন অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র কাহাকেও দেয় নাই।

## (ঝ) ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

যাকাতের নবম অংশ ব্যয় হইবে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহ পথে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জন-কল্যাণকর কাজে—দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই—এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

## (ঞ) নিঃস্ব পথিকদের পাথেয় সংস্থান

যাকাতের দশম অংশ ব্যয় করা হইবে 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্য। যেসব লোক কোন পাপ-উদ্দেশে ঘরের বাহির হয় নাই—হইয়াছে কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এবং এইরূপ দেশ-ভ্রমণ ব্যাপদেশে তাহারা একেবারে নিঃসম্বল হইয়া

পড়িয়াছে, তাহাদিগকে যাকাতের এই অংশের টাকা হইতে এমন পরিমাণ দান করিতে হইবে যেন তাহা দ্বারা তাহাদের তাৎক্ষণিক অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং নিজ ঠিকানায় ফিরিয়া যাইতে পারে। এমন কি, যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে চাহে; কিন্তু তাহাদের পথ খরচের সংস্থান হয় না বলিয়া যাইতে পারে না, এইরূপ লোকদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল এই অংশের অর্থ হইতে যাতায়াতের খরচ দান করিবে। কোন গ্রামবাসী শ্রমিক শহরে আসিয়া উপার্জন করিতে থাকা কালে আকস্মিক অনিবার্য কারণে যদি তাহাকে গ্রামে (ফিরিয়া) যাইতে হয়, এবং তাহার পথখরচ কিছুই না থাকে, তবে তাহাকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত দরাজ করিতে বাধ্য না করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রই তাহার প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিবে। এইসব আকস্মিক প্রয়োজনশীল লোকের নিজ নিজ ঘরে যদি বিপুল পরিমাণের অর্থ-সম্পদও থাকিয়া থাকে, তবুও তাহাকে এই সময় যাকাতের অর্থ হইতে সাহায্য দান করা শরীয়ত বিরোধী কাজ হইবে না।

যাকাতের এই অংশের অর্থ হইতে কেবল যে নগদ টাকা দিয়া বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা হইবে তাহাই নয়। পথিকদের জন্য মুসাফিরখানা, ওয়েটিং রুম, সাধারণ গোসলখানা ইত্যাদিও তৈয়ার করা যাইতে পারিবে। যেসব রাস্তাঘাট ও পুল ভাংগিয়া যাওয়ার দরুণ সাধারণ লোকদের পথ চলাচল কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তাহাও এই অংশের অর্থ দ্বারা মেরামত বা পুণনির্মাণ করা যাইবে।

যাকাতের অর্থ যে পরিমাণই আদায় হউক না কেন, তাহা যে সব সময় বাধ্যতামূলকভাবে আটটি খাতের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করিতে হইবে, ইসলামী অর্থনীতি এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই। প্রয়োজন হইলে উহার বিশেষ একটি খাতেও যাকাতের যাবতীয় অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে।[১]

এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যাকাত বাবাদ আদায়কৃত অর্থ আঞ্চলিকভাবে বন্টন করা আবশ্যক। স্থানীয় বায়তুলমালে উক্ত অর্থ জমা করা এবং উহারই মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তাহা বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (স) একস্থানে আদায়কৃত যাকাত ও সদকা অন্যত্র লইয়া যাওয়াকে সমর্থন করেন নাই। এ সম্পর্কে হাদীস অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তবে নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তখনকার কথা স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখা ভাল যে, আটটি খাতের বাহিরে অন্য কোন খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা কিছুতেই জায়েয হইতে পারে না।

নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَاغَيْرِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ

جَزَّهَا ثَمَانِيَةَ جُزْءٍ- (معالم السنن ج ٢ ص ٥٩)

১. কুরআন মজীদে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাত নির্ধারণের অর্থ এই নয় যে, উহা ভাগ ভাগ করিয়া আটওটি খাতে ব্যয় করিতে হইবে। বরং উহার তাৎপর্য হইল, এই আটটি খাতে বা উহার যে কোন একটি খাতেও ব্যয় করা যাইবে।

আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয়খাত নির্ধারণে কোন নবী বা অপর কাহারো ফয়সালার অপেক্ষায় থাকিতে রাযি হন নাই। তিনি নিজেই এই খাত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি ইহার ব্যয়খাতকে আটটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

বর্তমান কালের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিকে অর্থোপার্জনের অবাধ স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে এবং গরীবদের সাহায্যার্থে তাহাদের নিকট হইতে ইনকাম-ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যত ইনকাম ট্যাক্স বাবদ আদায়কৃত অর্থ দরিদ্র জনগণের কোন কল্যাণেই ব্যবহৃত হয় না, তাহা ধনীদের পকেটেই প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। কারন রাষ্ট্র-সরকারসমূহ ধনীদের নিকট হইতে মোটা রকমের অর্থ ঋণ বাবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইনকাম-ট্যাক্স বাবদ লব্ধ অর্থ সেই ঋণের সুদ আদায় করিতে-ই ব্যয় হইয়া যায়। ফলে দেশে অর্থ-সম্পদের আবর্তনের পরিবর্তে উহার সমগ্রটা মুষ্টিমেয় পুঁজিদারদেরই কুক্ষিগত হইয়া থাকে। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া নিখিল মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করার আর কোন পন্থাই নাই—থাকতে পারে না।

## কুরআনে অবর্ণিত ব্যয়ের খাত

### বায়তুল মালের ব্যয়

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতে আরো অনেক খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, যাহার উল্লেখ কুরআন মজীদে করা হয় নাই। ইসলামী অর্থনীতি নিত্য নূতন উদ্ভাবিত প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করার সীমাবদ্ধ অনুমতি ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্র-প্রধানকে দিয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষ কয়েকটি খাত সম্পর্কে আলোচনা এবং সেই সঙ্গে উক্ত খাতসমূহে অর্থ ব্যয় করার উপযুক্ত মানের উল্লেখ করা যাইতেছে।

## রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতন বায়তুলমাল হইতেই আদায় করা হইবে। নবী করীম (স) মুসলমানদের সামগ্রিক আয় হইতে যে অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইতেই তাঁহার এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ হইত।

তাহার পর প্রথম খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রা)কেও ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতে বেতন দেওয়া হইত। হযরত আবূবকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরও যখন হযরত উমর ফারূক (রা) মুসলমানদের পক্ষ হইতে বলিলেনঃ "আপনি ব্যবসায়কার্যে লিপ্ত হইলে মুসলমানদের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য অনেকখানি ব্যাহত হইবে। অতএব আপনি ইহা ত্যাগ করুন।"

হযরত আবূবকর (র) নিজের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন ঃ "জনগণের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যও চালাইয়া যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কাজে পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততাও ঐকান্তিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ওদিকে আমার ও পরিবারবর্গের জৈবিক প্রয়োজনও রহিয়াছে।"

অতঃপর মুসলমানদের মজলিসে শু'রায় খলীফাকে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তাঁহার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার উপযোগী পরিমাণ অর্থ ইসলামী হুকুমাতের বায়তুলমাল হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১]

## রাষ্ট্র-প্রধানের বেতনের হার

রাষ্ট্র-প্রধানকে কি পরিমাণ বেতন দেওয়া হইবে, এ সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি নীতি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَنَا وَمَالُكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيْمِ اِنِ اسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ وَاِنِ افْتَقَرْتُ اَخَذْتُ بِالْكَفَافِ اَوْ اَكَلْتُ بِالْمَعْرُوْفِ- (كتاب الخراج ابو يوسف ص ١١٧)

'তোমাদের সামগ্রিক ধন-সম্পদ ইয়াতীমের ধন-সম্পদের সমতুল্য এবং আমি যেন ইয়াতীমের মালেরই রক্ষানাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই—অভাবী না হই তবে আমি বায়তুলমাল হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তবে অপরিহার্য পরিমাণ কিংবা সাধারণ প্রচলিত মানের বেতনই আমি গ্রহণ করিব।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই বাণীটি ইয়াতীমের ধন-সম্পত্তির হিফাজতকারী সম্পর্কে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীর ভিত্তিতেই উক্ত হইয়াছিল ঃ

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ- (نساء -٦)

ইয়াতীমের ওলী বা অভিভাবক যদি ধনী হয় তবে ইয়াতীমের মাল হইতে তাহার বেতন গ্রহণ না করাই উচিত। আর সে গরীব হইলে সাধারণ প্রচলিত পরিমাণ অনুযায়ী (বেতন) গ্রহণ করিবে।

মোট কথা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতনের হার এই আয়াত অনুসারে তাহাই হইবে, যাহা তাহার প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্য-মূল্য অনুসারে সাধারণ প্রচলিত পরিমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হযরত আবূবকর (রা)-কে প্রথমে দৈনিক 'তিন দিরহাম' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদের বর্ণনা অনুসারে প্রথমে তাঁহার জন্য বার্ষিক 'দুই হাজার' দিরহাম' দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যখন ইহা দ্বারা তাঁহার প্রয়োজন পূর্ণ হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, তখন বাৎসরিক আরো পাঁচশত দিরহাম বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত উমর ফারূক (রা) বায়তুলমাল হইতে বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম বেতন বাবাদ গ্রহণ করিতেন।

১. বুখারী শরীফ ও তারিখ-ই তাবারী (৪র্থ খণ্ড)

হযরত উসমান (রা) খলীফা নিযুক্ত হইয়াও বায়তুলমাল হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না। কারণ আল্লাহ তাহাকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বায়তুলমাল হইতে কিছু গ্রহণ না করিয়া বরং নিজের ধন-সম্পদ দ্বারা বায়তুলমালকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, নিম্নতম প্রয়োজন নিশ্চিতরূপে পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী বেতন দেওয়াই হইল ইসলামী অর্থনীতিতে কর্ম চারীদের বেতন দেওয়ার স্থায়ী মান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্র-প্রধান বায়তুলমালের অর্থ-সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেন না। জনগণের মঞ্জুরী ব্যতীত নিজের জন্যও কোন জিনিস গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নীতি-বিরোধী কাজ বলিয়া মনে করিতেন। হযরত আবূবকর (রা) নিজের জন্য নিম্নতম প্রয়োজন পূর্ণ করার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন যে, উহার এক বিন্দু পরিমাণ বেশী গ্রহণ করিতে তিনি কখনই প্রস্তুত হইতেন না। তাঁহার স্ত্রী দৈনিক প্রয়োজন পূর্ণ করার পরও একটি বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করার উদ্দেশে মাসিক বেতন হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত আবূবকর (রা) উহাকে নিজর নিম্নতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে করিয়া উহার সবটাই বায়তুরমারে পিরাইয়া দিলেন। এমনকি, মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ ধন-সম্পদ হইতে সেই পরিমাণ সম্পদই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এমনকি, মৃত্যুর পর তাহার নিজ ধন-সম্পদ হইতে সেই পরিমাণ সম্পদই পিরাইয়া দিয়াছিলেন—যাহা তিনি বেতন বাবাদ বায়তুলমাল হইতে ইতিপূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## সরকারী কর্মচারীদের বেতন

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের ন্যায় অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর বেতনও বায়তুলমাল হইতেই আদায় করা হইবে। কারণ ইহারা সকলেই মুসলমান জনগণের সামগ্রিক ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে নিরন্তর আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে; অতএব জনগণের সামষ্টিক ধনভান্ডার—বায়তুলমাল—হইতে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। নবী করীম (স) নিজে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিয়াছেন এবং খুলাফাযে রাশেদুনের যুগেও অনুরূপ কাজ হইয়াছে।

বস্তুত রাষ্ট্র-সরকারই হইতেছে মানবীয় শক্তি (Man Power) ও শ্রম শক্তির (Labour) সর্বশ্রেষ্ট খরিদ্দার। কাজেই সাধারণভাবে দেশের শ্রম ও চাকুরীর বেতন নির্ধারণের উপর সরকার নির্ধারিত বেতনের হার ও বেতন নির্ধারণের মূলনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব তীব্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র-সরকার যদি বেতনের সুবিচারপূর্ণ হার নির্ধারণ করে, তবে সমগ্র দেশেই সেই মান অনুযায়ী মজুর-শ্রমিক ও চাকরিজীবিদের বেতন নির্ধারিত হইতে থাকিবে। এই জন্য ইসলামী অর্থনীতি সাধারণভাবে সকল প্রকার মজুর-শ্রমিকদের—বিশেষ করিয়া সরকারী কর্মচারীদের—বেতনের হার নির্ধারণের মূলনীতি উপস্থাপিত করিয়াছে।

দুনিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাকরিজীবীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে তিনটি মৌলিক ত্রুটি বিদ্যমান।

প্রথমত, বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীদের কমপক্ষে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা, এক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের পক্ষেও তাহা যথেষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়ত, বেতনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে একজন চাকরিজীবীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও পোষ্যদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হয় না—সেদিকে লক্ষই দেওয়া হয় না। ফলে দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন কর্মচারী একাকী ও পারিবারিক দায়িত্বমুক্ত হইয়াও তিন-চারশ' টাকা বেতন পাইতেছে, আর অন্য দিকে এক ব্যক্তির উপর ৮/১০ জন লোকের ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও সে মাত্র চার-পাঁচশ' টাকা বেতন পাইতেছে।

আর তৃতীয়ত, বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে অবিচারমূলক আকাশছোঁয়া পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল দেশেই কমসে কম ও সর্বাপেক্ষা অধিক বেতনের মধ্যে পার্থক্য ১-৩০এর সমান। অন্য কথায় একতলা বাড়ি ও তিরিশ' তলা বাড়ি পাশাপাশি দাঁড় করিলে যে পার্থক্য চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে, বর্তমানকালের বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বেতনের হারেও অনুরূপ পার্থক্যই রক্ষিত হইয়াছে। একই সমাজের কর্মচারীদের বেতনের এই পার্থক্য সমাজ ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ এক মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে, যেমন বিপর্যয় হইতে পারে ঘন্টায় এক মাইল গতির একটি গাড়িকে ঘন্টায় ত্রিশ মাইল দ্রুতগামী একটি গাড়ির সহিত জুড়িয়া দিলে।

এইরূপ অবিচারমূলক বেতন নির্ধারণের পরিমাণ অনিবার্যরূপে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দেখা দেয়। একদিকে নিম্ন শেণীর কর্মচারীদের মনে—যাহারা মূলতই এক একটি দেশ ও রাষ্ট্রের মেরুদন্ড—রাষ্ট্রের প্রতি ভয়ানক বীতশ্রদ্ধা ও অনাসক্তির ভাব জাগিয়া উঠে। তাহারা নিজেদের অপরিহার্য প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য দুর্নীতি করিতে ও ঘুষ লইতে বাধ্য হয়। কম বেতন প্রাপকদের মনে স্বাভাবত ঃ অধিক প্রাপকদের প্রতি চরম প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ জাগ্রত হয় এবং অন্যদিকে অধিক প্রাপকদের মনে অহংকার, গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও নিরংকুশ বিলাসিতা, অপচয়, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রলয়ংকর মানসিক ভাব জাগিয়া উঠে। ইহার পরিণামে কোন রাষ্ট্রই যে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এই অত্যাচারমূলক পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য ও পার্থক্য সৃষ্টি ইসলামী অর্থনীতি মাত্রই বরদাশত করিতে পারে না।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের স্বরূপ এবং প্রয়োজন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে

বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। নবী করীম (স) এ সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ একটি নীতি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَاِنْلَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْسِبْ خَادِمًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنًا فَلْيَكْسِبْ مَسْكَنًا مَنِ اتَّخَذَغَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٍ اَوْسَارِقٌ- (ابو داؤد كتاب الخراج)

যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হইবে, [সে যদি বিবাহ না করিয়া থাকে, তবে] সে বিবাহ করিয়া লইবে। তাহার কোন গৃহ চাকর না থাকিলে সে তাহা রাখিয়া লইবে। তাহার ঘর না থাকিলে সে একখানা ঘর প্রস্তুত করিব। ইহার অধিক যে গ্রহণ করিবে সে হয় বিশ্বাস-ঘাতক, না হয় চোর।

এই হাদীস ছোট-বড় সকল প্রকার সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে একটি স্থায়ী মান নির্ধারণ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারী হওয়ার দিক দিয়া উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য নাই। সকল কর্মচারীই সমান দায়িত্বশীল। অতএব রাষ্ট্র সরকার সকলেই বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি একজন গভর্ণর ও একজন পিওন চাপরাশীর বুনিয়াদী প্রয়োজনের মান সম্পর্কে কোনই পার্থক্য করে নাই। খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও বেতনের হার উক্ত হাদীস অনুসারেই নির্ধারিত হইয়াছিল।

এ সম্পার্কে হযরত উমর ফারূক (র)-এর নিম্নলিখিত বৃক্তৃতাংশ হইতে চূড়ান্ত মূলনীতি লাভ করা যায় ।

اَلرَّجُلُ وَبَلَاءُهُ فِي الْاِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الْاِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاءُهُ فِي الْاِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ فِي الْاِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ فِي الْاِسْلَامِ-

(ابو دداؤدد، كتاب الخراج)

* এক ব্যাক্তি ইসলামের জন্য কি পরিমাণ দুঃখ ভোগ করিয়াাছে,

* এক ব্যাক্তি ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে,

* এক ব্যক্তির ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়াছে,

* এক ব্যক্তির ইসলামী জীবন—যাপনের দিক দিয়া প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি।

* এবং এক ব্যাক্তির উপর তাহার পরিবারের কতজন লোকের ভরণ পোষণের দায়িত্ব রহিয়াছে।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেতন নির্ধারণের জন্য ইহা অপেক্ষা সুবিচারপূর্ণ ন্যায়-নীতি আর কিছুই হইতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতিতে বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে গৃহীত এই নীতিকে বলা হয়—"ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন উপযোগী বেতন দেওয়ার নীতি"। খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এই নীতিই কার্যকর

ছিল। ফলে একটি পরিবারে যখনি একটি সন্তানের জন্ম হইত, তখনি বায়তুলমাল হইতে তাহার জন্য বৃত্তি দান শুরু করা হইত।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী অর্থনীতি বেতন দেওয়ার ব্যাপারে সংখ্য-সাম্য বা পরিমাণ-সাম্যাকে কখনো ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নাই। কারণ বস্তুতই তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে আকাশ পাতাল অবিচারমূলক বৈষম্যকেও বরদাশত করা হয় নাই। বরং তাহা চিরতরে নির্মুল করিয়াছে। কর্মচারীদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যোগ্যতা , কর্মক্ষমতা, কাজের ও দায়িত্বের স্বরূপ এবং পদমর্যাদার স্বাভাবিক পার্থক্যকে ইসলামী অর্থনীতি স্বীকৃতি দিয়াছে। বেতনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে এই পার্থক্য অবশ্যই বর্তমান থাকিবে। ইসলামী অর্থনীতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অধিকার হরণ করিয়া, তাহাদের অনিবার্য প্রয়োজন অপূর্ণ রাখিয়া বড় বড় অফিসারদের বিলাস বাসনের ব্যবস্থা করার অনুমতি কখনই দিতে পারে না।

## লা-ওয়ারিস শিশু সন্তান প্রতিপালন

লা-ওয়ারিশ শিশু-সন্তানদের প্রতিপালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে সন্তান নিজে উপার্জনে সক্ষম নয়, যাহার নিজের কোন অর্থ-সম্পদ নাই, কিংবা যাহার কোন গার্জিয়ান বা কোন নিকটাত্মীয়ও এমন নাই যে তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে; ইসলামী রাষ্ট্রই তাহার লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী হইবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এই ধরনের সন্তানদের মোটেই নিষ্কর্ম বসিয়া খাইতে দিবে না , তাহাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশষ শিল্পকার্যে ট্রেনিং দিবে। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিস সন্তানদের সম্পর্কেও এই নীতি প্রযোজ্য হইবে।

## কায়েদী ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ

যেসব অপরোধীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইবে, যেসব অপরাধীর পৌনপুনিক অপরাধের দরুন জনগণ অতিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী পরিবেশন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অতএব তাহা বায়তুলমাল হইতে আদায় করা হইবে। যেসব লা-ওয়ারিস কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হইবে।

## ক্ষতিপূরণ দান

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সামষ্টিক কাজের জন্য কিংবা যুদ্ধের ঘাঁটি নিমার্ণ, সৈনিকদের চলাচল অথবা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নাগরিকদের বিশষ কোন ক্ষতি সাধিত হইলে উহার ক্ষতিপূরণ দান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নিকট একজন কৃষক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সিরিয়ার একদল সৈন্যের পথ অতিক্রম করার সময় তাহার শস্যক্ষেত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি বায়তুলমাল হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার দিরহাম দান করেন।

মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের উপর এইরূপ বিভিন্ন প্রকার খরচের অসংখ্য ও বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়ে, যাহা পূরণ করা উহার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সব দায়িত্ব পালনের পরও বায়তুলমালের ধনসম্পদ উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহাও জনগণেরই কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। হযরত উমর ফারূক (রা) তাহাই করিয়াছেন। তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ হইতে কেবল শহরবাসীদের জন্যই নয়, গ্রামবাসীদের জন্যও-কে কত পাইতে পারে, তাহা নীতিমত পরীক্ষা করিয়া সেই পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরকালে সামষ্টিক অর্থ-সম্পদ য়খণ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন তিনি দেশবাসীর জন্য পোশাকেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের জন্য সুদৃঢ় ও উন্মুক্ত বায়ুময় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কুফা, বসরা ও ফুসতাত প্রভৃতি এলাকায় নূতন নূতন শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য প্রশস্ত রাস্তাঘাট, দোকান ও চক ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এমনকি, প্রত্যেক মহল্লার লোকদের উট বাঁধিবার জন্য আলাদা স্থানও তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন।[১] নূতন নূতন খাল কাটিয়া ও ঝর্ণাধারা বানাইয়া শহরে ও গ্রামে জল সেচের নিখুত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে ইসলামী রাজ্যের প্রত্যেকটি বাসিন্দাই আহারের জন্য খাদ্য, পরিধানের জন্য পোশাক এবং থাকিবার জন্য বাড়িঘর করিয়াছিলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সময় অন্ধ ও গরীব নাগরিকদের পথ চলার কাজে সাহায্য করার জন্য এবং পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের সেবার জন্য সরকারী খরচায় লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিবাহে সঙ্গতিহীন যুবক-যুবতীদের বিবাহের ব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত খরচপত্রও সরকারের তরফ তইতে বহন করা হইয়াছিল। ফল কথা, ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তিত ন্যায়নিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের কোথায়ও দারিদ্র বা অনশন ইত্যাদির নাম-নিশানা ছিল না। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্য দেশ কাল নির্বিশেষে সকল সময় ও সকল দেশেই লাভ করা যাইতে পারে।

## অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামী অর্থনীতির এই সামাজিক নিরাপত্তা কেবল মুসলিম নাগরিকদিগকেই দান কার হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল দেশাবাসীই এই নিরাপত্তার লাভ করিতে পারিবে। ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যেসব স্থানে 'মিসকীন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীর ধন-সম্পদে তাহাদের অধিকারে কথা ঘোষণা করা হইঢাছে, সকল ক্ষেত্রেই ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নিঃস্ব-দরিদ্র নাগরিকদেরই বুঝানো হইয়াছে।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে হযরত খালিদ ইবন অলীদ (রা) 'হীরা' বাসীদের সহিত যে সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলে, তাহাতে নিনি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেনঃ

وَجَعَلْتُ لَهُمْ اَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفُ عَنِ الْعَمَلِ اَوْ اَصَا بَتْهُ افَةٌ مِنَ الْاٰفَاتِ اَوْكَانَ

১. মাওর্দী লিখিত "আল-আহ্কামুস্-সুলতানীয়া" গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ اَهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِيَالُهُ مَا اَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ دَارِ الْاِسْلَامِ-

এবং আমি তাহাদিগকে এই অধিকার দান করিলাম যে, তাহাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে কিংবা কাহারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসিয়া পড়ে, অথবা কোন ব্যক্তি যদি সহসা এত দূর দরিদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহার সমাজের লোকেরা তাহাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন তাহার উপর ধার্য জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হইবে, সেই সঙ্গে তাহার ও তাহার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতেই করা হইবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া থাকিবে।[১]

হযরত উমর ফারূক (রা) দেমাশক যাত্রাকালে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক খৃস্টান জনগোষ্টির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাদকার ফান্ড হইতে অর্থদান করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।[২]

হযরত উমর (রা) এক বৃদ্ধ ইয়াহুদী ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহাকে ভিক্ষা করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমাকে জিজিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা আদায় করার আমার কোনই সামর্থ্য নাই। হযরত উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন, বায়তুলমাল খাজাঞ্চীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেনঃ 'ইহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, ইহার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দাও, এবং ইহার নিকট হইতে জিজিয়া লওয়া বন্ধ কর।' অতঃপর বলিলেন ঃ "আল্লাহর শপথ, ইহার যৌবন শক্তিকে আমরা কাজে ব্যবহার করিব, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় ইহাকে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দিব, ইহা কোনমতেই ইনসাফ হইতে পারে না"।[৩]

হযরত উমরের এই কথার শেষাংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাষ্ট্র সরকার ধনশালীদের নিকট হইতে কর, রাজস্ব ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় কারবে, যুবশক্তিকে জাতীয় কাজে নিযুক্ত করিবে, ইহা দেশবাসীর উপর রাষ্ট্রেস্বাভাবিক অধিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একজন নাগরিক যখন দরিদ্র হইয়া পড়িয়া কিংবা বৃদ্ধ হইয়া উপার্জন ক্ষমতা হারাইবে, তখন তাহার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র-সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার,ইহাও যথাযথভাবে পূর্ণ করা অপরিহার্য। ইসলামী অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। দুনিয়ার পুজিবাদী ও অন্যান্য অর্থনীতির শুধু সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতনের একটা সামান্য অংশ পেনশন বাবদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার মৌলিক প্রয়োজন পুরন হয় কিনা, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করা হয় না, তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। এই কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১. কিতাবুল খারাজ, ১৪৪ পৃঃ।
২. বালাজুরি লিখিত 'ফতূহুল বুলদান'।
৩. আবূ ইউসুফ লিখিত 'কিতাবুল খারাজ'–১৮৮ পৃঃ।

# বায়তুলমাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত : 'রাষ্ট্রীয় কোষাগার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'বায়তুলমাল' বলিতে সরকারের অর্থ-বিভাগীয় কর্মকেন্দ্রকে বুঝায় না, পুঞ্জিকৃত ধন-সম্পদকেই বলা হয় 'বায়তুলমাল'। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই ইহা সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। এই জন্য বলা হইয়াছে :

مَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَالُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ-

বায়তুলমালের সম্পদ মুসলমানদের (ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সম্মিলিত সম্পদ।

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। কি রাষ্ট্র-প্রধান, কি সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ, উহার উপর কাহারই একচেটিয়া বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইতে পারে না। এই কথাই ঘোষিত হইয়াছে নবী করীম (স)-এর এই বাণীতে :

مَاأُعْطِيْكُمْ وَلَاأَمْنَعُكُمْ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضِعُ حَيْثُ أُمِرْتُ-

আমি তোমাদিগকে দান-ও করি না, নিষেধও করি না, আমি তো বন্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, আমি সেইভাবেই জাতীয় সম্পদ বন্টন করিয়া থাকি।

## বায়তুলমালের সূচনা

অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে, মদীনা নগরে প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, মূলত সেই দিন হইতেই বায়তুলমালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনরূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত না, তাহার অবকাশও তখন ছিল না। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের অবস্থা অত্যন্ত নগন্য ছিল বলিয়াই ধন-সম্পদ হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (স) অভাবী লোকদের মধ্যে তাহা বন্টন করিয়া দিতেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেই সর্ব প্রথম বায়তুলমাল বাস্তব রূপ লাভ করে এবং হযরত আবূ উবাইদাহ (রা)-কে উহার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনো জাতীয় প্রয়োজনের তীব্রতা হেতু আমদানীকৃত সম্পদ অবিলম্বে বন্টন করিয়া দেওয়া হইত। এই জন্য বায়তুলমালের দ্বার প্রায় সব সময়ই তালাবদ্ধ হইয়া থাকিত। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাঃ) দায়িত্ব গ্রহণের পর বায়তুলমালকে একেবারে শুন্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় খলিফার সময়ই ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে প্রচুর আমদানী হইতে থাকে। ফলে প্রদেশসমূহেও বায়তুলমাল স্থাপিত হয়।

হযরত উমর ফারূক (রা) ও এই কথাই বলিয়াছিলেন তাঁহার এই বিপ্লবী ঘোষণায় ঃ

وَاللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحَقُّ بِهٰذَاالْمَالِ مِنْ اَحَدٍ وَمَااَنَا بِاَحَقَّ بِه مِنْ اَحَدٍ وَوَاللّٰهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَحَدٌ الاَّوَلَهُ فِى هٰذَا الْمَالِ نَصِيْبٌ وَلَئِنْ بَقِيْتُ لَكُمْ لَيَاْتِيَنَ الرَّاعِى بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظَّهُ مِنْ هٰذَاالْمَالِ وَهُوَ يَرْعِىْ مَكَانَهُ-

আল্লাহর নামে শপথ, এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেহ অপর কাহারো অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবি করিতে পারে না। আমি নিজেও অপর কাহারো অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবিদার নহি। আল্লাহর শপথ, প্রত্যেক মুসলিমেরই জন্য এই সম্পদে নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে। আর আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে ছান্‌য়া পর্বতের রাখাল নিজ স্থানে পশু চরাইবার কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও এই মাল হইতে তাহার নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করিতে পারিবে।'

বস্তুত হযরত উমর (রা) প্রথমে উদ্ধৃত নবী করীমের বাণীটুকুর ভিত্তিতেই এই কথা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)ও উহা হইতে এই অর্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনিও বলিয়াছেনঃ

اَلَاانَّ مَفَاتِيْحَ مَالِكُمْ مَعِىْ وَاَعْطُوا اَنَّهُ لَيْسَ لِىْ اَنْ اَخذَ مِنْهُ دِرْهَمَا دُوْنَكُمْ-

জানিয়া রাখ, তোমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ধনমালের চাবি আমার নিকট রক্ষিত। সেই সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখিও যে, উহা হইতে তোমাদিগকে বাদ দিয়া বা বঞ্চিত করিয়া একটি পয়সাও গ্রহণ করার আমার কোন অধিকার নাই।

বস্তুত ইসলামে যাবতীয় ধনমালের প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ এবং উহাতে যে সব মানুষেরই সমান অধিকার রহিয়াছে, তাহা এই সব সুস্পষ্ট বিপ্লবী ঘোষণা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। উপরন্তু ইহা যে কেবল মৌখিক ঘোষণাই ছিল না, ইহাই ছিল খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলের অর্থনৈতিক নীতি, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

## বায়তুলমাল হইতে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাহাতে মৌলিক প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তাহার অর্থ এই নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসাইয়া খাওয়াইতে থাকিবে। বরং লোকেরা সাধ্যনুযায়ী শ্রম করিবে, উপার্জন করিবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাহাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করিবে; তাহার পরও যদি কেহ তাহার মৌলিক

প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পরিপূরণের দায়িত্ব হইবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থনীতিতে ইহাই হইল নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এই অপূরনিত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এই কাজ করে না, মনে করিতে হইবে, সে এই দায়িত্ব পালন করিতেছে না। এ পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخُلَّهِمْ وَفَقْرِهِمْ اَحْتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخُلَّتِهِ وَفَقْرِهِ–

(ابو داؤد)

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানের দায়িত্বপূর্ণ কাজসমূহ আঞ্জাম দেওয়ার কর্তৃত্ব দিবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও সেই ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন হইতে বিরত থাকিবেন।

নবী করীম (স) অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ اِمَامٍ يَغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخُلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ اِلاَّ اَغْلَقَ اللّٰهُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خُلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ (ترمذى)

যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজেদের দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখে—অভাব পূরণ করে না, আল্লাহও তাহার জন্য আসমানের (রহমতের) দুয়ার বন্ধ করিয়া দেন।'

এই হাদীস দুইটি হইতে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, জন গণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন না করা হইলে আল্লাহর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এই কারণে খুলাফায়ে রাশেদুনের পরে হযরত আমীর মুয়াবীয়ার শাসনামলে এই কাজের প্রতি যখন উপক্ষো প্রদর্শন করা হইতেছিল, তখন তাঁহাকে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তিনি অনতিবিলম্বে এ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কাঠামোই যে জনকল্যাণমূলক, তাহা খিলাফতের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْخَلِيْفَةَ هُوَ الَّذِى يَقْضِىْ بِكِتَابَ اللّٰهِ وَلَيَشْفِقْ عَلَى الرَّعِيَةِ شَفْقَةَ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ–

(كتاب الاموال لابى عبيد ص ٦)

খলীফা—ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক—সে, যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং জনগণের প্রতি পিতার ন্যায় দরদ সহকারে স্নেহ ও দরদ প্রদর্শন করে।

সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলত ঃ জনগণের সেই কল্যাণ-কামনার অন্তর্ভুক্ত, যাহা ইসলামের দিক দিয়া রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হইয়াছে। যে রাষ্টনায়ক এই দায়িত্ব পালন করিবে না, তাহার পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

مَامِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَا بِنَصِيْحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّه- (بخارى)

যে লোককে আল্লাহ তা'আলা জনগণের শাসন-পরিচালক বানাইয়া দিবেন, সে যদি তাহাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করিতে পারিবে না।

## বায়তুলমাল ও খলীফাতুল মুসলিমীন

বায়তুলমাল যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তাহারই নির্দেশানুক্রমে পরিচালিত হয়; কিন্তু তবু ব্যাক্তিগতভাবে তাহার নিজস্ব কোন কর্তৃত্বই উহার উপর স্বীকৃত বা কার্যকর হইতে পারে না। কারণ ঃ

اِنَّ الْمَالَ كَانَ بِيَدِهٖ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيْعَةِ لِجَمَاعَةِ لِّمُسْلِمِيْنَ-

ধন-সম্পদ মুসলিম জনগণ ও নাগিরকদের জন্য খলীফার নিকট আমানত স্বরূপ।[১]

জাতীয় কোষাগারের উপর একজন বাদশাহ বা একজন ডিক্টেটরের যে স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্ব স্থাপিত থাকে এবং তাহারা যেভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ ব্যবহার করে, ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের উপর খলীফাতুল মুসলেমীনের অনুরূপ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। তদ্রূপ যথেচ্ছ ভোগ-ব্যবহার করার অধিকারও তাহার নাই। রাজতন্ত্র ও ডিক্টেটরবাদ এবং ইসলামের মধ্যে এখানে মূলগত ও নীতিগত পার্থক্য সুস্পষ্ট।

হযরত উমর ফারুক (রা) একদা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারেসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি বাদশা, না খলীফা?"

উত্তরে সালমান (রা) বলিয়াছিলেন, "ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতে একটি মুদ্রা বা তদপেক্ষাও কম পরিমাণ অর্থ আপনি যদি অপব্যয় বা অপচয় করেন, তবে আপনি বাদশাহ; অন্যথায় আপনি খলীফা।"-কথাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবনীয়।

১. তাবকাতে ইবনে সায়াদ, তৃতীয় খণ্ড।

## বায়তুল মাল হইতে বিনাসুদে ঋণ দান

ইসলামী অর্থনীতি একদিকে সুদ—সুদী কারবার ও সকল প্রকার সুদ-ভিত্তিক লেনদেন চিরতরে হারাম করিয়া দিয়াছে, অপরদিকে নাগিরকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে ঋণ দানেরও চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার কাজ প্রথমদিকে ব্যক্তিগতভাবেই সম্পন্ন হইত। সাহাবাগণ এমনকি স্বয়ং নবী করীম (স)-ও লোকদের নিকট হইতে প্রয়োজন অনুপাতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কুরআন মজীদে এজন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে ঃ

مَنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَتُضٰعِفَهُ لَهٗ– (البقره – ٢٤٥)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে সদভাবে ঋণ দিবে আল্লাহ তাহাকে উহার কয়েকগুণ বেশী প্রত্যার্পণ করিবেন।

বলাবাহুল্য, আল্লাহকে সদ্ভাবে ঋণ দেওয়ার অর্থ অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-পীড়িত লোকদিগকে বিনাসুদে ঋণ দান করা। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী বাজেটে বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার একটি খাত অবশ্যই থাকিবে। হযরত উমর (রা)-এর সময় বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার কাজ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের চাকুরীর জানামতে বায়তুলমাল হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত। বস্তুত ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠান।

ঋণ গ্রহণ লোকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য ব্যাপার। বর্তমান সময়ও লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজনে সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান—অনেক ব্যাংকও খোলা হইয়াছে সুদের বিনিময়ে ঋণ দানের ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সুদ মানুষেকে শোষণ করিয়া সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষের মন লোভাতুর পংকিল ও স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে। ইসলাম এই সুদকে চিরতরে হারাম করিয়া দিয়াছে। অতএব দেশবাসীকে প্রয়োজন অনুযায়ী বায়তুলমাল হইতে বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইসলামী বায়তুলমালের এক বিরাট অর্থনৈতিক কর্তব্য।

## উৎপাদনী ঋণ

জনগণকে নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যেমন বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার ব্যাবস্থা করিতে হইবে, অনুরূপভাবে উৎপাদনী কার্যে বিনিয়োগের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হইতে ঋণ দেওয়ার ব্যাবস্থা অপরিহার্য। এই ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ বা মুসলিম-অমুলিমের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বা কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। হিন্দ বিন্‌তে উৎবা হযরত উমর (রা)-এর নিকট হইতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য চার হাজার মুদ্রা জামিনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসরার শাসন কর্তা আবূ মূস আশায়ারী (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও উবাইদাহ ইবনে উমরকে ব্যবসায় করার জন্য প্রচুর অর্থ ঋণ বাবদ দিয়াছিলেন। কৃসক দিগকে ও কৃষিকার্যের উন্নতি বিধান, বীজ সংগ্রহ ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যোগাইবার জন্য বিনাসুদে ঋণ দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের কর্তব্য।

# ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক

বর্তমান সময় বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রয়োজনশীল লোকদিগকে সুদের বিনিময়ে ঋণদানের কাজ করিতেছে। সে ঋণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও পাওয়া যাইতেছে, আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্যও। এইরূপ ঋণদানে অভাবগ্রস্ত লোকদের আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট উপকার হইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং বিরাট বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা এই ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত মূলধনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং চলিতেছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই আপাতঃ উপকার ও ব্যবসায়-শিল্পের এই বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজকে এক বিরাট ভাঙন ও কঠিন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহার দরুন সমাজের মূল বুনিয়াদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শোষণ-পীড়নের প্রচন্ডতায় মানব সমাজের একাংশ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে, আর অপর অংশ—যাহাদের সংখ্যা শতকরা দশ জনেরও কম-হইয়া যাইতেছে পুঁজিপতি ও কোটিপতি। মানব সমাজেকে এই মারাত্মক বিপদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করার অন্যতম প্রধান উপায় হইল বিনাসুদে ঋণদানের ব্যবস্থা। বিনাসুদে ঋণদান কার্য বায়তুলমালের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইতে পারে। আর সে জন্য ব্যাংকও স্থাপন করা যাইতে পারে। বর্তমান ব্যাংক আধুনিক কালের ধন-বিনিময়ের এক উন্নততর ব্যবস্থা, সন্দেহ নাই। আর সত্য বলিতে কি, ব্যাংকের সাহায্য ভিন্ন অর্থনৈতিক লেন-দেন ও আদান-প্রদান বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু বর্তমান সময়ে আন্তজার্তিক ধন-বিনিময় তো ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সম্পন্নই হইতে পারে না। কাজেই ব্যাংক ব্যবস্থা চালু না রাখিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে বর্তমান নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থা কিছুতেই চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ সুদ হইল বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থার ভিত্তি, আর এই সুদ ইসলামী ব্যবস্থায় চিরতরে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইসলামী সমাজে সুদহীন ব্যাংকই স্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু সুদ ছাড়াও কি ব্যাংক চলিতে পারে ? সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিলে ব্যাংক কে মূলধন দিবে কে? বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদন—যাহা ব্যতীত জাতীয় উন্নতির কল্পনাও করা যায় না—কিরূপে সম্ভব হইবে? উপরন্ত, বর্তমান সময়ে ব্যাংক হইতে সমাজ যে ব্যাপক কল্যাণ লাভ করিতেছে, সুদ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে অনুরূপ সুবিধা ও কল্যাণ লাভের আর কি পন্থা হইতে পারে?...... আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মনে সাধারণভাবে এই জিজ্ঞাসা প্রচন্ড হইয়া দেখা দিয়াছে। তাহাদের জ্ঞান মতে সুদ ছাড়া ব্যাংক আদৌ চলিতে পারে না, আর ব্যংক ভিন্ন অর্থনৈতিক লেনদেন বর্তমান যেহেতু অসম্ভব, তাই ইসলামী অর্থনীতিও এ যুগে অচল।

কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সুদ ভিন্ন ব্যাংক চলা এবং তাহা হইতে বর্তমানের ন্যায় সকল কল্যাণ লাভ করা—আর সঙ্গে সঙ্গে সুদভিত্তিক অর্থনৈতির সকল ধ্বংসকারিতা হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা – কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এখানে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক ও সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে ব্যাংক ব্যবস্থা এবং উহার কাজ ও কর্ম-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ আবশ্যক।

## আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ

ব্যাংক আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশেষ অবদান। আর সত্য কথা এই যে, ব্যাংকের বর্তমান রূপ ও সংগঠন পুঁজিবাদীদের শোষণ-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ার। ব্যাংকে সাধারণত দুই প্রকারের পুঁজি সংগৃহীত হইয়া থাকে, প্রথমত, অংশীদারদের দেওয়া পুঁজি এবং দ্বিতীয়ত, ধনীদের আমানতস্বরূপ প্রদত্ত টাকা। আমানতস্বরূপ রক্ষিত টাকা তিন প্রকার । প্রথম, যাহা চাওয়া মাত্রই ফিরাইয়া পাওয়া যায়, যাহাকে বলা হয় curremt deposit! দ্বিতীয়, যাহা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের নিকট অর্পণ করা হয়; ইহাকে বলা হয় Fixed Deposit এবং তৃতীয় হইতেছে Savint deposit; সপ্তাহে একবার ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ-ফরাইয়া লওয়া যায়।[১] ব্যাংক সংগৃহীত পুঁজির একাংশ নিজের নিকট সংরক্ষিত পুঁজি (Reserved capita) হিসাবে সব সময়ের জন্য জমা রাখিয়া দেয়। উহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন ইহা হইতেই পূর্ণ করা হয়। ইহার পর কিছু পরিমাণ পুঁজি বাজারে (money marke) ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। এই পুঁজিও নগদ রিজার্ভ টাকার ন্যায় সকল সময়ই আদায়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য (liquid) হইয়া থাকে। এই পুঁজিতে শতকরা ২ এর ১ হইতে এক টাকা পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। ব্যাংক পুঁজির একাংশ হুন্ডীর কারবারে এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করা হয়। এই পুঁজি ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরাইয়া পাওয়ার যোগ্য বলিয়া ইহাতেও সুদের পরিমাণ খুবই সামান্য। অতঃপর ব্যাংক-পুঁজির একটি বিরাট অংশ এমন সব কাজ লগ্নি করা হয় যাহাতে পুজির নিরাপত্তা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত হওয়া চলে। প্রয়োজন হইলে তাহা বিক্রয় করিয়াও মূল পুঁজি উদ্ধার কর্‌া যাইতে পারে। এইরূপ অর্থ বিনিয়োগে শতকরা ২—৪ টাকা সুদও পাওয়া যায়। সরকারী সিকিউরিটি এবং কোম্পানীর অংশ ও ড়িবেঞ্চারস (Dedentures) ইত্যাদি এই শ্রেণীতেই পড়ে। নগদ রিজার্ভ পুঁজির পর ব্যাংক এই সব ক্ষেত্রেও পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকে। কারণ ব্যাংকের আত্মরক্ষা ও স্থিতিস্থাপনের জন্য ইহা অপরিহার্য। ইহার ফলেই ব্যাংকের মেরুদন্ড অধিকতর দৃঢ় হয়, বিপদের সময় ইহা উহার পৃষ্টপোষক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

১. ধন-সম্পদ আমানতস্বরূপ গ্রহণকারী ঋণ ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় ব্যাংক। হোরেস হোয়াইট (Horac White) তাঁহার Money and Banking গ্রন্থে লিখিয়াছেন-Bonk a manufacturer of credit and a machine for facilitating Exchange-ব্যাংক হইল মূলধন সংগ্রহকারী ও বিনিময় সুবিধার মাধ্যম।

ব্যাংকপুঁজির সর্বপ্রধান অংশ নিয়োগ করা হয় কারবারী ও ব্যবসায়ী লোকদিগকে এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত ঋণ বাবদ। বস্তুত ব্যাংকের আমদানীর সর্বপ্রধান উপায় ইহাই। এই ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষ উচ্চহারে সুদ লাভ হইয়া থাকে । এই জন্য প্রত্যেকটি ব্যাংকই স্বীয় পুজির সর্বপ্রধান অংশ ব্যবসায়- সংক্রান্ত কাজ কারবারে বিনিয়োগ করিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক ব্যাংকই সাধারণত শতকার ৩০ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজি এই কাজেই বিনিয়োগ করিয়া থাকে।

মোট কথা, ব্যাংক আমানতদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং নিজেদের লগ্নিকৃত পুঁজি যতভাবেই বিনিয়োগ ও ব্যয় করে, তাহা সবই সুদের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। বস্তুত এই সুদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় সমাজের জনগণের নিকট হইতেই আদায় করা হয় একং তাহাদের শ্রমার্জিত অর্থ সুদ বাবদ শোষিত হইয়া (জাতীয় সম্পদ) মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির নিকট পুঞ্জীভূত হয়। আমানতকারীগণ সুদ-বাবদ যাহা পায় তাহা ঋণ-বাবদ লগ্নিকৃত অর্থের নির্দিষ্ট হারে আদায়ীকৃত সুদেরই অংশ মাত্র। ঋণ গ্রহণকারীদের নিকট হইতে ব্যাংক উচ্চহারে সুদ আদায় করে এবং আমানতকারীদিগকে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদ দয়। এইভাবে ব্যাংকের ভাগের সুদের অবশিষ্ট অংশ হইতে ব্যাংকের যাবতীয় খরচপত্র নির্বাহ করা হয় এবং তাহার পরও যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই ব্যাংক ব্যবসায়ের মূল অংশীদারদের মধ্যে ঠিক সেই নিয়মেই বন্টন করা হয়, যেমন অংশীদার-ভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের লভ্যাংশ বন্টন করা হয় উহার অংশীদারদের মধ্যে।

বস্তুত ব্যাংক ছোট-বড় যত কাজই করে, সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানোই হইল উহার আসল ও প্রধান কাজ। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসায় করে না, ব্যবসায়ীদের জন্য সুদের বিনিময়ে পুজি যোগাড় করাই উহার দায়িত্ব। ব্যাংক নিজে কোন কারভানা খোলে না, বরং শিল্পোৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপনকারী লোকদের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ আদায় করা উহার কাজ।

এক্সচেঞ্জ ব্যাংকসমূহ সাধাণত বৈদেশিক পণ্য বা পুঁজি বিনিময়ের কাজ করিয়া থাকে। বাংলাদেশের কোন ব্যবসায়ী আমেরিকা হইতে কোন পণ্য ক্রয় ও আমদনী করিতে চাহিলে কিংবা অন্য কোন কারণে মূলধন বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই ব্যাংকের আশ্রয় লইতে হয়। এক্সচেঞ্জ ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় (কিংবা ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিভাগে) টাকা জমা দিলেই উহার মার্কিন মূল্যমান অনুযায় নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা উহার আমেরিকাস্থ শাখা কিংবা Corespondent Blance এর মারফতে পণ্য বিক্রয়কারী ফার্মে আদায় করা হয়। এই রূপ এক্সচেঞ্জের কাজ করিয়া ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন লাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হুন্ডীর বিনিময়ে এল. সি. খোলার মাধ্যমেও সুদ লইয়া থাকে।

এ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা এই যে, ব্যাংকের এই সমস্ত কাজে সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষেরই অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই

কল্যাণকর—আধুনিক যুগের এই অপরিহার্য—প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত যে কারণে কলুষিত ও সমষ্টিগতভাবে মানবসমাজের জন্য মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা হইল সুদ। এই সুদ বন্ধ করিয়া দিলেই এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও গোটা মানবতার পক্ষে প্রকৃতভাবে কল্যাণকর হইতে পারে।

## আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার মারাত্মক দোষ

পূর্বেই বলিয়াছি প্রথমত বর্তমান যুগে সুসভ্য মানব-সমাজের জন্য ব্যাংক যেন একটি আত্যাবশকীয় ব্যবস্থা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকক বড় বড় অর্থনৈতিক কাজই এমন রহিয়াছে, যাহা একমাত্র ব্যাংকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। আর ব্যাংক না হইলে তাহা সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যাংকের সাহায্যে আনেক 'এজেন্সী সার্ভিস'ও সুস্পন্ন হইয়া থাকে। সমাজের অসংখ্য লোকের হাতে কম ও বেশী পরিমাণের যে পুজি বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এই ব্যাংকের মারফতেই একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বলিয়াছি,এই সব অসংখ্য কল্যাণকর কাজ সম্পন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ইহাই মানবতার মারাত্মক ক্ষতি করিতেছে শুধু সুদ প্রথার কারণে।[১]

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকের মারফতে অসংখ্য হাতে বিক্ষিপ্ত পুঁজি এককেন্দ্রিক হইয়া তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে। ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ব্যাংক পরিচালকরা এই পুঁজি জাতীয় স্বার্থের বিপরীত কাজে—দেশবাসীর নিকট অবশিষ্ট ধন-সম্পদ নিঃশেষে লুটিয়া লইবার জন্য—ব্যবহার করে। সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যাবস্থা যে সমাজে স্থাপিত হয়, তথায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত না হইয়া পারে না। কারণ, পুঁজিবাদি সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুজির হাতেই কুক্ষিগত হয়। আর মুষ্টিমেয় ধনিকরাই হয় সেখানে সকল পুজির একচ্ছত্র মালিক।

এই ব্যাংকে অসংখ্য লোক টাকা জমা দেয় এ কথা ঠিক; কিন্তু জমা দেওয়া পর এই টাকার সহিত প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকিতে পারে না। তাহাদের দেওয়া মূলধন কোন ধরনের কাজে বিনিয়োগকৃত হইতেছে বা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে দেশের কল্যাণ করা হইতেছে, কি অকল্যাণ;সে সম্পর্কে তাহাদের কিছুই বলিবার থাকে না। প্রতিশ্রুতি হারে প্রতি বৎসর সূদ আদায় করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। ফলে তাহাদের মূলধন প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের একবিন্দু কৌতূহল বা দরদ থাকিবার কথা নয়। উহার লাভ লোকসান, উন্নতি-অবনতি কিংবা ভাল-মন্দের সহিত তাহাদের কোন নিকট সম্পর্কে আছে বলিয়া

১. অর্থনীতি বিশারদ লর্ড কীনস্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থ বন্টনের অসমতা এবং পরিপূর্ণ কর্ম বিনিয়োগের (Full employment) পথে বাধার মূল বারণ হইতেছে এই সুদ প্রথা। কোননা ইহার দরুন মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হইয়া পড়ে। এই কারণে সুদের হার কমসে কম করা আবশ্যক। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন সংগ্রহ ব্যবস্থা সুষ্ঠু হইলে সুদ সম্পূর্ণ রূপে খতম করা খুবই সম্ভব। (The general theory of employment, interest and money)

তাহারা মনে করে না। কেননা তাহাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ হইলেও তাহাদের অধিক হারে সুদ লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ নির্দিষ্ট হারের সুদই তাহাদের চূড়ান্ত মুনাফা। পক্ষান্তরে তাহাতে বিরাট কোন ক্ষতি হইলেও তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না, যেহেতু তাহাদের নির্দিষ্ট সুদ সম্পর্কে পূর্বেই পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হইয়াছে। বস্তুত যে সমাজে ব্যাষ্টির কল্যাণে সামগ্রিক কল্যাণ হয় বলিয়া মনে করা হয় না, কিংবা সমষ্টির বিপর্যয়ে ব্যাষ্টিরও বিপর্যয় সংঘটিত হয় না, সে সমাজ কখনই মানুষের উপযোগী সমাজ হইতে পারে না। এহেন পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত না হইয়া পারে না। এইরূপ মনোভাবে জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং সমাজের টাকা দ্বারাই সমাজের লোকদিগকে স্পর্ধার সহিত শোষণ করা হয়।

বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, ইহার ফলে পণ্যদ্রবের মূল্য অত্যধিক উর্ধগতি ধারণ করে। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষ অনেক অলাভজনক কাজে মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহ পায়। শৈল্পিক কারবারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইলে ব্যাংক দুই হাতে ঋণ দিতে শুরু করে, নানাবিধ শিল্পোৎপাদনের কাজে অধিক সাহায্য দান করে। ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ব্যাংকও সুদের হার অত্যন্ত চড়া করিয়া দেয়। কারণ, পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সময় অধিক পরিমাণ সুদ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যবসায়িক উন্নতির আশায় শিল্পপতি ও কারখানা মালিকগণ সুদের চড়া হারেও ঋণ লইতে প্রস্তুত হয়। ব্যাংক যখন অধিক ঋণ ইস্যু করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তখন তাহা ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করে। ফলে বিলিকৃত ঋণ ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং নূতন করিয়া আর ঋণ দেওয়া হয় না। শিল্পের আর্থিক বুনিয়াদ যতই দৃঢ় এবং উহার যতই সুনাম হউক না কেন, সহসা ঋণ শোধ করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। তখন মূলধন স্বল্পায়তন ও হ্রাস করার একটা Depression ধারা চলিতে থাকে। ছাঁটাই ও উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস করার ফলে বেকার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিদারুন মন্দা দেখা দেয়।

বস্তুত ব্যাংকের নিকট শিল্পের স্বর্থ অপেক্ষা নিজের লাভ-লোকসানের স্বার্থটাই অধিক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মূল শিল্পে ব্যাংকের কোনই অংশ নাই, ব্যাংক ঋণদাতা মাত্র। কাজেই শিল্পের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে উহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা কৌতুহল থাকার কথা নয়। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার এই মূলীভূত দোষ বর্তমানে খুব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে।

এইজন্য শিল্প-ব্যবসায়ে অগ্রসর ও উন্নত দেশসমূহ শিল্প ও ব্যবসায়ের পারস্পরিক নিবিড় যোগাযোগ ও নিকট সম্পর্কে স্থাপনের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। কারণ, তাহা না হইলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানকালে সুদভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থায় ব্যাংকের সহিত উক্তরূপ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইতে পারে না। অবশ্য ব্যাংক যেখানে কেবল ঋণ দানেরই কাজ করিবে না; বরং উহার মূল ব্যবসায়ের অংশীদারও হইবে, একমাত্র সেখানেই এবং এইভাবেই ব্যবসায়ের সহিত ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইতে পারে।

## ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী অর্থনীতি আধুনিক ব্যাংকের মূল ভিত্তিকেই চূর্ণ করিয়া উহাকে নূতনভাবে গঠন করার নির্দেশ দেয়। ইসলামী সমাজে ব্যাংককে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির একচেটিয়া কতৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত করা হইবে। এইজন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল বিনা সুদের ব্যাংক -ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

ব্যাংক কারবারের মূল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই প্রাচীন গ্রীক সমাজে যখন ব্যাংক একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করিয়াছিল, তখন টাকা লগ্নি করিয়া উহারই বিনিময়ে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। রোমান সমাজে শুরুতে ইহা নিষিদবধ থাকিলেও পরে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদ ও অন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সুদ গ্রহণ শুরু হয়। খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদীরাই এই নিষেধ প্রকাশ্যভাবে সামান্য করে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিকরা যতদিন শাসন কার্য চালাইয়াছে, ততদিন তাহারা সুদের কারবার চলিতে দেয় নাই। দুনিয়ায় ইহুদীরাই এই সুদী কারবারের প্রবর্তক। উত্তরকালে গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাই সুদের ভিত্তিতে চলিতে থাকে। ইসলাম এই সুদী কারবারকে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। বিশ্বনবীর আদর্শে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদী কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে অনুরূপ সমাজ গঠন ও সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েম করাই মানবতার শোষণ মুক্তির একমাত্র পথ।

সুদ ছাড়াও কি ব্যাংক চলিতে পারে? এ প্রশ্নের জওয়াবে আমাদের পাল্টা প্রশ্ন এই যে, সুদের ভিত্তিতে যখন ব্যাংক চলিতে পারিতেছে, তখন সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলিতে পারিবে না কেন? সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলিতে পারে ইহাই যুক্তিসংগত কথা। সুদই ব্যাংক চালায় এবং সুদ বন্ধ করিলে ব্যাংকও অচল হইয়া পড়িবে—যুক্তির বিচারে এই কথা অচল ও অগ্রহণযোগ্য।

ইসলামী ব্যাংকে জনগণের টাকা আমানতস্বরূপ রাখা হইবে; কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র সুদ দেওয়া বা লওয়া হইবে না। আমানতদারদের অনুমতিক্রমে তাহার টাকা কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা ইহলে ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ সে নিশ্চয়ই পাইতে পরিবে, অন্যথায় তাহা শুধু আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হইবে। উপরন্তু প্রতিবৎসর তাহা হইতে অনিবার্যরূপে যাকাত আদায় করা হইবে। ব্যাংকের খরচ বাবদ কিছু কমিশনও উক্ত টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

সুদপ্রথা রহিত হইলে দেশের শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন কোথায় পাওয়া যাইবে, সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহা একাটি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামী সমাজে এই উদ্দেশ্যে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কোনই হেতু নাই। কারণ সেখানে যখনিই কোন শিল্প কারখানা বা লাভজনক বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলিবার প্রয়োজন ইহবে, তখনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণ পরিকল্পনা ও এষ্টিমেট ব্যাংকের নিকট

পেশ করা হইবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পনাটি গভীরভাবে পরীক্ষা করাইয়া দেখিবে। পরীক্ষা ও সর্বোতভাবে যাচাই করিয়া দেখার পর ইহা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হইলে ব্যাংকের পক্ষ হইতে দেশের মুলদধন মালিকদের নিকট সাধারণ ভাবে উহা পেশ করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের জন্য আবেদন করা হইবে। তখন দেশের মূলদন মালিকগণ অর্থবিনিয়োগের একটি নির্ভরযোগ সুযোগ মনে কারিয়াই সে সম্পর্কে উৎসাহ ন হইয়া পারিবে না। অন্যথায় প্রত্যেকের নিকট পুঞ্জিকৃত অর্থ বেকার বসিয়া থাকিবে এবং প্রতি বৎসর যাকাত আদায় কারিয়া তাহার মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হইবে। অতএব, ব্যাংকের এই আবেদনে প্রচুর পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হওয়ার নির্ভরযোগ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহ যত পরিমাণ মূলধনসংগ্রহ করিতে পারে, তখন ইহার পরিমাণ কিছুমাত্র কম হইবার কারণ নাই। উপরন্তু ইসলামী ভাবধারায় পরিশুদ্ধ সমাজের নির্মল পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে ধন-সম্পদ নিজের নিকট পুঞ্জিভূত করিয়া রাখিতে উদ্বুদ্ধ করিবে না। উহাকে অধিক বিক্ষিপ্ত এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে বিনিযোগ করাতেই জনগণ অধিক উৎসাহ পাইবে।

শুধু তাহাই নয়, উপরোক্ত পন্থায় সংগ্রহীত মুলধন দ্বারা যে শিল্প-করাখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে, ব্যক্তিতভাবে কোন লোক বা কোন ব্যাংক উহার মালিক হইবে না, উহার মালিক হইবে মূলধনদাতা পুঁজিমালিকগণ। উহার লাভক্ষতি, ভালমন্দ, সুনাম ও দুর্ণামের সহিত প্রত্যেক অংশীদারের নিবিড় যোগাযোগ থাকিবে বলিয়াা এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি লোকেই সচেতন থাকিবে। এই উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কারখানায় উৎপাদন বিন্দুমাত্র নিকৃষ্ট হইলে তখনি উহার প্রতিবিধান ও সংশোধন করিতে প্রত্যেক অংশীদারই চেষ্ট হইবে, কারখানার পরিচালকদিগকে সতর্ক করিয়া উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদনের নির্দেশ দিতে একটুও বিলমব করিবে না। কারণ কারখানায় উৎপান্ন পণ্যের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হওয়ার সহিত তাহার স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইসলামী সমাজের শিল্পকারখানাসমূহ বিপুল সংখ্যক লোকের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে ততোধিক পুঁজিবাদী ব্যাংকের কোন কাজের প্রতিই নাগরিকদের কিছুমাত্র সহনুভূতি থাকিতে পারে না। কারণ আমানতদাতাগণ নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রুত পরিমাণ সুদ লাভ করিবেই; জাতীয় অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কোন লাভ-ক্ষতি নাই। বস্তুত এইরূপ সমাজে মানবতা কোন নিরাপত্তা ও কণ্যাণ লাভ করিতে পারে না। এখানে কাহারো প্রতি কোনই সহনুভূতি বা দরদ নাই। ইসলামী সমাজে এইরূপ ভাবধারা মুহূর্তের তরেও বরদাশত করা যায় না। বরং সেখানে সামগ্রিক সহৃদয়তা শুভেচ্ছা ও উন্নতি লাভের ব্যাপারে ব্যক্তিগভাবে প্রত্যেকের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা বর্তমান থাকার দরুন জাতীয় অর্থনীতির অব্যাহতভাবে উৎকর্ষ লাভি সম্ভব হইবে।

এতদ্ব্যতীত ইসলামী সমাজে ব্যাংকে মূল শিল্প-ব্যবসায়ের পুজি বিনিয়োগকারী অংশীদারও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্যাংক মূলধনের সুদ পাইবে না, পাইবে মুনাফার

নির্দিষ্ট অংশ। অতএব উহাকে লোকসানেরও ভাগীদার হইতে হইবে। বস্তুত বর্তমান যুগে মূলধন ও মূল শিল্পের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধনের ইহাই একমাত্র উপায়। ইহার ফলে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন মূলধনের অভাব হইবে না, অনুরূপভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার দরুন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত শিল্প ও মূলধনের এইরূপ সমন্বয় সাধন এক মাত্র ইসলামী সমাজ ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্ভব নহে।

এখানে আর একটি কথাও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে usury ও interest এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। যদিও কেহ কেহ মনে করে যে, কুরআন হাদীসে যে 'রিবা' হারাম করা হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া, ঋণের বিনিময়ে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থই বুঝায়। কিন্তু ব্যবসায়ী কাজে লগ্নিকৃত টাকার নির্দিষ্ট হারের মুনাফা interest গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে।

কিন্তু এইরূপ ধারণা কুরআন হাদীসের সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কুরআন মজীদে যে সুদ হারাম করা হইয়াছে তাহা যত রকমেরই হউক না কেন এবং উহা লাভ করার জন্য যে পন্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন, সবই সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিশেষত যে সময় 'রিবা' নিষেধের আয়াত নাযিল হইয়াছিল সে সময়কার আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ লওয়া হইত, অনুরূপভাবে ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সুদ গ্রহণের রীতি ছিল। এই উভয় প্রকার সুদকে তখন আরবী ভাষায় 'রিবা"-ই বলা হইতে। আর কুরআন মজীদে এই 'রিবা'কেই হারাম করা হইয়াছে।

বস্তুত এই উভয় প্রকারের সুদে মূলগতভাবে কোনই পার্থক্য নাই। বরং বলা যায়, ইহা এ-ই জিনিসের দুইটি দিক। আর এই দুইটি দিকই ইসলামে চিরতের হারাম।

আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুদ উদ্বৃত্তের উপর প্রভাবশালী হয় না, মূলধন বিনিয়োগের হারই কার্যত উদ্বৃত্তের হারকে প্রভাবিত করে। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু মূলধন বিনিয়োগকে শুধু যে নিষিদ্ধ করা হয় নাই তাহাই নয়, সেজন্য বলিষ্ঠভাবে উৎসাহও প্রদান করা হইয়াছে। পুঞ্জিকৃত অর্থকে ব্যবসায়ের মূলধনরূপে বিনিয়োগের জন্য যাকাত ব্যবস্থা একটা বড় কার্যকারণ। উপরন্তু ইসলাম মুনাফা লাভের ও মুনাফায় অংশীদারিত্ব (Sleeping Partnerships) তথা লাভ-লোকসানে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ কারার অনুমতি দেয় বলিয়া এই কাজে শরীক হইতে ইসলামী আদর্শবাদী মানুষ অতি সহজেই অগ্রসর হইয়া আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

ইসলামি এই ব্যাংক-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। সুদমুক্ত এই ব্যাংক ব্যবস্থা 'মুজারিবাত' নীতিতে এই ধরনের আরো বহু প্রতিষ্ঠান কায়েম করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্যকারী হইবে। ইহাতে শ্রম ও মূলধন পরস্পরের সহিত মুনাফার অংশীদার হিসাবে মিলিত হইবে। বস্তুত শ্রম ও মূলধনে স্থায়ী

সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপারটিকে নৈতিক আদর্শ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে স্থাপিত ও পরিচালিত করা সম্ভব হইবে। উভয় পক্ষের নৈতিক দায়িত্বকে উভয়ের ঈমানের অংশরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ফলে মুজারিবাতের নীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন ইউনিটের শরীকদারীতে সকল প্রকার কৃষি ব্যবসায় ও শিল্পসংক্রান্ত কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়ে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে মূলধনের ব্যবস্থা হওয়া Financing দরকার। কৃষিশিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক স্বল্পমেয়াদের জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে। ব্যাংকের কারবারে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার কারণে অনেক সময় ব্যাংক দেউলিয়াও হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে দীর্ঘ মেয়াদী কারবারের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইসলামী ব্যাংক শিল্প, মূলধন কিংবা যন্ত্রপাতি সংগ্রহে ঋণ দেওয়ার জন্য 'সিকিউরিটি' সংগ্রহের ব্যবস্থাও করিতে পারে। এই সিকিউরিটি মুসলিম দেশগুলিতে পুঁজি সংগ্রহের জন্যও অতি উত্তম ভিত্তি হইতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়েজন পূরণের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দানের ব্যবস্থা হওয়া একান্তই জরুরী, ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধরনের ঋণ সরকারী ক্রেডিট এজেন্সী কিংবা নাগরিকদের দ্বারা গঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন কোন সম্পত্তির উপর দলীল করিয়া অতি সহজেই দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে।

মুলধন সংগ্রহ— পুঁজিগঠন এবং এই পুঁজিকে উৎপাদনী ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী-উদ্যোগকারী (Enterpreneur) দের সহিত ব্যাংকের সম্পর্ক কি হইবে? এ পর্যায়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম অবস্থায় ব্যাংক হইবে 'অপারেটর' কিংবা বিজিনেস ম্যানেজার এবং পুঁজি সংগ্রহকারীরা হইবে মূলধন মালিক। আর শেষ অবস্থায় ব্যাংক হইবে মূলধন মালিক ও বিনিয়োগকারীদের অপারেটর। এই পর্যায়ে মূলধন মালিকদের অধিকার ও অপারেটরের কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ প্রচলিত ইনসাফমূলক রীতিনীতির ভিত্তিতে শর্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী যে মুনাফা লাভ করিবে, ব্যাংক মূলধন সঞ্চয়কারী হিসাবে স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী উহাতে অংশীদার হইবে।

ব্যাংক ও ব্যাবসায়ীদের একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নাই। মিসরে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবসায় বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বিশেষ সাফল্য সহকারে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা ক্রমশঃ বিকাশ ও অগ্রগতি লাভ করিতেছে। ইহা এই পর্যায়ে উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ। করাচীতেও এই ধরনের একটি সুদবিহীন তথা মুনাফা ভিত্তিক ব্যাংক কায়েম করা হইয়াছিল; কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী অসহযোগিতার দরুনই শেষ পর্যন্ত তাহা অচল হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।[১]

১. বর্তমান বাংলাদেশেও উহার সূচনা হইয়াছে বটে, তবে উহা সম্পূর্ণ জায়েয ও সুদমুক্তভাবে চলিতে পারিতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার ব্যাপার।

বস্তুত ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া ইহা হইবে সুদবিহীন ব্যাংক। সুদব্যবস্থা না থাকিলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না, এমন কথা বলারও কোন যুক্তি নাই। সুদ ব্যবস্থার দরুনই বরং মুলধন সংগ্রহের কাজ মন্থর গতিতে চলে ও মারাত্মক ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়। ইহারই দরুন সমাজে ও দেশে ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দেয়, এবং অর্থ-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম ও মারাত্মক ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়। ইহারই দরুন সমাজে ও দেশে ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দেয়, এবং অর্থ-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম না-ইনসাফী ও আকাশছোয়া বৈষম্য দেখা দেয়, এবং অর্থ-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম না-ইনসাফী ও আকাশছোয়া বৈষম্য দেখা দেওয়া ইহার কারণেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কারণ, খাজনা উসুল, বিল আদায় ও আমদানী-রফতানীর কাজে সাহায্য করা ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক ব্যাংক বর্হিভূত (Extra-Banking) বহু কাজও আঞ্জাম দিতে পারে, যাহার ফলে দেশে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নতি লাভের সুযোগ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্যাংক উহার মুনাফার একটা অংশ (যেমন শতকরা ৫টাকা) জাতীয় শিক্ষা কিংবা সাধারণ জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কাজে বিনিয়োগ করিতে পারে। এই ধরনের বিনিয়োগ হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহসাই কোন সুফল হয়ত লক্ষ্য করা যাইবে না; কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক উৎকর্ষতার উপর এই কাজের সুস্পষ্ট প্রভাব অবশ্যই প্রতিফলিত হইবে। অতএব সামাজিক সামষ্টিক দৃষ্টিতে এই কাজের যে যথেষ্ট মুল্য ও গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মুদ্রা তৈরী, মূলধন সংগ্রহ ও সুদ বর্জন ছাড়াও সেই সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিত, যাহা আধুনিক কালের কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (central or state Bank) সম্পন্ন করিয়া থাকে। বর্তমান দুনিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বায়তুলমাল কায়েমের মাধ্যমে যাবতীয় কর্তব্য ও তৎপরতাকে সমন্বিত করা যাইতে পারে। এবং এই ব্যাংক সকল প্রকার সুদী কারবারকে অতি সহজেই এড়াইয়া চলিতে পারে। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উদ্যোগী হইলে মুসলিম জাহান হইতে কেবল যে সুদপ্রথাকে চিরতরে উৎপাটিত করা যাইবে তাহাই নয়, উহা দ্বারা মুসলিম তথা সাধারণ জনমানুষের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট ভিত্তি রহিয়াছে।[১]

## বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক পুঁজি-বিনিময়ের কাজও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে। এইজন্য উহাকে হয়ত এমন এক মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার ফলে উহার মুদ্রা

১. ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

সরাসরিভাবে সকল দেশেই—বিশেষ করিয়া শিল্পপ্রধান দেশসমূহের—অভাধে চলিতে পারিবে। এইরূপ নীতি অবলম্বন একান্তই অসম্ভব হইলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও শিল্পপ্রধান দেশে (প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সঙ্গে) ইসলামী ব্যাংকের একটি ক্ষুদ্রায়তন শাখা খুলিয়া দিবে। এই ব্যাংক ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রকার বৈদেশিক প্রয়োজন পূর্ণ করিবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন ব্যবসায়ী ফার্ম বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করিতে চাহিলে সে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পণ্যমূল্য আদায় করিবে। ব্যাংক নির্দিষ্ট দেশের শাখা ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ফার্মে উক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেওয়ার নির্দেশ পাঠাইবে। কিন্তু এইজন্য কোন প্রকার সুদ গ্রহণ করিতে পারিবে না; যদিও খরচ বাবদ নির্দিষ্ট কমিশন আদায় করা ব্যাংকের পক্ষে অসংগত হইবে না।

সর্বোপরি বিবেচ্য বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে কোন দেশের অভ্যন্তরেও যদি সুদবিহীন ব্যাংক একবার স্থাপিত এবং সঠিক কাজ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার অনস্বীকার্য নৈতিক প্রভাব স্থাপিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখন আন্তর্জাতিক বিনিময় কার্যও বিনাসুদে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

# ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা

আমরা এখানে একটি ইসলামী ব্যাংক গঠন ও সেজন্য কাজ শুরু করার বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। প্রসংগত একটা চালু ব্যাংকের কার্যদ্বারা কি হইবে এবং ইসলামী আদর্শের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উহা কিভাবে আধুনিক ব্যাংকের সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে, তাহাও বিশ্লেষন করিতে চেষ্টিতে হইব।

বস্তুত ঈমানদার মুসলমানরা যখন জানিতে পারে যে, Interest এবং usury উভয়টিই ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম, তখন তাহাদের মনে এই প্রশ্ন তীব্র হইয়া জাগিয়া উটে যে, ইহা ছাড়া এ যুগে ব্যাংক চলিতে পারে কিভাবে? তখন তাহারা এই দুইটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক সংগীত ও চালু করা যায় কিনা তাহা চিন্তা করিতে শুরু করিতে পারে। তখন তাহারা মুনাফা ও শরীকদারীর ভিত্তিতে ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যে একটি promoters company গঠন করিয়া অংশীদার হইতে ইচ্ছুক লোকদের প্রতি share capital সংগ্রহ করিবার আবেদন প্রচার করিতে পারে।

পরে জনগণের নিকট হইতে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে যেসব subscription পাওয়া যাইবে। তাহাতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা share certificate দিয়া দিবে। ফলে ইহারা প্রত্যেকেই মূল ব্যাংক ব্যবসায়ের অংশীদার রূপে গণ্য হইবে। এই অংশীদাররা নিজেদের একটি অধিবেশনে বোঁড অব ডাইরেকটরস (Board of directors ) নির্বাচন করিবে এবং এই ডাইরেকটরস বোর্ড ব্যাংকের কর্মচারী নিয়োগ করিবে। ডাইরেকটরস্ বোর্ড ব্যাংক পরিচালনার নীতি (policy) নির্ধারণ করিবে এবং দায়িত্বশীল কর্মচারীরা সেই নীতি অনুযায়ী ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিবে।

বর্তমান সময়ে ব্যাংকের অংশীদাররা নির্দিষ্ট হারে dividend পাইয়া থাকে, কোন কোন ব্যাংক আবার অংশীদারদের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের হিসাবান্তে অর্জিত মুনাফা (profit) বন্টন করিয়া থাকে। ইসলাম যেহেতু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবসায় ও মূলধন বিনিয়োগ সমর্থন করে, তাই প্রস্তাবিত ব্যাংকে অংশীদাররাও একটির আর্থিক বছর শেষান্তে নিজ নিজ অংশের মুকাবিলায় আনুপাতিক dividends পাইতে পারে।

## ব্যাংকে অর্থ জমাকারীদের অবস্থা

এইভাবে ব্যাংক কাজ শুরু করিয়া দিলে জনগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা ইহাতে জমা দিতে শুরু করিবে। ব্যাংক এমন সব জমাও গ্রহণ করিবে যাহা পূর্ব অবগতি ব্যতীতই

ফেরত চাওয়া চাইবে। এই জমাকে পরিভাষায় বলা হয় demand deposists। এই টাকা ব্যাংকে রাখা হয় শুধু সংরক্ষণ ও হেফাজত লাভের উদ্দেশ্যে । ব্যাংক তাহাদের নামে হিসাব খুলিয়া দিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী লেন-দেন করিবে। এইরূপ জমায় ব্যাংক জমাকরীদের নিকট হইতে service charge আদায় করিতে পারিবে।

ব্যাংকে কেবল এই ধরনের টাকাই জমা করা হয় না; সেই সঙ্গে এমন বহু টাকাও জমা করা হয় যাহা দীর্ঘ মেয়াদী এবং কোনরূপ পূর্ব অবগতি ব্যতীত কখনও ফেরত চাওয়া হয় না; এইরূপ টাকার পরিমাণই বেশী হইয়া থাকে।। তখন ব্যাংক এই টাকা cerified deposits হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে deposit certificates ইস্যু করিবে। এইসব সার্টিফিকেট তিন মাস হইতে ১২ মাসের জন্য ইস্যু করা যাইতে পারে। এই জমাকারীরা কোন service charge দিবে না। বরং তাহারা ব্যাংকের আর্থিক বৎসরান্তে আনুপাতিক মুনাফা লাভ করিতে পারিবে। ইহাও dividends রূপে দেওয়া যাইবে।

## বিনিয়োগকারীদের অবস্থা

ইসলামী ব্যাংক মূলধন সংগ্রহের জন্য dedentures ইস্যু করিবে না। কেননা তাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণের মুনাফা দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়। ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন পাওয়ার জন্য জনগণকে নির্দিষ্ট মেয়াদ কিংবা নির্দিষ্ট উৎপাদনী কাজে মুনাফা ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের আহাবান জানাইত পারে। ব্যাংক এইনব কাজ হইতে লব্ধ মুনাফার অংশ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তাহাদের মূলধন অনুপাতে ভাগ করিয়া দিবে। ইহাদের নামে বিনিয়োগ সনদ (investment certificate) দেওয়া যাইবে এবং ইহা এক বৎসর হইতে পাচ বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারিবে।

সমাজে এমন বহুলোক রহিয়াছে যাহারা নিজেদের উদ্বৃত্ত মূলধন সংরক্ষণ ও মুনাফামূলক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার উপায় সন্ধান করিতেছে। ইসলামী ব্যাংক যেহেতু জনগণের নিকট খুবই বিশ্বাস্য ও আস্থাভাজন হইবে, তাই ইহা এই শ্রেণীর লোকদের মূলধন রাখা ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যম বিবেচিত হইতে পারিবে। ফলে ব্যাংক এইসব মূলধন পাইয়া উহার সুষ্ঠু ব্যবহার ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লোকদের বিরাট কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং সেই সংগে এ ধরনের অবশিষ্ট আরও বহু লোকের নিকটও আস্থাভাজন হইয়া তাহাদেরও মূল্যধন গ্রহণের বিপুল সুয়োগ পাইতে পারে; ব্যাংক এই ব্যক্তিদের নামে investment certificate ইস্যু করিতে পারে। ইহা দীর্ঘ মেয়েদী কিংবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইতে পারে, হইতে পারে ৫বা ১০ বৎসরের মেয়াদের জন্যও। এই সনদধারী লোকেরা ব্যাংকের মূল মুনাফার আনুপাতিক অংশীদার হইবে। অবশ্য সময় ও অন্যান্য কার্য-কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল অংশীদার এবং আমনতকারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফার হার বন্টন করিতে হইবে।

ব্যাংকের মূলধন সংগ্রহের জন্য ইহা খুবই কার্যকর ও বাস্তব পন্থা বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন ব্যাংক এই পন্থাকে কাজে লাগাইয়াছে এবং এই উপায়ে তাহার

বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে Investment certificates কিংবা Investment bonds জারী করা হয় এবং তাহা করা হয় নির্দিষ্ট রেটের rate সুদের (Interest) ভিত্তিতে।

বর্তমান যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঋণ বা অগ্রিম মূলধন পাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক। কয়েকটি অত্যুন্নত দেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সর্বাধিক কল্যাণকর প্রমাণিত হইয়াছে। সেই সব দেশে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গিয়াছে। কাজেই ইসলামী রাষ্টেও ব্যাংকের মাধ্যেমে এই সুবিধা (facilities) ও সুযোগ জনগণের জন্য নিশ্চিয় করিতে হইবে। দেশের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে এই cresit facelities সম্প্রসারিত হইলে অধিক কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ বিশেষ জরুরী এবং ইসলামী ব্যাংককে এ কাজ অবশ্যই করিতে হইবে।

ইসলাম নির্দিষ্ট মুনাফা (Interest, usury)—(সুদ) হারাম করিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অগ্রিম ভিত্তিতে ব্যবসায় বা শিল্পে অর্থবিনিয়োগেরও নিষেধ করিয়াছে। ইসলামে সর্বপ্রকার অর্থ বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। মুনাফা হইলে উভয় পক্ষই তাহা পাইবে এবং লোকসান হইলে উভয়ই তাহার বোঝা বহন করিবে। মন্দা অবস্থার ঝুঁকি কেবল একটি পক্ষের উপর চাপাইয়া দেওয়া কোনদিক দিয়াই সংগত হইতে পারে না।

অংশীদারদের অংশের টাকা আমানতকারী জমা এবং বিনিয়োগকারীদের দেওয়া মূলধন হস্তগত হওয়া এবং ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ ও ইহার সহিত যোগ হওয়ার পর কোন নির্ভরযোগ্য মুনাফা-সম্ভব শিল্প কর্মে তাহা লগ্নি করিতে হইবে। এলাকার ব্যবসায় ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রয়োজন পূর্ণাথেও ব্যাংক টাকা লাগাইতে পারে—ঠিক যেমন ব্যবসায়ী ব্যাংক (commercial bank) করিয়া থাকে

অতঃপর এখানে আমরা স্বল্প-মেয়েদী মূলধন বিনিয়োগ এবং তাহার পর দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

## শিল্পকর্মে অর্থ বিনিয়োগ

শিল্পকর্মে অর্থবিনিয়োগ হইতে পারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট শিল্পে এই শর্তে অর্থবিনিযোগ করিবে যে, লাভ ও লোকসান ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হইবে।

একালের সাধারণ অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোন শিল্প কর্মে অর্থবিনিয়োগের প্রশ্ন দেখাদিলে উহার আর্থিক অবস্থা সর্বাত্মকভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষও পর্যালোচনার পর সংশ্লিষ্ট শিল্প অর্থবিনিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হইলে এবং ব্যাংকের মূলধন এখানে সংরক্ষিত থাকিবে মনে করা গেলে, তাহার পরই ব্যাংক অর্থবিনিয়োগে প্রস্তুত হইতে পারে। ইসলামী ব্যাংকও অনুরূফভাবে সর্বপ্রকার

অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রকে পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিবে শুধু একটা ব্যাংক হিসাবেই নয়, বরং সম্ভাব্য অংশীদার হিসাবেই পরীক্ষা-কার্য সম্পন্ন করিবে এবং বিষয়টির প্রকৌশলী (Technical) দৃষ্টিতেও বিচার করিবে। এজন্য ব্যাংক যে Technical staff নিযুক্ত করিবে তাহা শিল্পকর্মেরও বিশেষ উপকারে আসিবে। ব্যাংক ইহার সাহায্যে যেমন প্রতিটি শিল্পকর্মের ব্যাপারে কার্যকর পরামর্শ দিতে পারিবে, তেমনি মূলধনসহ শিল্পকর্মের ব্যবসায়ের অবস্থার সহিত পূর্ণ সহযোগিতাও করিতে সমর্থ হইবে। পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পরিদর্শনের (Regular inspection) মাধ্যমে স্বীয় মূলধনেরও সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

ব্যাংক ও শিল্পকর্মে মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লব্ধ মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টন করার একটা হার ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। আর পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে কাজ করিতে পারিবেঃ

(১) বিশেষ শিল্পকর্মে মূলধন (Working Capital) হিসাবে কাজ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক এ 'লোন' (Loan) মঞ্জুর করিবে। আমরা ইহাকে Bank investment বলিতে পারি (Short term financing)।

(২) প্রস্তাবিত শিল্পকর্মে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের সমপরিমাণ মূলধন ব্যাংক দিতে পারে। কিংবা শিল্পকর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী আনুপাতিক হারেও মূলধন বিনিয়োগ কারা যাইতে পারে।

(৩) ব্যাংক শিল্পকর্ম পরিচালক কোম্পানী একটি অংশীদারিত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। ইহাতে কোম্পানীর ব্যবহার্য সম্পত্তির (assets) উপর ব্যাংকের আনুপাতিক মালিকানা স্বীকৃত হইবে। ফলে ব্যাংক যাহাতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে সেই সব শিল্পকর্মের উপর উহা আইনগত মালিকানার অধিকারী হইবে।

(৪) শিল্পকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মজুরী ও পরিচালনা বিভাগের বেতন ইত্যাদিতে যেমন পণ্যের উৎপাদন খরচায় (cost of prouction) গণ্য করা হয়, তেমন ব্যাংক উক্ত শিল্পকর্ম পরিদর্শন, উপদেশ দান এবং উহার হিসাব রক্ষর্থে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন বাবদ যাহা ব্যয় করিবে তাহাও যুক্তভাবে উৎপাদন খরচারূপ গণ্য হইতে পারিবে। অবশ্য মূল কাজ শুরু করার পূর্বে কৃতচুক্তিতে এইসব সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫)কার্য কাল (season) কিংবা আর্থিক বৎসর শেষ হইলে পর চূড়ান্ত মুনাফা বা লোকসান যাহা কিছুই হইবে তাহা আনুপাতিক হারে ব্যাংক ও শিল্প কোম্পানীর মধ্যে বন্টন করা হইবে।

(৬) ব্যাংকের দেওয়া loan ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা না হইলে সরকার কোর্টের বিচার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে একটি Trusteeship নিযুক্ত করিতে পারিবে। উহা ব্যবসায়টিকে নির্বিঘ্নে চালাইবে ও কম-সে-কম মেয়াদ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিব। উহাতে বর্তমান মুনাফা ও উদ্বৃত্ত সম্পত্তি (assets) এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে,

যাহাতে একদিকে ঋণ পরিশোধ হয় এবং অপর দিকে মূল ব্যবসায়টিও যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে। এইভাবে ব্যবসায় গুটানো এবং দেওলিয়া প্রাপ্তি (Bankruptcy) কে সমূলে উৎখাত করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ইসলামী ব্যাংক 'মুদারিবা' (مضاربت) ভিত্তিতে কোন শিল্প-পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। একটি অনুন্নত দেশে—যেখানে শ্রম খুবই সস্তব পাওয়ার যায় এবং স্থানীয় মূলধন যেখানে অব্যবহৃত হইয়া বেকার পড়িয়া রহিয়াছে—মূলধন সংগ্রহ ব্যাপক কর্মবিনিয়োগ (employment) এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে এই পরিকল্পনা বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

## ব্যবসায় ও বাণিজ্যে মুলধন বিনিয়োগ

শিল্পকর্মের ন্যায় ব্যবসায় ও বাণিজ্যেও অনুরূপ ভিত্তিতে মুলূন, বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায় মালিক মূলধন, সময়-কাল (period) এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। মুলধন বিনিয়োগ ও নিয়মিত পরীক্ষাকার্য সম্পাদনকে ব্যাংক পাশাপাশি ও সমান্তরালভাবে চালাইতে পারে। ব্যাংক বাজারের অবস্থা এবং মুনাফার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সময় সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়া মূল ব্যবসায়টিকে সটিক পথে অগ্রসর করিয়া নিতে পারে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিবে। তাহা হইল, বাসায়ের bill of exchange-এ মূলধন নিয়োগে। বর্তমান সময়ে ব্যাংক bill of exchange- এর অগ্রিম বাটা (discount) কাটিয়া 'লোন' (Loan) মঞ্জুর করে ৩০,৬০ বা ৯০ দিনের জন্য। পাইকারী ব্যবসায়ীরা ও খুচরা বিক্রেতাদের অনুরূপ ভিত্তিতে 'ঋণ' দেয় এবং এ সুযোগের সম্প্রসারণ অনুপাতে নির্দিষ্ট হারে discount এ discount ধার্য করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এই discount ধার্য করার রীতি—এমন কি bill of exchange-কাটার নিয়মকে গ্রহণ করিতে পারিবে না, উহাকে বরং এই পদ্ধতিকে খতম করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কার্যকর পন্থা কি হইবে, তাহা এখানে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

## বিল অব এক্সচেঞ্জ-এ অর্থ বিনিয়োগ

চাওয়া মাত্র অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা (on demand bills) বর্তমান সময়ে ব্যাংকের পূর্বনির্ধারিত ক্ষয়কারদীদের (customers) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ব্যাংক ইহাতে সাধারণত ঃ কোন সুদের দাবি করে না, দাবি করে নির্দিষ্ট কমিশনের। আমেরিকায় বাহিরের কোন চেক্ পেশ করা মাত্র সাধারণ নিয়মে কোনরূপ সুদের দাবি না করিয়াই নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য করিপয় দেশে এই খাতেও সুদ গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বিনা সুদে এই কাজ ৩০-৬০-৯০ দিনের মেয়াদের জন্য করিতে পারে। কিন্তু তাহা ব্যবসায়ের মল অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া করিতে হইবে।

ঋণের জমানত (Security) হিসাবে ও ব্যাংক এইসব চেক গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এইসব বিল ফেরত পাওয়ার আইন (Cimmercial loans) খুব কঠোর হইতে হইবে।

## কৃষি লোনে অর্থ বিনিয়োগ

কৃষিজীবীরা কৃষি খাতে মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাভাবে শোষিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা সাধারণত সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা তাহাদের কৃষিকার্যের উন্নয়ন বা অধিক ফসল ফলানোর কাজে খুব কমই ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা যখন ফসল কাটিয়া ঘরে লইয়া যায়, তখন উহার বেশীর ভাগই ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিয়া ও উহা হইতে ঋণ শোধ করিয়া তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তামূলক কাজে উহার খুব সামান্য অংশই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ইসলামী কৃষি ব্যাংক এই খাতেও অংশীদার হিসাবে অর্থবিনিয়োগের কাজ করিতে পারিবে। কৃষিজীবীদের কল্যাণ সমবায় ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ হইতে পারে। ব্যাংক কৃষকদের কৃষিযন্ত্র (implement) ও বীজ দিতে পারে এবং ফসলের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া প্রকৌশল পর্যায়ের (technical) পরামর্শ, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদি পরিবেশন করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি বিধান করিতে পারে। এই নব ব্যাংক স্থানীয় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে ও নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের সহিত পারস্পরিক স্বার্থসম্পন্ন কাজ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

বস্তুত কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া পারস্পরিক কৃষিব্যবসায়ের ব্যাংক গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যাংক কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করিবে এবং ফসল হইতে পূর্ব নির্দিষ্ট হারে মুনাফা ও প্রদত্ত মূলধন ফিরাইয়া লইবে।

সুদবিহীন ব্যাংক জমা গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ছাড়াও আধুনিক ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করিতে পারে। ন্যায্য খরচ আদায় করিবার জন্য মূল্যবান জিনিসসমূহ বন্ধক বা হেফাযতে রাখিতে পারিবে। তাহাতে কোনরূপ সুদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। অনুরূপভাবে একস্থান হইতে স্থানান্তরে মূলধন পাঠান এবং bill collection-এর কাজ করাও সম্ভব হইবে।

## মূলধনের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সুদবিহীন ব্যাংক জনগণের জমাকৃত মূলধনের সংরক্ষণ ও উহার নিরাপত্তা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ব্যাংক যেসব ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করিবে, তাহাতে অংশীদার ও মূলধন প্রদানকারী (Financier) হিসাবে কাজ করিবে। উহাতে যদি লোকসান (Loss) হয়, তবে তাহা জমাকারীদের উপর ধার্য হইবে না, কেননা তাহারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশীদার (active partners) নয়। তাহারা বড়জোর নিষ্ক্রিয় অংশীদার ও মূলধন প্রদান (Sleeping partners and financiers) মাত্র।

কাজেই ব্যবাসায়ে ক্ষতি (loss) হইলে তাহা হয় রিজার্ভ ফান্ড হইতে পূরণ করা হইবে, না হয় ব্যাংকের অংশীদাররা তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে। কেননা, ব্যাংকে জমা রাখা টাকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহারাই দায়ী আর ব্যবসায়ে মুনাফা হইলেও তাহা তাহারাই পাইবে।

## ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ দান

সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক কেবল যে ব্যবসায়ী মূলধন সংগ্রহের কাজই করিবে তাহা নয়, এই ব্যাংক ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য ও বিনাসুদে ঋণ দান করিবে।

বস্তুত সমাজের বহুলোকই ব্যক্তিগত প্রযোজন পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের হয়ত বিষয়- সম্পত্তি রহিয়াছে কিংবা ভবিষ্যতেও অর্থ আমাদানীর আশা আছে। কিন্তু উপস্থিত প্রয়োজন পূরণের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার দরুণ সাময়িকভাবে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নাই, তাই ইসলামী সমাজে এসব ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে বিনাসুদে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা একান্তই অপরিহার্য।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের যে প্রয়োজন দেখা দেয়,তাহা দুই পর্যয়ের হইতে পারেঃ নিতান্ত মৌলিক প্রয়োজন এবং অন্যান্য সাধারণ ধরণের প্রয়োজন। এই উভয় পর্যায়ের প্রয়োজন যথার্থভাবে পূরণ হওয়ার সষ্ঠু ব্যবস্থা না হইলে জনগণের জীবনযাত্রা সুখ ও সমৃদ্ধি পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে এইসব ক্ষেত্রেই জনগণের সহিত পুরাপুরি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্টের অন্যতম দায়িত্ব বিশেষ।

ব্যাংক মূলতঃ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। মুনাফা অর্জনই উহার আসল উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য। উহার উপর প্রধানত মুনাফাজনক কাজ-কারবারে বিনাসুদে ঋণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত। তাই ব্যাংক হইতে ঋণ পাওয়ার প্রধান অধিকারী হইল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও বিনাসুদে ঋণ দানের কাজ করার দায়িত্ব উহার উপর চাপানো যাইতে পারে। এজন্য দুইটি পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

প্রথম এই যে, যে ব্যাংকে যাহার ঋণ গ্রহণের হিসাব খোলা রহিয়াছে, বিশেষ অবস্থায় উহা হইতে জমা টাকার অধিক (overdraft) গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হইবে। এইজন্য প্রয়োজন মত নির্ভরযোগ্য জামানত (security) ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্যাংকে বহু লোকের এমন বিপুল পরিমাণ অর্থও পড়িয়া থাকে, যাহা সাধারণত নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে তোলা হয় না এবং বিশেষ কোন ব্যবসায়েও তাহা লগ্নি করা হয় না। ব্যাংক এইসব টাকা লোকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরনার্থে বিনাসুদে ঋণ বাবদ দিতে পারে। ইহাতে ব্যাংকেরও যেমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তেমনি টাকার মালিককেও এজন্য কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না।

আর দ্বিতীয় এই হইতে পারে যে, ব্যাংক দ্রব্য ক্রয় সার্টিফিকেট জারী করিবে। কোন স্থায়ী ব্যবহার্য দ্রব্য বাকী ,মূল্যে খরীদ করা হইলে সেই সার্টিফিকেট বিক্রেতাকে দিবে এবং বিক্রতা উহা ব্যাংকে জমা করিয়া মূল্য আদায় করিয়া লইবে। ইহাতে দ্রব্যের ক্রেতার উপর অর্পিত হইবে।

এই উভয় প্রকার ব্যক্তিগত ঋণ শেষ পর্যন্ত যদি ঋণ গ্রহণ কারীর প্রকৃত আর্থিক অক্ষমতার দরুণ পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে উহা পরিশোধ করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তিবে। ইহা যেমন নূতন কিছু নয়, তেমনি অবাঞ্ছনীয়ও কিছু নয়। রাষ্ট্রের যাকাত-ফিতারার ফান্ড হইতে এই ধরনের ঋণ শোধ করা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নিয়ম। নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রাধান হিসাবেই ঘোষাণা করিয়াছিলেনঃ

আমি মুসলমান জনগণের তাহাদের নিজেদের তুলনায় অনেক নিকটবর্তী। অতএব কোন মুসলমান যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়া মরিয়া যায়, তবে উহা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে। আর যে লোখ সম্পদ রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবে।

# ইসলামী রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ইসলামী রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং মুদ্রা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সরকারী নীতির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কায়েম করা অপরিহার্য। এই ব্যাংক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলিবে। মুনাফা লাভ করা ইহার উদ্দেশ্য হইবে না; বরং সার্বিভাবে জন-স্বার্থ সংরক্ষণ ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর উন্নয়ন সাধনই হইবে উহার আসল দায়িত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির মতই কাজ করিবে। উহা কারেন্সী নোট জারী করিতে পারিবে। সরকারের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেন-দেনও ইহার মাধ্যমেই সম্পন্ন হইবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কজনিত আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রণও এই ব্যাংক করিবে। একটি সাধারণ ব্যাংক কারবারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের ক্ষেত্রে যেসব দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যানা ব্যাংকের জন্য সেইসব দায়িত্ব পালন করিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন দেশে একান্তভাবে সরকার পরিচালিত হইয়া থাকে। আবার অনেক রাষ্ট্রে জনগণ ও সরকারের সম্মিলিত ব্যবস্থাধীনও উহা চলিতেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ার-মূলধন (share capital) হয় একা গবর্ণমেন্ট দিবে; কিংবা জনগণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় উহা গড়িয়া উঠিবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমূহ পালন করিতে হয় বিধায় উহার সরকারী ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়াই বিধেয়। তাই উহার পরিচালনার ভার জনগণ ও সরকার নির্বাচিত ডাইরেক্টর্স বোর্ডের উপর অর্পন করা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীয় দায়িত্ব নিম্নোদ্ধৃত কার্যাবলীর মাধ্যমে পালন করিবেঃ

(১) **মুদ্রা প্রচলন ও উহার নিয়ন্ত্রণঃ** ব্যাংক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই দায়িত্ব পালন করিবে, ইহা করিবে সম্পূর্ণ সুদ বিবর্জিত পদ্ধতিতে। বর্তমান বাংক-কারবারের এই কাজে কোন সুদের অবকাশ নাই।

(২) supply of credit ঃ বর্তমানে এই কাজ সম্পূর্ণরূপে সুদের ভিত্তিতে সম্পন্ন হইতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীয় সদস্য ব্যাংকও অন্যান্য মূলধন সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান

(Credit agencies) সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ঋণ বিতরণ করিবে। ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমগ্র দেশ হইতে সুদী কারবারকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবে এবং স্বীয় সদস্য-ব্যাংক গুলিকে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে উহাতে পুঁজি বিনিয়োগ করিবে। এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্য ব্যাংকসমূহের লাভ-লোকসানের অংশীদার হইবে। সারা দেশের ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ইহা এক উত্তম পন্থা। সদস্য ব্যাংক সঠিকভাবে কাজ না করিলে উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং স্বীয় কাজ-কারবারকে সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্য ব্যাংকসমূহকে উহাদের কারবারের লাভ-লোকসানে শরীক না হইয়াও ঋণ দিতে পারে। দেশের মূলধন (credit) সহজ লভ্যতাকে অধিক ব্যাপক করা এবং উহার মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার অকাজে পড়িয়া থাকা মূলধন সদস্য ব্যাংকগুলিকে বিনাসুদে ঋণ বাবদ দিতে পারে। ফলে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনানুযায়ী সাধ্যমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে বিনাসুদে ঋণ লাভ করিতে পারিবে।

(৩) **ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ** (control of banking system) কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি পন্থাই প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা হইল, ব্যাংকের বিজার্ভ পরির্মাণ, খোলা বাজারের রীতিনীতি ও ব্যাংকের হার-এর সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি। ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদবিহীন নীতি ও সার্বিক কল্যাণকর যাবতীয় পন্থায়ই কাজ করিতে পরিবে।

(৪) **রাষ্ট্রীয় অর্থ ও জনগণের ফান্ডঃ** মূলত রাষ্ট্র সরকারই ইহার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন হইবে। ইহার দুইটি খাত থাকিবেঃ আয় ও ব্যয়। অনেক সময় ব্যয় আয়ের তুলনায় অনেক বেশী হইয়া থাকে। তখন হয় নূতন কর ধার্যের সাহায্যে অভাব পূরণ করা হয়; কিংবা সরকারী দায়িত্বে বন্ড্স আকারে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। ইহাকে গণ-ঋণ (Public Debit) বলা হয়। প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্রই এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে যে সুদ দেওয়া হয় তাহার বোঝা প্রকারান্তরে সমগ্র দেশের করপ্রদাতা জনগণের উপরই চাপানো হয় এবং ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের সুদ।

বস্তুত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই গণ-ঋণ গ্রহণে বাধ্য। না নিলে উহা কোন কাজই করিতে পারে না, এমন কোন কথা নাই। কেননা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ভিন্নতর উপায়েও পূরণ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত সরূপ বলা যায়, আমেরিকার ফেডারেল সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহও গণ-ঋণ গ্রহণ করে এবং আর্থিক উন্নয়নে গণ-ঋণ অপরিহার্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই দেশেরই ইন্ডিয়ান রাজ্য সরকার কোন গণ-ঋণ গ্রহণ করিতেছে না। এই রাজ্যসরকার গৌরব সহকারে বারবার ঘোষণা করিয়াছে।

'ইন্ডিয়ানা—সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত, প্রথম দশ বৎসরকালীন শিল্পোন্নয়নে অগ্রবর্তী, অধিকাংশ শিল্প-সংস্থা ঋণ-বিমুক্ত ইন্ডিয়ানা রাজ্যেই করাবার করিতে চাহে কেন?

আমেরিকার Capital journal পত্রিকা ১৯৫৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায় ইহার কারণ পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেঃ

'এই রাজ্যে গণ-ঋণ বলিতে কিছুই নাই। ইন্ডিয়ানা আজও সেই ষোলটি রাজ্যের অন্যতম, যাহা স্বীয় আয়ের দ্বারাই চলিতেছে। ১৯৪৬ সনে এইরূপ রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৪১ টি। ইন্ডিয়ানা রাজ্যে সরকার কোন গণ-ঋণে ঋণী নয়। অথচ পূর্বে ইহার ষাট বিলিয়ন ডলারের রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় ঋণে ঋণী ছিল। অতঃপর ইহাতে গণ-ঋণ গ্রহণ করা শাসনতান্ত্রিকভাবেই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণে, এখানকার শিল্পসংস্থা অতীতের ঋণের ভিত্তিতে কোন সওদা করে না।'

(Reported by Indiana Department of commerce, Indiana P. 45 Indiana, U.S.A.)

ইহা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, গণ-ঋণ ব্যতীত এবং কেবলমাত্র নিজস্ব আমদানীর উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করিতে পারে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র সাধারণত সুদভিত্তিক ঋণ তো দূরের কথা, কোন প্রকার ঋণ ব্যতীতই স্বীয় কাজ সমাধা করিবে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

এতদসত্ত্বেও আমরা এখানে এমন একটি পন্থা নির্দেশ করিতে পারি, যাহা অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য বিনাসুদে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পাবলিক ফান্ড শুরু করিবে না। এই ফান্ডটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করিয়া জনগণকে উহাতে অর্থদানের সাধারণ আহবান জানান হইবে। ইহাতে যে মূলধন সংগৃহীত হইবে, সরকার তাহা বিভিন্ন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ করিবে। উহা হইতে লব্ধ মুনাফা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হার মত বন্টন করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সরকার রেল বিভাগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। উহার জন্য জনগণের মধ্যে অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। এজন্য সরকারী পর্যায়ে সিকিউরিটি সার্টিফিকেট (Investment securities ) ইস্যু করা হইবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পর ইহাতে যে মুনাফা হইবে তাহা মূলধন প্রদাতাদের মধ্যে তাহাদের মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটা Trust Fund-ও সরকারী নেতৃত্ব চালাইতে পারে। তাহাতে ব্যাংক উহার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ করিতে পারে। যেসব সরকারী পরিকল্পনায় মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, মুনাফামূলক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কাজ শুরু করাও উহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব হইল ইসলামের ব্যাংক-ব্যবস্থা পূনগঠন করা। যাহার ফলে আধুনিক ইসামী সমাজের সমস্ত আর্থিক প্রয়োজন ইসলামসম্মত পন্থায় পূরণ হইতে পারিবে ও আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুকাবিলাও করিবে।। উহার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল, জাতীয় সম্পদকে জনগণের মধ্যে ইনসাফ মুতাবিক বন্টন ও আবর্তিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা, উহাকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ধনীদের মুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে না দেওয়া, কেবল বড় বড় পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানাকেই ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবসায়েও যাহাতে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ ও মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

ইহার ফলে দেশের সর্বসাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ হইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার ব্যপকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সমস্ত ব্যাংক ব্যবসায়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করিতে হইবে, যেন সমাজে সুস্থ ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা ও সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবসায় ব্যাপকভাবে চালু হইতে পারে।

এই পর্যায়ে মনে রাখিতে হইবেঃ

কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল সুদ কে শুধু হারাম বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। উহা যে সর্বাধিক ঘৃণ্য ও বীভৎস তাহা ও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সব গুনাহ সর্বতোভাবে এক ও অভিন্ন নহে। কোন কোন কবীরাহ্ গুনাহ্ অপর কোন কবীরাহ্ গুনাহ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও ভয়াবহ হইতে পারে। সুদ এই পর্যায়ের একটি গুনাহ। ইহা গোটা অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণ নাপাক বানাইয়া দেয়। ইহার দরুন ব্যক্তির মনে স্বার্থপরতা ও সার্থান্বেষণ তীব্র হইয়া উঠে। স্বার্থান্ধ মানুষ ভাল-মন্দ- ন্যায়-অন্যায় যে কোন পথে ও উপায়ে স্বীয় হীন-স্বার্থোদ্ধারের জন্য পাগলের মত ছুটিতে থাকে। স্বর্থলিপ্সা কুটিল হইতেও কুটিলতর পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বনের জন্য প্রতি মুহূর্তেই উদগ্রীব হইয়া থাকে। মানবীয় দায়-সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা ও সম্প্রীতি হৃদয়-মন হইতে কর্পূরের ন্যায় উঠিয়া যায়। সাধারণ মানবীয় মন-মানসিকতা ও চরিত্রহীন হইতেও হীন হইয়া যায়।

এই পরম সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া সেইসব অর্থনৈতিক লেন-দেন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে সুদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ও সাদৃশ্যও পাওয়া যাইবে। বহু সংখ্যক হাদীসে সুদের সন্দেহ হয় এমন সব ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। একালে সুদের নূতন নুতন সংজ্ঞা রচিত হইয়াছে ও নানা প্রকারের নবতর ব্যাখা দানের মাধ্যমে সুদকে জায়েয় বানাবার উদ্দেশ্যে অভিনব উপায়ে ইজতিহাদ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। এই কারণে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখ দিয়াছে। কেননা বর্তমানে সুদ মুক্ত ব্যাংকের নামে নুতন গজাইয়া উঠা বহু ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অজ্ঞাতসারে কিংবা হীন কৌশলের সাহায্যে ভিন্নতর পথে সুদী কারবারই চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। এই জঘন্য কার্যকলাপ ঈমানদার লোকদের গোচরীভূত হইলে তাঁহারা চিৎকার করিয়া উঠেন। কিন্তু প্রতিকারের পথ না পাইয়া সুদে মুক্ত ব্যাংক কিংবা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পদ্ধতিতের ব্যাংক পরিচালনার সম্ভব্যতা সম্পর্কেও তাহারা সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া যান অতি স্বাভাবিকভাবে।

এই পর্যায়ে মনে রাখিতে হইবে, সুদ মুক্ত ব্যাংক, কিংবা ইসলামী ব্যাংকের নাম দিয়া ভিন্নতর পন্থায় এমনভাবে লেন-দেন করা—যাহাতে কোন না কোন মাত্রায় সেই সুদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়—লোকদেরকে বেঈমান বানাইবার কারণ ঘটাইতে পারে। নগদ মূল্যে ক্রয় করিলে পণ্যের এক মূল্য এবং বাকি মূল্যে ক্রয় করিলে সেই পণ্যাকেই অধিক মূল্যে বিক্রয় করা সুস্পষ্টরূপে সুদী কারবার। অথচ কোন কোন ইসলামী নামধারী ব্যাংক এই পন্থায় কাজ করিতেছে। ইহাতে শুধু সুদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, একটা প্রচন্ড ধোঁকাবাজিও করা হয়।

# বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক

বস্তুত ইসলামী ব্যাংককে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় ও ধন-বিনিময়ের অপরাপর আন্তর্জাতিক বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, সহযোগিতা ও আদান পদান করিতে হইবে। দুনিয়ার অমুসলিত সমাজ ও রাষ্ট্রেন সহিত ব্যবসায় সংক্রান্ত যোগাযোগ মজবুত করার দায়িত্বও উহাকেই পালন করিতে হইবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুদ বিমুক্ত লেন-দেনের ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজ হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাড়াইবে। কেননা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদই হইল যাবতীয় লেন-দেন ও আমদানী রপ্তানীর ভিত্তি। রপ্তানীকারক দেশ রপ্তানী পণ্যের উপর এবং আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানীকারক দেশ আমদানী পণ্যের উপর নিশ্চিতরূপেই সুদ ধার্য করিয়া থাকে। ব্যাংকের মাধ্যমে এল. সি (Letter of credit) খোলার জন্য বর্তমানে সুদ দেওয়া-নেওয়া অনিবার্য হইয়া আছে অথচ ইসলামী ব্যাংককে ইহা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া কাজ সমাধা করিতে হইবে।

এইরূপ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সর্বপর্যায়ের ব্যবসায় কেন্দ্রীয় ইসলামী কমার্সিয়াল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে হইবে এবং বৈদেশিক সুদের আদান-প্রদানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এমনভাবে পালন করিতে হইবে,যাহাতে শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মকভাবে সুদী লেদ-দেন খতম করা সম্ভবপর হয়। এজন্য আমরা প্রথম পর্যায়ে একটি 'বৈদেশিক সুদমুক্তির ফান্ড' (pool for foreign interest) গঠনের প্রস্তাব করিব। বৈদেশিক ব্যবসায়ের সব কাজ এই ফান্ডের মাধ্যমে সমাধা করিতে হইবে। এই ফান্ডের সাহায্যে ইসলামী ব্যাংকের আমদানীকারক অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের আনুপাতিক বিকল্প বৈদেশিক ব্যবসায়ের সুদ বৈদেশিক ব্যাংকে আদায় করিবে। আবার রপ্তানী পর্যায়ে বৈদেশিক ব্যবসায়ের উপর অন্যান্য দেশ হইতে অর্জিত সুদের বদলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের আনুপাতিক মুনাফা ইসলামী ব্যাংককে প্রদান করা হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে যদি পণ্য আমদানী করে এবং সে জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক ব্যাংকে এল. সি. খোলে, তবে আমদানীকারককে সে ব্যাংককে অবশ্যই পণ্য মূল্য পরিমাণ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ দিতে হইবে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্র হইতে কোন দ্রব্য কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানী করিতে হইলে এদেশের ইসলামী ব্যাংকেই এল. সি. খুলিতে হইবে ও আনুপাতিক হারে উহাকে সুদ আদায় করিতে হইবে। এই বৈদিশিক সুদের লেন-দেন বন্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক উপরোক্ত ফান্ডের মাধ্যমে উহাকে নিয়ম সম্মত বানাইয়া লইবে। উহার বাস্তব পন্থা এই হইবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমদানীকারক

অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার আনুপাতিক অংশ (equitable share) নিজ দেশের ব্যাংককে আদায় করিয়া দিবে, যাহা কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংকের এই ফান্ডে জমা করা হইবে এবং এই ফান্ড হইতে বিদেশী ব্যাংকের বিকল্প সুদ আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রপ্তানীকারী ব্যাংক আমদানীকারী বিদেশী ব্যাংক হইতে বৈদেশিক ব্যবসায়ের পরিমাণের উপর মেয়াদ অনুযায়ী সুদ লাভ করিবে। এই সুদ ও উক্ত ফান্ডে জমা করিয়া দেওয়া হইবে। আর কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংক এই ফান্ড হইতে বিকল্প অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে আনুপাতিক মুনফা ইসলামী ব্যাংককে দান করিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ফান্ড ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে চলিবে। ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাতে কমবেশী করারও অবকাশ রহিয়াছে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে সুদ বর্জনের জন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন কিছুমাত্র অভিনব বা ইসলামী আদর্শের প্রকৃতি-বিরোধী নহে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় শুল্ক ধার্য করিয়াছিল। ইহার জওয়াবে হযরত উমর (রা) ও ইসলামী রাষ্ট্রে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর সরকারী শুল্ক ধার্য করিয়াছিলেন। আমাদের সুদ মুক্তির আলোচ্য পরিকল্পনা ইহারই আধুনিক ও বিবর্তিত রূপ মাত্র।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র অতি সহজেই সুদের আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের প্রথা চিরতরে খতম Eliminated করিতে সক্ষম হইবে। কেননা উক্ত পরিকল্পনার শেষ পরিণতি এই দাড়াইবে যে, সুদের সর্বপর্যায়ের আদান- প্রদানই শেষ হইয়া যাইবে। উহাতে এইরূপ সংশোধন করিয়া লওয়া যাইবে যে সুদের আর্থিক মূল্য ও আনুপাতিক মুনাফার আর্থিক মূল্য নির্ধারণের পরিবর্তে অর্থ আদায়ের জন্য কোন উপযুক্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হইবে এবং ৩০,৬০, কিংবা ৯০ দিনের sight bills of usance bills-এর প্রবর্তন করা হইবে, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যণিজ্য bills of exchange-এর নিয়মে সমস্ত আদান-প্রদান নিয়মিত করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে আর্থিক জগতে ইহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুদকে খতম করিতে হইবে। ইহার ফলে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা কেবল বাস্তব (practicadle) প্রমাণিতই হইবে না, ইহার দরুণ উহার উন্নতি বিধান করিয়া সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইবে। শেষ পরিণতি স্বরূপ সমস্ত আর্থিক লেন-দেনে সুদের হার শুন্যের (Zero rate of interest) কোঠায় আসিবে এবং বিশ্বমানবতা সর্বপ্রকার শোষণ ও নির্যাতন এবং হারাম কাজের অভিশাপ হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে।

# উন্নয়ন

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই জন্য বিপুলভাবে উৎসাহ দিয়াছে ও বিভিন্ন কথা ও যুক্তির মাধ্যমে জনগণকে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সামাজিক ন্যায় বিচার এবং নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় উন্নয়নের চরম লক্ষ্যরূপ ঘোষিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ ইসলামী অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য এই পরিকল্পনা একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ও মৌলিক প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিতে হইবে। এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত সূত্র (Primises) রূপ তিনটি নিতিবাচক ও দুইটি ইতিবাচক মৌলনীতির উল্লেখ করা যায়।

ইসলামী অর্থনীতিতে উন্নয়ন মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। তাহা নকলনবিশির কলাকৌশলও হইতে পারে না। বিনিয়োগযোগ্য বাড়তি মূলধন প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সহজ শিল্পায়নের পথেও উহা অগ্রসর হইতে পারে না। উপরন্তু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ও কাঠামো লব্ধ উন্নত অর্থনীতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিছুটা কল্যাণবহ হইলেও আমাদের মত অবস্থা সহিত উহার প্রকৃত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই বিললেও অত্যুক্তি হইবে না। তাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে পশ্চিমা প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া যাওয়া আত্মঘাতী ব্যাপার হইয়া দাড়াইতে বাধ্য।

ইসলামের অর্থনীতিতে উন্নয়ন অবশ্যই আদর্শিক, নৈতিক ও মূল্যবোধ ভিত্তিক (value oriented) হইতে হইবে। এই মূল্যবোধের মৌল ভাবধারা কুরআন ও সুন্নহ্য় বিধৃত। আর তাহা হইল

> An effrot to weld the technological and idiological aspects and to make our values explicit in dicision-maknig

উপরন্তু এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তববতামুখী ও প্রয়োগবাদী (Pragmatic) হইতে হইবে। ইহার মাধ্যমেই ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধকে বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়িত হইতে হইবে। বাস্তবতাহীন ও ইসলামী মূল্যবোধ শূণ্য কোন উন্নয়ন ইসলামী অর্থনীতিতে আদৌ স্বীকৃতব্য নয়। উন্নয়নের কাজ হইল সামাজিক পরিবর্তন ও পূণর্গঠন। এই পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিকোন হইলঃ

(ক) সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও পূর্বপরিকল্পিত হইতে হইবে। একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ শুরু করিতে হইবে। সেজন্য যাবতীয়

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হইতে হইবে। মনে এই দৃঢ়মূল করিয়া লইতে হইবে যে, মানুষ এই বিশ্বলোকে মহান স্রষ্টার এক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্র খলীফা। অতএব মানুষই হইল এখানকার সামাজিক পরিবর্তনের আসল হোতা, উদ্যোক্তা ও সক্রিয় কর্মকর্তা।

(খ) সামাজিক পরিবর্তন ইসলামে কোন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহীত নয়। ইহার ব্যাপক তাৎপর্যই ইসলামে কাম্য। গোটটা পরিবেশের পরিবর্তন, ব্যক্তিগণের চিন্তা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও কর্মনীতি দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন, জীবন লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ ও উহার বাস্তবায়ন এই সব কিছুই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ক্ষেত্রে।

(গ) পরিবর্তন অর্থ বর্জন ও গ্রহণ—গ্রহণ ও বর্জন, সম্পর্কের কাটছাট, সমতার একটা পর্যায় হইতে উচ্চতর একটা পর্যায়ের অথবা অসমতার একটা অবস্থা হইতে সমতার একটা অবস্থার দিকে সুসমগতি অবলম্বন। পরিবর্তনটা হইবে অতীব ভারসাম্যপূর্ণ, বিকাশমান ও ক্রমিক পদ্ধতির অনুসারী।

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলিতে গোটা মানবতার উন্নয়নই বুঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন উহার একটি অংশ মাত্র। উহা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ইসলামে মানবীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব। ইসলামে উন্নয়নের দার্শনিক ভিত্তি ইহল (১) তওহীদ—আল্লাহ্র একত্ব ও অনন্যতা, (২) জীব ও প্রাণীকূলের সঠিক জীবিকার দায়িত্ব ও ব্যবস্থা গ্রহণ, (৩) মানবীয় খিলাফত এবং (৪) তাযকীয়া। ইসলামের উন্নয়ন পরিকল্পনা এই চারওটি মৌল আকীদাহ্র উপর ভিত্তিশীল।

বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্। তাঁহারই বিধান যেমন প্রাকৃতিক জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর কার্যকর, তেমনি কার্যকর হইতে হইবে সমগ্র মানুষের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজের উপর। সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান- বংশধর। অতএব মানুষে মানুষে কোন দিক দিয়াই কোনরূপ তারতম্য বা পার্থক্য হইতে পরিবেনা। এই পৃথিবীতে মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র খলীফা—প্রতিনিধি। অতএব জীবন পরিচালনার জন্য মানুষ নিজেরা কোন মৌলিক বিধান রচনা করিবে না, আল্লাহর দেওয়া বিদান পালন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করিবে জীবনের সমগ্র দিকে ও বিভাগে। আর এই বিধান পালন অনুসরণ বাস্তবায়নের চরম লক্ষ্য হইল মানুষের সঠিক তাযকীয়া— পরিচ্ছন্ন, পরিস্কার ও পবিত্র করণ—হৃদয়-মন-চরিত্র ও যাবতীয় কাজ-কর্মের। তাযকীয়াও শুধু তাযকীয়ার জন্য নয়। বরং ইহকাল ও পরকালীন ফালাহ—পূর্ণমাত্রার কল্যাণ লাভই হইল ইহার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

এই চারটি মূল আকীদাহ শাশ্বত ও চিরন্তন। কাল ও অবস্থা পরিবর্তনের কোন এক বিন্দু প্রভাবও ইহার কোন একটির উপরও প্রতিফলিত ইহতে পারে না। এই মূল্যমান ভিত্তিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা অবশ্যই বিশাল ক্ষেত্রে ও ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হইবে। তাহাতে শামিল থাকিবে নৈতিক আত্মিক-আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক-বস্তুগত সমস্ত দিক ও

বিভাগ। এখানে উন্নয়ণ একটা মূল্যমান সমন্বিত কর্মতৎপরতা। মানুষের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধনের আশাবাদ অনুপ্রাণিত। এখানে মানুষই হইল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দু (Central point)। তাই ইসলামের উন্নয়ন অর্থ মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, তাহার প্রাকৃতিক ও মানসিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন এবং সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। বস্তুতঃ ইসলামের উন্নয়ন-ক্ষেত্র বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত।

উন্নয়ন মুসলমানদের জন্য কেবল জাতীয় পর্যায়েই প্রয়োজনীয় নয়, বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতেও উন্নয়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক দিয়া মুসলিম জাহানের একটা বড় দায়িত্ব অর্থনৈতিক পুণর্গঠন। এই পুণগঠনের কার্যক্র মুসলিম জাহানের আদর্শিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিশ্ব-দায়িত্বের সহিত সমানুপাতিক (Commensurate) হইতে হইবে। পশ্চিমা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত গোঁজামিলের প্রতিযোগিতা করাই উহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এজন্য মুসলিম জাহানকে সামগ্রিকভাবে নিজস্ব মানদন্ড বা model কে সম্মুখে লইয়া কাজ করিতে হইবে। এই পর্যায়ে তিনটি অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে এড়াইয়া যাইতে হইবেঃ

(ক) মুসলিম জাহানের ব্যাপক অর্থনৈতিক অনুন্নত অবস্থা অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতা। অব্যবহৃত ও অপর্যাপ্ত ব্যবহৃত মানবিক ও প্রাকৃতিক উপায় উ্পকরণের ব্যবহার ও প্রয়োগ। মূলত, ইহা না হওয়ার কারণেই মুসলিম জাহানে দারিদ্র্য স্থবিরতা ও গতিহীনতার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(খ)মুসলিম দেশসমূহে সৃষ্ট ব্যাপক কাঠামোগত, সামাজিক নৈতিক বিফলতা ও সম্বাৎসরিক অনশন।

(গ) প্রবৃদ্ধি আত্মস্থ করিতে না পারা। ফলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা তীব্র ও প্রকট হওয়া। আমদানী করা প্রযুক্তি প্রয়োগে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অন্ধভাবে নকলনবিশী করা।

# পরিকল্পনা

দেশের প্রত্যকটি নাগরিকের সর্ববিধ বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু শুধু এতটুকুতেই উহার এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হইতে পারে না। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া ও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু এই কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন করা—কিছুতেই সম্ভব নয়—যতক্ষণ না দেশে প্রয়োজন পরিমাণ পণ্যোৎপাদন হইতে শুরু করিবে এবং উহার বন্টন সুবিচারপূর্ণভাবে ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে হইতে থাকিবে। এই জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্রকেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম নিজের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির গভীরভাবে যাচাই করিতে হইবে। সমগ্র দেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং দেশের বিপুল জনগণকে একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি ও সভ্য মানুষের সমাজ হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য—বিশেষ করিয়া একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী নাগরিকদের ন্যায় সকল মর্যাদা সহকারে জীবন ধারণের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য—কি কি জিনিসের অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিমাপ হইয়া যাওয়ার পর যাঁচাই ও তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে যে, দেশের এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টি কোথায়, কি পরিমাণের ও কি অবস্থায় বর্তমান আছে; এবং কি কি জিনিস মওজুদ নাই। আর মওজুদ জিনিসগুলিকে অধিকতর কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সেজন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে পারে, তাহাও গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অতঃপর যেসব অপরিহার্য জিনিস বর্তমান নাই, তাহা লাভ করিবার উপায় ও সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকে। পরিকল্পনা গ্রহণকালে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাপ করা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত সম্পদ অপরিমেয় ও সীমাসংখ্যাহীন হইতে পারে না—সীমাসংখ্যাহীন হইয়া থাকে দেশের অনিবার্য প্রয়োজন ও সমস্যা; এই জন্যই এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা মারফতে স্বীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদকে অপরিসীম জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে পূর্ণ সাম স্য স্থাপন করাই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গোড়ার কথা।

হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেঃ

كَـــانَ الْفُـــقْــــرَ اَنْ يَّكُوْنَ كُـــفْـــرًا

'দারিদ্র্য কুফরে পরিণত হইতে পারে' বা 'দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানাইয়া দেয়।' অথচ কুফরকে নির্মূল করিবার জন্যই হইবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কাজেই দারিদ্র্য দূরীভূত ও দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করিবার জন্য উহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্যও উহাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের জনশক্তিকে (Human power) ও পুরাপুরি কাজে লাগানো ও কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য কাজের ও উপার্জন উপায়ের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিধায় সর্বাধিক পরিমাণে জনশক্তি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা একান্তই আবশ্যক। বিশেষ করিয়া আধুনিক অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বেকার সমস্যা একটি অতি বড় হুমকি ও বিরাট চ্যালেঞ্জ হইয়া দেখা দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু ইহা এক বিরাট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবীয় সমস্যাও বটে। কাজেই বেকার সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই কল্যাণ রাষ্ট্র হওয়ার দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তাই ইহার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

কিন্তু এই ব্যপারে ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রাচীন উপায় ও দেশ-প্রচলিত পন্থাকেই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন বা অভিনব পন্থা গ্রহণ করা যাইবে না, ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোন কতাই থাকিতে পারে না।

মূল উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য অনুকূল অনেক নূতন উপায় ও পন্থা ইসলামী রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই হিসাবে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকা অন্যান্য সকল প্রকার রাষ্ট্র হইতেই ভিন্নতর হইবে, সন্দেহ নাই। উহা নিজেকে কেবল প্রাচীনের অন্ধকুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে না, আবার নূতনত্বের উচ্ছসিত আবেগে ও চোখ ঝলসানো চাকচিক্যে একেবারে দিশেহারাও হইয়া যাইবে না—আধুনিকতা ও অভিনবত্বের গড্ডালিকা প্রবাহেও উহা ভসিয়া যাইবে না। কাজেই, উৎপাদন উপায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক কিছু রদবদল করিয়া লওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ বাধা থাকিতে পারে না। নিছক কৃষিনির্ভর হওয়া যেমন উচিত নহে, তেমনি কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিল্পবিলাসী হওয়াও চলিতে পারে না। বরং কৃষি ও শিল্প এই উভয় পন্থাকেই জাতীয় পণ্যোৎপাদনের কাজে বিশেষভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দরুন উহাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের সম্মুখে ভিক্ষার হাত দরাজ করিতে না হয়।

পরিকল্পনার ব্যাপারে উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। ধন-সম্পদের ভুল ও অবিচারমূলক বন্টন-ব্যবস্থা চূর্ণ করিতে হইবে। আর জাতীয়

সম্পদের প্রবাহ ও আবর্তন এত অবাধ করিতে হইবে যেন জাতীর দেহের একটি অঙ্গও তাহা হইতে বঞ্চিত না থাকে। বরং প্রত্যেকটি অঙ্গই পরিচ্ছন্ন ও সতেজ রক্ত ধারায় পরিপ্লুত হইয়া সমষ্টিগতভাবে গোটা দেহটা যেন সজীব ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে।

জাতীয় সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ফলে উদ্বৃত্তি ও পুঁজিবিনিয়োগ সমানভাবে চলিতে থাকিবে এবং বেকার সমস্যা দেশ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। লর্ড কিনসের (Lord keynes) মতে উদ্বৃত্তি ও পুঁজিবিনিয়োগের । অসামঞ্জস্যই হইতেছে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের প্রকৃত কারণ। এই অবস্থাকে যতদিন দূরীভূত করা সম্ভব না হইবে ততদিন পর্যন্ত কোন সমাজে স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র। দেশের সকল নাগরিকের জন্যই কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়া যে রাষ্ট্রের কর্তব্য, দুনিয়ার সকল অর্থনীতিবিদই এসম্পর্কে একমত। বেকারত্ব একটি মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি, ইহা সমাজের কোথায়ও স্থান পাইলেই গোটা সমাজ-দেহকে পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া দেয়, সে জাতিকে সর্বোতভাবে ধ্বংসের চরম সীমায় নিয়া পৌছায়। শুধু তাহাই নয়, বেকার-সমস্যায় সামগ্রিকভাবে জাতির কর্মক্ষমতা, নৈতিক চরিত্র ও আত্মসম্মান-জ্ঞান প্রভৃতি সকল মহৎ গুণই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই জন্য দেশীয় সকল প্রকার কৃষিকার্য ও শিল্পোৎপাদনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলা ও অসংবদ্ধতা বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার পথ বন্ধ করা জাতীয় জীবনের সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য অপরিহার্য। সম্পত্তি ও সম্পদ জাতীয়করণ (সমূহবাদ) এবং স্বাধীন ও নিরংকুশ পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনের (পুঁজিবাদের) মধ্যবর্তী এক সুবিচারপূর্ণ ও প্রয়োজন পূর্ণকারী নীতি হইল পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা অনুসারে ধনোৎপাদনের সকল 'ফ্যাক্টর' সক্রিয় করিয়া তোলা। পুঁজিদার ও কারখানা মালিককে নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছামত পুঁজি বিনিয়োগ ও পণ্যেৎপাদনের অবাধ সুযোগ দেওয়া এবং একান্তভাবে তাহাদেরই উপর নির্ভর করা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। বরং একটি সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ধন উৎপাদনের সমগ্র 'ফ্যাক্টারকে' জাতীয় কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন অবাধ ও নিরংকুশ ধনোৎপাদনের পথ (Liassez Faire) বন্ধ করিতে হইবে।

সর্বোপরি পরিকল্পনায় কেবল যান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না, বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে ধন-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইতে নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর প্রয়োজন পূরণ, সর্ববিধ কল্যাণ সাধন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হইবে কিনা। বস্তুত পরিকল্পনা উদ্দেশ্য লাভের একটি উপায় মাত্র—নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়। এই জন্য সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও ইসলামী পরিকল্পনায় মৌলিক পার্থক্য থাকিতে বাধ্য।

প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ও ফসলের সঠিক মূল্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। দেশের দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতনের সর্বগ্রাসী আবর্তনে শিল্পপণ্য ও কৃষি-উৎপন্ন ফসলেরই ক্ষতি হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই পরিকল্পনায় এই সব উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যেরূপ দৃষ্টি দেওয়া হইবে, এ সবের সঠিক মূল্য স্থির করিয়া দেওয়ার উপরও অনুরূপভাবে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বৈদেশিক নীতি এমন হওয়া আবশ্যক যে, তাহার ফলে দেশের রপ্তানী পণ্যের উচ্চমূল্য লাভ যেন খুবই সহজ হয়।

দেশের কুটিরশিল্প ও ছোট আকারের শিল্পের উপরও এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেক দেশেই কুটির শিল্পে ও ছোট আকারের শিল্পই হয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সর্বপ্রধান উপায়। এই ধরনের শিল্প উন্নয়নের জন্য খুব বেশী মূলধনেরও আবশ্যক হয় না। অথচ ইহার সাহায্যে প্রত্যেক সমাজের বিপুল-সংখ্যক মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা সম্ভব এবং দেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার যোগ্য হইতে পারে। দেশের জাতীয় অর্থনীতির যে প্রধান চাপ থাকে কৃষিকার্যের উপর, কুটির শিল্প উন্নয়নের সাহায্যে তাহা অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হইলে যেসব লোকের বেকার হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে, কুটির ও ছোট আকারের যন্ত্রশিল্প উন্নয়নের দ্বারা তাহাদিগকে কর্মে পূনর্নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কুটির শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়ন যন্ত্রশিল্পেরও প্রসার করিতে হইবে, ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় বর্তমান যান্ত্রিক দুনিয়ার প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখ টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের প্রসার সৃষ্টির সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহার প্রবল ও অপ্রতিহত চাপে পড়িয়া কুটির শিল্প যেন ধ্বংস হইয়া না যায়। এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র এই উভয়বিধ শিল্পের সংরক্ষণ এবং উভয়েরই ক্ষেত্র ও সীমা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ সর্ব প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ; ভারী শিল্পের উৎপাদন ইহার পরে স্থান লাভ করে। প্রথমটিকে উপেক্ষা করিলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা তীব্র হইয়া উঠিবে এবং ভারী শিল্প উৎপাদনের উদ্দাম গতিতে জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িবে। অধিকতর রুটি, মাখন, কাপড় ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে তখন বন্দুক, বেয়নেট ও বোমার উৎপাদনই বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নিম্নলিখিত কয়েকটি মূলনীতির উপর নির্ভর করেঃ

সর্বপ্রথম মূলনীতির এই যে, সর্বাগ্রগণ্যতা ও সর্বাধিক প্রয়োজনের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ জরীপ ও যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে যে, অসংখ্য জাতীয় প্রয়োজনের মধ্যে কোন্ প্রয়োজনটি সর্ব প্রথম পূরণ করা অবশ্যক এবং সে জন্য কোন্ উপায় ও পন্থা সর্বাগ্রে কাজে লাগাইতে হইবে।

জাতীয় রক্ষা ও দেশের উন্নয়নের জন্য মূল প্রয়োজন সর্বপ্রথমে পূরণ করার ব্যবস্থা করাই হইতেছে ইসলামী পরিকল্পনার প্রথম মূলনীতি।

দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা গ্রহণকারী কমিটিকে নিম্নলিখিত নীতিসমূহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবেঃ

(১) পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে বৈদেশিক রাষ্ট্রের—সে যে রাষ্ট্রই হউক না কেন—অন্ধ অনুকরণ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধানত ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কাজেই অন্ধভাবে পরের অনুকরণ না করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সঙ্গতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করা নিজ দেশীয় উপাদান ও কাচামালের সাহায্যেই সম্ভব হইবে—বৈদেশিক মূলধন ও ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। কারণ তখন বিদেশ হইতে কেবল টাকা আর মূলধনই আসে না, সেই সঙ্গে ঋণদাতা বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্ধন এবং বাধ্যবাধকতাও গোটা দেশকে গোলামীর নাগপাশে বন্দী করিয়া ফেলে। শুধু রাজনৈতিক গোলামীই নয়, বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নৈতিক দৃষ্টিভংগী ও মাপকাটি এবং মতবাদ ও চিন্তধারার সর্বপ্লাবী সয়লাব আসিয়াও সারা দেশটিকে নিমজ্জিত করে। আর কোন ইসলামী রাষ্ট্রই যে তাহা বরদাশত করিতে পারে না, তাহা অনস্বীকার্য সত্য। কাজেই পরিকল্পনা রচনার সময় নিজ দেশীয় শ্রমশক্তি, মূলধন ও প্রাকৃতিক উপায়-উপাদানের পরিমাণের প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ ও অর্থ এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে স্বল্পতম অর্থব্যয় করিয়া বৃহত্তম ফল লাভ করা যাইবে, অর্থনীতির ভাষায়ঃ General allocation of resources and obvious result.

(৩) পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক জিনিস—যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি—বিদেশ হইতেও আমদানী করা যাইতে পারে। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিকে অধিকতর মজবুত করিয়া তুলতে হইবে। অনুরূপভাবে সে বাণিজ্য এমন সব দেশের সহিত হওয়া উচিৎ, যেসব দেশ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হইবে। অন্যথায় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার সম্ভবনা রহিয়াছে।

(৪) সকল প্রকার পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে কার্যকর ও বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলা একান্তভাবে নির্ভর করে কর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক বিশ্বাস-পরায়ণতা ও দায়িত্ব জ্ঞাণের উপর। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে এইসব গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না। এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে সাধারভাবে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে এবং বিশেষ কিরয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে এইসব গুণ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য! পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্র-সরকার ও জনগণ যদি মূলধন বিনিয়োগ না করে

তাবে কোন পরিকল্পনাই কার্যকর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক কার্যক্রম 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ নয়': চক্ষু বন্ধ করিয়া সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করাও নয়। ইহা এক রূঢ় কঠিন ও বাস্তব কার্যক্রম। এখানে কোনরূপ অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও রংগীন স্বপ্ন সাধের অবকাশ নাই।

পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উদ্বৃত্তির উপর। জাতীয় উদ্বৃত্তির জন্য দরকার ব্যক্তিগত বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যাহাতে কিছু না কিছু অর্থ অবশ্যই সঞ্চিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা, যেন তাহার নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্বৃত্তিকে রাষ্ট্র- সরকারের নির্দেশ অনুসারে জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করিতে পারে।

শেষ কথা এই যে, নির্ভুল তথ্য ও সংখ্যা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া একটি চমৎকার পরিকল্পনা রচনা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয় ;বরং কঠিন কাজ হইতেছে তাহা কার্যে পরিণত করা। এই জন্য নাগরিকদের ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রয়োজন।

# অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত

যাকাত ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদাতসমূহের অন্যতম। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলিম নাগরিককে ইহার অপরিহার্যতা সম্পর্কে যেমন বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, অনুরুপভাবে ইহা সুনিয়মিতরূপে আদায় করা ও প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তির উপর আইনত একান্তই কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত প্রথমত যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেরুদন্ড। পুঁজিবাদী সমাজের অর্থব্যবস্থায় যেমন ভিত্তি হইতেছে সুদ, এবং কমিউনিস্ট সমাজের বুনিয়াদী অর্থনীতি হইতেছ সম্পত্তির জাতীয়করণ, ইসলামী সমাজে তদনুরূপ গুরুত্ব রহিয়াছে যাকাতের। কিন্তু ধর্মব্যবস্থা ও অর্থনীতি এই উভয় দিকদিয়া যাকাতের গুরুত্ব এবং উহার সর্বব্যাপকতা অনুধাবন করিতে না পারিয়া, বর্তমান সমাজের লোক ইহার প্রতি উপক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। এক শ্রেণীর লোক ইহাকে মধ্যযুগীয় 'খয়রাতি ব্যবস্থা' মনে করিয়া ইহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর আধুনিক কালের বস্তুবাদী অর্থশাস্ত্রবিদগণ যাকাতের কল্যাণকারিতা—অন্য কথায় ইহার অর্থনৈতিক মূল্য—স্বীকার করিতে আদী প্রস্তুত নহেন। তাহারা মনে করেন,শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত আদায় করিলে শতকরা নব্বই জন অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্যপিষ্ট সমাজের কি-ই বা কল্যাণ করা যাইতে পারে এবং যুগ যুগ সঞ্চিত এই অর্থনৈতিক অসাম্য ইহা দ্বারা দূর করাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? যাকাত সম্পর্কে তাহাদের এইরূপ ধারণার কারণ সুস্পষ্ট। ইহারা আজ পর্যন্ত যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি পৃথিবীর কোন অংশেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়া উহার বাস্তব ও ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, একটি নীতি হিসাবেও (Theoretically) তাহারা ইহার পর্যালোচনা, গবেষণা এবং ইহার অর্থনৈতিক মূল্য যাচাই করিয়া কখনই দেখেন নাই, বরং তাহারা ধনী লোকদের দেখিয়াছেন গরীব ভিখারীদের মধ্যে যাকাত দানের বিলাসিতা করিতে; দানের দোহই দিয়া সম্মান, প্রতিপত্তি সুখ্যাতি লাভ করিতে। এইরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য কোন চিন্তাশীল ও আত্ম-মর্যাদা-বোধ-সম্পন্ন মানুষকেই যে আকৃষ্ট করিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুত যাকাত আদায়ের এহেন অবাঞ্ছিত ও অপমানকর পদ্ধতি ইহার কল্যাণকারিতা ও অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে অন্তত বিদগ্ধ সমাজকে নিরাশ করিয়াছে। যাকাত যে একটি 'দান' নয়, ইহা আদায় করার বর্তমান পদ্ধতি যে ভুল ও ইসলাম বিরোধী এবং এক উন্নত নির্ভুল ও সুষ্ঠু পন্থায় যাকাত আদায় করাই যে ইসলামের নির্দেশ- এইসব কথা জানিতে পারিলে যাকাত সম্পর্কে লোকদের বর্তমান ধারণা পরিবর্তিত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

যাকাত একদিকে ধন–সম্পদকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে। ইহা ধন-সম্পদের উপর প্রথমত আল্লাহর হক এবং দ্বিতীয়ত সমাজের জনগণের হক। এক দিকে ব্যক্তির কল্যাণে ইহা ব্যয়িত হইবে। অপরদিকে জনগণের সাধারণ কল্যাণেও ইহা নিয়োজিত হইবে। ব্যক্তি সমষ্টি-প্রাসাদেরই অংশ ইঁট। এক ব্যক্তির কল্যাণেও সমষ্টিরই কল্যাণ সাধিত হয় এবং সামগ্রিক কল্যাণের প্রকাশ হয় স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে।

মূলত যাকাত ধনীদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশিত একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিশেষ। ইসলামী রাষ্ট্রই তাহা অর্থশালী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবে (কেহ তাহা দিতে অস্বীকার করিলে রাষ্ট্র তাহার বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবে) এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায়-ই তাহা সমাজের গরীবদের মধ্যে এক উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় বন্টন করা হইবে।

যাকাত ব্যবস্থার প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ করার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। অভাব গ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার বা এলাকায়ই ইহা বিতরণ করা হইবে। বস্তুত জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার স্থায়ী নিরাপত্তা দানের জন্য ইহা এক 'বীমা' বিশেষ এবং ইসলামী রাষ্ট্র যে উহার প্রত্যেকটি নাগরিকেরই খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহাও এই যাকাত-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক পরিসংখ্যার দৃষ্টিতে যাকাত-ব্যবস্থার যাচাই করিলে ইহার বিপুল সম্ভাবনা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারিবেন না। বস্তুত যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন ক্রম-উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কি বিরাট কার্য সম্পাদন করিতে পারে এবং কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যক্রম ব্যতিরেকেই সমাজের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অসাম্য দুরীভূত করিয়া এক সুষ্ঠু ও স্বভাবসম্মত সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম, তাহা যাকাতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সাহায্যেই স্পষ্টরূপে হৃদয়ংগম করা যায়। উপরন্তু,এই বিশ্লেষণ হইতে এ কথাও প্রমাণিত হইবে যে, হযরত নবী করীম (সঃ) যাকাতের যে হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার রদবদল করার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই কাজ যে কত দুরূহ, কষ্টসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা অর্থশাস্ত্রবিদগণই অনুভব করিতে পারেন। এই কাজে সর্ব প্রধান বাধা এই যে, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান Facts and Figures বর্তমান অবস্থায় সঠিকভাবে জানিবার কোনই উপায় নাই। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের মাত সাধারণ লোকদের আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কথা বলিতে হয়। কিন্তু তবুও এই আন্দাজ-অনুমান যে একেবারেই ভিত্তিহীন নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই কারণে ইসলামী অর্থনীতি রূপায়ণে উৎসাহী ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্তই কর্তব্য।

দেশের অর্থোৎপাদনের বিভিন্ন সূত্র ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সর্বশেষ ও সাম্প্রতিক তথ্য ও পরিসংখ্যান খোঁজ করিয়া বাহির করা আমরার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আমার মনে

হয়, তাহা না হইলে যে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করা যাইবে না এমন কথাও নয়। মূলত এ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল যাকাতের কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধরণা দেওয়ার চেষ্টা করা। এজন্য যে কোন দেশের যে কোন সময়ের একটা পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করিলেও চলিতে পারে। তাই বর্তমান আলোচনাকে আমরা এভা:বেই পেশ করিতে চাহিতেছি।

সতর্কতার সহিত যে তথ্য ও পরিসংখ্যান ধরা হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এখানে উহার যাকাতের পরিমাণ বাহির করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের এই অনুমান, যাকাতযোগ্য জিনিসের সঠিক পরিমাণের অন্তত; অর্ধেক হইবে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু ইহা হইতেও যে পরিমাণ যাকাত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

## কৃষি-উৎপন্ন ফসলের যাকাত

কৃষি উৎপন্ন ফসল হইতে যাকাত গ্রহণের নিয়ম নিম্নরূপঃ

১. বৃষ্টি কিংবা জোয়ারের পানিতে সিক্ত জমির ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ।

২. কৃত্রিম উপায়ে সিক্ত জমির ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে।

৩. চারণ-ভূমির উপর কোনই যাকাত ধার্য হইবে না।

৪. বৎসরে ১০ মণ ফসল জন্মেনা—এমন সব ভূখন্ডও এই হিসাবের বাহিরে থাকিবে। কারণ, তাহা হইতে ওশর গ্রহণ করা হইবে না।

৫. অমুসলমানদের জমিও ইহা হইতে বাদ পড়িবে।

কাজেই মোট আবাদী জমি হইতে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ বাদ দিতে হইবে। এইজন্য প্রথমেই মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া লইতে হইবে।

জমির ফসল হইতে যাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষা উহাকে 'ওশর' বলা হইলেও উহার এবং সাধারণ যাকাতের ব্যয়-ক্ষেত্র একই। কাজেই এই ওশরও যাকাতের সহিত সামিল হইবে।

অর্থোৎপাদনকারী মূলধনের উপরও শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত ধার্য হইবে। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার নগদ ধন-সম্পদ, ৫২ তোলা রৌপ্য এবং তোলা পরিমাণ স্বর্ণেরও যাকাত আদায় করিতে হইবে। এই সম্পদ ব্যাংকেই জমা থাকুক, কি নিজেদের ঘরেই সঞ্চিত রাখা হউক, অথবা অলংকাররূপেই থাকুক, তাহাতে নির্দিষ্ট হারে অবশ্যই যাকাত ধার্য হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১. রিজার্ভ ব্যাংকের সমস্ত হিসাবকেই ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে। কারণ, উহাতে সরকারের সংরক্ষিত, আমানত স্বরূপ রক্ষিত এবং প্রদত্ত মূলধনের অংশই অধিক। আর

উহার উপর যাকাত ধার্য হয় নাঃ অন্যান্য ব্যাংকের হিসাবও উহাতে থাকে, কাজেই ইহার উপর যাকাত ধার্য হইলে একই মৃদনের উপর অন্ততঃ দুইবার যাকাত ধার্য হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

২. অন্যান্য ব্যাংকসমূহের যাবতীয় আদায়কৃত মূলধন, রিজার্ভ ফান্ড (যেহেতু ইহাও অংশীদারদেরই আমানতিস্বত্ত্ব; ইহাকে ব্যবসায়ী মূলধনও মনে করা যাইতে পারে এবং নগদ সুরক্ষিত মূলধনও)—এই সকল মূলধনের অর্ধেক টাকা বৈদেশিক মূলধন হিসাবে আমাদের হিসাবের বাহিরে রাখিতে হইবে। অনুরূপভাবে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, জয়েন্ট স্টক ব্যবসায়ী কোম্পানীসমূহেরও অর্ধেক মূলধনই ধার্য হইবে

৩. প্রথমত, আমাদানী-রফতানী কার্যে নিযুক্ত সমস্ত মূলধনের চার ভাগের একভাগ এই হিসাবের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ তাহাতে অর্ধেক পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই ধরণের ব্যবসায়ে ব্যাংকের সাহায্যে মোট সগদ মূলধনের দ্বিগুণ টাকার কাজ হইয়া থাকে। কাজেই এই কাজে নিযুক্ত যাবতীয় মূলধনের চার ভাগের একভাগ গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

৪. আমদানী রফতানী বাণিজ্যে সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে মূলধন ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী বাহিরের শিল্প-পণ্য অভ্যন্তরীণ খরীদ্দারদের নিকট পর্যন্ত পৌছান এবং দেশীয় কাঁচামাল বিদেশে প্রেরণ করার নীচের দিকে চারটি পর্যায় রহিয়াছে। ব্যবসায়ের এই চারটি পর্যায় নিম্নরূপঃ

(ক) আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী (খ) আঞ্চলিক কমিশন এজেন্ট (গ) ছোট বাজার ও বন্দর (ঘ) সাধারণ দোকানদার।

এই চারটি পর্যায়ের প্রত্যেকটি হইতে ব্যবসায়ী পণ্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌছাইতে ঠিক সেই পরিমাণ মূলধনেরই প্রয়োজন হয় যাহার প্রয়োজন একমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ে। অতএব একই সম্পদের ব্যবসার পণ্য আমদানী রফতানীর জন্য চারগুণ কাজ করে। হিসাব ইহারই অনুরূপ ধরিত হইবে।

৫.সাধারণ অনুমানের সাহায্যে আমদানী-রফতানী বাণিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—অন্য কথায় পণ্যদ্রব্যের চলাচলের হার ৪ —১ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে চারগুণ অধিক মূলধন ধার্য করা হইয়াছে।

৬. মোট ব্যবসায়ী মূলধনের অর্ধেক এই ধারণায় বাদ দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে বৈদেশিক মূলধন ইহাই হইতে পারে; এই সকল দিক বিবেচনা করার পর নগদ মূলধনের যে আনুমানিক পরিমাণ হইতে পারে, তাহা কোন অংশেই সামান্য হইবে না।

## ব্যক্তিগত মূলনের যাকাত

ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকদের নিকট যে মূলধন বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকে, সেই বিষয়ে অনুমান করিয়া বলা যায় যে, শতকরা অন্তত ১৫ জন লোকের নিকট ৫০.০০ টাকার অধিক পরিমাণ টাকা নগদ কিংবা অলংকারবাবদ মওজুদ রহিয়াছে। ইহাদিগকে

চারটিন শ্রেণীতে গণ্য করিয়া ইহাদের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, বার্ষিক ২.৫০ টাকা হইতে ৭৫.০০ টাকা পর্যন্ত যাকাত দাতাদের নিকট হইতে একটা বড় পরিমাণ প্রতিবৎসর যাকাত বাবদ পাওয়া যাইব্যে।

## সরকারী ঋণে নিযুক্ত টাকার যাকাত

সরকারী ঋণ বাবদ জনগণের যে টাকা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে ব্যবসায়ী মূলধন মনে করিতে হইবে। অন্ততঃ এই টাকাগুলি তো সুরক্ষিত রহিয়াছে—একদিন-না-একদিন ইহা অবশ্যই ফেরত পাওয়া যাইবে। কাজেই ইহার অবস্থা সাধারণ ঋণের মত নহে, বরং ইহাকে নিজের হাতে পুঞ্জীকৃত টাকার মতই মনে করিতে হইবে এবং এই জন্যই ইহার উপরও যাকাত ধার্য হইবে। অন্তত যখনি এই টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে, তখনি বিগত বৎসরসমূহের যাকাত একত্রে আদায় করিতে হইবে।

## গৃহপালিত পশুর যাকাত

গৃহপালিত পশুর উপরও যাকাত ধার্য হয়। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাাদির ৪০ ভাগের ১ভাগ যাকাত ধার্য হইয়া থাকে। একটি দেশে ব্যবসায় কিংবা বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কত সংখ্যক পশু পালিত হইতেছে এবং এই বাবাদ কাহার উপর কত যাকাত ধার্য হইতে পারে, তাহার সঠিক পরিমাণ জানা সে দেশের সরকারের পক্ষে সম্ভব। এই বাবদ একটা বিরাট পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত ফান্ডে জমা হইবে এবং ইসলামের নির্ধারিত ক্ষেত্রে—গরীর, মিসকীন, ইয়াতীম, বিধবা, অসহায় আকস্মিক বিপদে সর্বহারা এবং প্রয়োজন পরিমাণ অর্থোপর্জনে অসমর্থ লোকদের প্রয়োজন পূরনেও তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়, তবে সে দেশ হইতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে সকল প্রকার অভাব ও দারিদ্রতা দূরীভূত করা যায় এবং এক স্বচ্ছন্দ অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

## যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে জাতীয় সম্পদ যেভাবে তীব্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যাহার ফলে ব্যবসায়ী মূলধন ও উদ্বৃত্তির পরিমাণ বাড়িতেছে তাহাতে প্রত্যেক বৎসর যে যাকাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাকাতের ব্যয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সমগ্র গরীব লোকের যে বৃহত্তর কল্যাণ সাধণ করা যাইতে পারে, তাহা এই মুহূর্তে কল্পনাও করা যায় না।

## যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা

বাৎসরিক যাকাতের যে পরিমাণ সম্পর্কে উপরে একটি ধারণা দেওয়া হইল উহাকে সঠিকভাবে ও সুষ্ঠু পন্থায় উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ

পরিকল্পনা রচনা করা একান্তই আবশ্যক। বর্তমান সন্দর্ভে আমি ইহার একটি আভাস মাত্র পাঠকদের সম্মুখে পেশ করিতে চেষ্টা করিব।

ইহাতে কোনই দ্বিমত নাই যে, দেশের গরীব, মিসকীন, অন্ধ, অসহায়, শিশু, বৃদ্ধি, বধবা, পংগু, আতুর, বিপদগ্রস্ত পথিক এবং প্রয়োজন পরিমাণ অর্থোপার্জনে অসমর্থ লোকদের মধ্যে যাকাতের টাকা বিতরণ করিতে হইবে। এই ধরনের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের প্রতি কেন্দ্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা অনায়াসে ইহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে তাহাদের গণ্য করিতে পারি—যাহারা বিভিন্ন সরকরী বিভাগ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। যাকাতের মোট টাকার অর্ধেক তাহাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে ব্যয় করা হইবে এর্বং তাহাদের জন্য গঠিত পারস্পরিক সাহায্য-সংস্থায় তাহাদেরই নামে এই টাকা নির্দিষ্ট হারে জমা করা হইবে, যেন ইহার সুফল তাহারাই ভোগ করিতে পারে। গরীবদের বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা,আদালতী বিচার লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট অসংখ্য প্রকার কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তোলা এই ফান্ডের দ্বারা সম্ভব। বলাবাহুল্য, যাকাত আদায়ের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত হইবে তাহাদের বেতনও এই টাকা হইতেই দেওয়া হইবে।

বাকী অর্থের টাকা নিম্নলিখিত রূপে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারেঃ

(১) গরীবদের জন্য স্থায়ীভাবে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং

(২) ব্যক্তিগতভাবে তাদের নগদ টাকা বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া দেওয়ার খাতে ব্যয় করা হইবে।

## স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা

গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার উপায় হইতেছে, তাহাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কৃষিজমি ক্রয় করিয়া দেওয়া ও কারখানা স্থাপন করা। বলাবাহুল্য, এই কারখানায় কেবল গরীবেরাই মজুর ও পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইবে এবং তাহারাই হইবে ইহার মালিক ও স্বত্বাধিকারী। অনেক গরীবকে আবার ব্যবসায়ের প্রয়োজন পরিমাণ পুঁজি হিসাবেও টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

## জমি খরিদের দাম

কৃষক ও কৃষিজীবী পরিবারদের মধ্যে যাহারা ভূমিহীন কিংবা প্রয়োজন পরিমাণ ভূমি যাহাদের নাই,-তাহাদিগকে জমি ক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিবৎসর মোট যাকাতের একটি অংশ—মনে করুন তিন কোটি টাকা—যদি নির্দিষ্ট করা হয়, তবে তাহা দ্বারা অনায়াসেই কম-বেশী ৬ একরবিশিষ্ট দশ হাজার খন্ড জমি খরীদ করিয়া দিয়া অন্ততঃ দশ হাজারটি পরিবারকে অভাব দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

## কারখানা স্থাপন

যাকাত ফান্ডের আর একটি অংশ—মনে করুন দশ কোটি টাকা—শুধু কারখানা স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে-এই কারখানায় গরীব, অভাবক্লিষ্ট ও শ্রমজীবী লোকই 'কর্মচারী' হিসাবে নিযুক্ত হইবে। আর সমবেতভাবে তাহারাই হইবে উহার স্বত্বাধিকারী। কারখানা স্থাপন ও সাফল্যের সহিত ইহা চালাইয়া দেওয়া পর্যন্তই হইবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য বা কর্তৃত্ব। উন্নত ধরনের মধ্যম শ্রেণীর কারখানা স্থাপন করিলে গড়ে কারখানা প্রতি দুই কোটি টাকা হিসাবে মূলধন দ্বারা অন্ততঃ পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কারখানা প্রতি বৎসর স্থাপন করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর এত লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া-শুধু তাহাই নয় - একটি বিরাট অর্থোৎপাদক কারখানার মূল্যবান অংশের অংশীদার হওয়া কোনক্রমেই সামান্য কথা নয়। ইহাতে প্রতি বৎসর এই পাঁচ-ছয় হাজার পরিবারের এবং ২০/২৫ হাজার লোকের ভরণ-পোষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

## ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ

প্রতি বৎসর উপার্জনহীন লোকদিগকে ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া বাবাদ অন্তত ঃ ১০ কোটি টাকা নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই টাকাকে বিশ হাজার অংশে ভাগ করিয়া ততটি পরিবারকে দান করিলে শুধু ব্যবসায়ের মাধ্যমেই প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৮০/৯০ হাজার লোকের জীবিকার ব্যবস্থা বিশেষ সাফল্যের সহিত হইতে পারে।

## ব্যক্তিগতভাবে দান

উপরে উল্লিখিত খাতসমূহে যাকাতের টাকা ব্যয় করার এই ফান্ডের যত টাকাই উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা সরাসরিভাবে উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে নগদ দান হিসাবে তুলিয়া দেওয়া যাইবে। এই 'দান'এককালীনও হইতে পারে, কিংবা মাসিক 'বৃত্তি' হিসাবেও ইহা বন্টন করা যাইতে পারে। এই টাকার একটা প্রধান অংশকে নিম্নলিখিতরূপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া দিলে এবং কাহাকেও আংশিক আর কাহাকেও পূর্ণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অধিক পরিমাণ দেওয়া হইলে অন্ততঃ ১৮ কোটি টাকা নিম্নলিখিতরূপে খরচ করা যাইতে পারেঃ

(ক) ১০ কোটি টাকা—পরিবার প্রতি বাৎসরিক এক হাজার টাকা হিসাবে এক লক্ষটি পরিবারকে।

(খ) ৪ কোটি টাকা —পরিবার প্রতি পাঁচ শত - টাকা মাসিক হিসাবে ৮০ হাজারটি পরিবারকে।

(গ) ২ কোটি টাকা—পরিবার প্রতি আড়াই শত টাকা হিসাবে ৮০ হাজারটি পরিবারকে।

(ঘ) ২ কোটি টাকা—পরিবার প্রতি এক শত টাকা হিসাবে ২ লক্ষটি পরিবারকে।

এক কথায়, প্রত্যেক্ষ বন্টনের ফলেও প্রতি বৎসর ৬ লক্ষ ২০ হাজারটি পরিবার কিংবা ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার (পরিবার প্রতি চার জন হিসাবে) ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক অনটনের মর্মান্তিক অবস্থা হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের মর্যাদায় উন্নীত করা যাইতে পারে। আর পূর্বোক্ত হিসাবকেও উহার সহিত যোগ করিলে প্রতি বৎসর ইসলামী রাষ্ট্রের ২৬/২৭ লক্ষ নাগরিকের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া দেওয়া সম্ভব।

এমতাবস্থায় একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া যাকাত আদায় এবং উহার সুষ্ঠু বন্টনের কাজ শুরু করিলে এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১ কাটি ৩৫ লক্ষ নাগরিককে আর্থিক অসংগতি ও সংকটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া সুখে জীবন-যাপনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া খুবই সম্ভব।

## অন্যান্য সাদকা

প্রথমত ইসলামী সমাজে গরীব জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য কেবল যাকাতই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, এতদ্ব্যতীত আরো অনেক প্রকার সাদকাও এই ফান্ডকে শক্তিশালী করিয়া তোলার ব্যাপারে বিশেষ কাজ করিবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের—তাহার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, অসহায় পথিক কিংবা আকস্মিক বিপদগ্রস্থ লোকদের যথাসম্ভব সাহায্য করাও কর্তব্য হইয়া রহিয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এই কাজ গোপনে করিবে এবং প্রকাশ্যভাবেও করিব।

অতএব এ কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা যায় যে, নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের যে ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শ পেশ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর কোন মতবাদই পেশ করিয়াছে বলিয়া জনা যায় না। উপরন্তু একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রই সকল পর্যায়ের নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে পারে—অন্য কোন রাষ্ট্রই তাহা করিতে সমর্থ নয়।

# শরীকানা ব্যবসায়

মূলধন একীভূত হওয়া ও সুদী কারবারের কুফল হইতে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন প্রকারের উপায় ও পন্থা উপস্থাপিত করিয়াছে। তন্মধ্যে পারস্পরিক শরীকানা ব্যবসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আরবী পরিভাষায় ইহাকে 'মুজারিবাত' مضاربت বলা হয়। এই ব্যবসায়ের চুক্তি দুইটি পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে একজন মূলধন দেয়। পরিভাষায় তাহাকে 'রব্বুলমাল' বা মূলধনর মালিক বলা হয়। আর অপরপক্ষে সেই মূলধন লইয়া ব্যবসায় করে। ব্যবসায়ের সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণ শ্রম এই পক্ষকেই দিতে হয়। ফিকহর পরিভাষায় তাহাকে 'মুজারিব' مضارب বলা হয়। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্বকে শরীয়তি পরিভাষায় শিরকাত বা মুশারিকাতও বলা হয়। ফিকাহবিদগণ কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এই শরীকানা ব্যবসায়ের চারটি পন্থা নির্ধরণ করিয়াছেন ঃ

১. দুইজন শরীক—দুই ব্যক্তি হউক; কিংবা বহুকয়জন মিলিত হউক, সমান পরিমাণের মূলধন বিনিয়োগ করিবে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ কাজও করিবে সমান। ফিকহর পরিভাষায় এই ধরনের শরীকানাকে বলা হয় شركت مفاوضه 'শিরকাতে মুফাবিজাহ'। এই ধরনের শরীকানা ব্যবসায়ে দুইটি পক্ষ সমান অংশীদারিত্ব লাভ করে। অর্থনৈতিক পরিভাষা অনুযায়ী মূলধন ও কাজ বা শ্রম-এ উভয় পক্ষ সমান সমান শরীক থাকে, এই জন্য লাভ ও ক্ষতির ক্ষেত্রেও তাহারা সমানভাবে শরীক গণ্য হইবে।

২. দুই শরীক পক্ষের বিনিয়োগকৃত মূলধন সমান পরিমাণের হইবে না, হইবে কম ও বেশী। কিন্তু কারবারি শ্রম উভয়ই মিলিতভাবে সম্পন্ন করিবে। ফিকহর পরিভাষায় এই শরীকানাকে 'শিরকাত ইনান' شركت عنان বলা হয়। মূলধনের অনুপাতে; কিংবা কারবারি দক্ষতার হার ও মান অনুযায়ী লাভ ও লোকসানে উভয়ই শরীক হইবে। এই শরীকানা ব্যবসায়টি অধিকতর সহজসাধ্য।

৩. দুই শরীক পক্ষের কোন এক পক্ষও কোন মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে নাই, কিন্তু উভয় পক্ষই কোন বা কয়েকটি শিল্পকর্মের নৈপুন্য বা দক্ষতার অধিকারী এবং বড় ও ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য উভয়ই এই শর্তে একত্রিত হয় যে, গ্রাহকদের নিকট হইতে কাজের বিনিময়ে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে বিনিময় ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা আয় ধরা হইবে এবং উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যে সমান সমান অথবা বেশী কম যাহাই পূর্বে সিদ্ধান্ত হইবে সেই অনুযায়ী ভাগ করিয়া নিবে।

যেমন একজন দর্জী মহিলাদের পোষাক তৈরী বা সেলাই করার কাজে দক্ষ হইবে, আর অপরজন পুরুষদের পোষাক তৈরীর কাজে। উভয়ই মিলিত হইয়া বড় আকারে দর্জীর দোকান দিয়া বসিল, যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই পোষাক তৈরীর কাজ হইবে।

এই শরীকানাকে শিরকাতুস-সানায়ে شركت الصنائع বা 'শিল্পকর্মে শরীকানা' বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কর্ম, পেশা ও কারবারকে বড় আকারের করার জন্য এই অংশীদারিত্বের কারবার খোলা হয়। কারবারের ব্যয়টা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্টন করা হইবে।

৪. উভয় শরীক পক্ষ কোন পেশা বা শিল্পে দক্ষ নয়, বড় আকারের কাজ করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ মূলধনও কাহারো নিকট নাই। কিন্তু উভয়েরই ব্যবসায়ী good will বা সুনাম—সততা ও বিশ্বস্ততার খ্যতি সমগ্র বাজারে বিরাজমান। ফলে তাহারা উভয়ই নিজেদের সুনামের বলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পণ্য লইয়া খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলিতে পারে। দোকানের আয় হইতে খরচ বাদ দিয়া মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হার অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইবে। এই শরীকানাকে পরিভাষায় 'শিরকাতুল উজুহ' شركت الوجوه বলা হয়। এ পর্যায়ের সকল প্রকার শরীকানার বিশেষ শরীয়তি আইন-বিধান ও শর্ত রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিভাষার দিক দিয়া প্রথমোক্ত দুই প্রকারের শরীকানায় প্রত্যেক শরীকের পক্ষ হইতে ধন-উৎপাদনের মূলধন ও শ্রম উভয় ফ্যাক্টর (Factor) বর্তমান থাকে। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের শরীকানায় ধন-উৎপাদনের ফ্যাক্টর হিসাবে থাকে শুধু শ্রম Labour। আর চতুর্থ প্রকারের শরীকানায় মূলধনের পরিবর্তে good will বা ব্যবসায়ে সুনাম-সততা-বিশ্বস্ততাই প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। উহাকে সাধারণ অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'সম্পদ উৎপাদনের ফ্যাক্টরী বলা হয় না বটে; কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এই সততা বিশ্বস্ততার খুব বেশী গুরুত্ব রহিয়াছে, যাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

# আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

মানব সমাজে শ্রমবিভাগই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা। সকল মানুষ যেমন সকল প্রকার কাজ সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না, অনুরূপভাবে সব দেশও সকল প্রকার কাজ আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয় না। বাংলাদেশের জমিতে যত সহজে পাট উৎপন্ন হয়, অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়। অতএব মালয়ে রাবার ও বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন করার জন্য চেষ্টা করাই স্বাভাবিক পন্থা। ইহার বিপরীত করিতে গেলে অর্থ এবং শ্রমশক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা

যে দেশে যে জিনিস অপেক্ষাকৃত সহজে জন্মিতে পারে, সেখানে উহারই উৎপাদন করিতে চেষ্টা করা এবং প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুসারে অন্যদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করার নাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। অতি আদিম কালে যদিও মানব সমাজের পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিস বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না, প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন নিজের শ্রমশক্তির সাহায্যে পুর্ণ করিয়া লইত। তথাপি মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার ও উহার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও শ্রমোপার্জিত দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় অপরিহার্য হইয়া দেখা দেয়। আজ ব্যক্তি বিশেষ যেমন নিজের সর্ববিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী, অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি দেশও যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য অন্যান্য দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মারফতে প্রয়োজনীয় পণ্যদব্যাদির আদান-প্রদান মানব-সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে দেশে যে পণ্য উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধা আছে, সে দেশে উহা উৎপাদন করিয়া উহার বিনিময়ে বিদেশ হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করিবে, ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত সমগ্র মানুষ যদি একই পরিবারের লোক হিসাবে বসবাস করিতে পারিত, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ অসুবিধাজনক হইত না, যাহার যে জিনিসের প্রয়োজন হইত, বিনা দর-দস্তুরে সেখানেই উহা আবাধে সরবরাহ করা চলিতে।

## দেশীয় শিল্পপণ্য বিক্রয়

প্রকৃতপক্ষে একটি দেশ উহার উৎপন্ন পণ্য বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইয়া থাকে। কিন্তু গার্হস্থ্য ও বৃহৎ শিল্পোৎপন্ন পণ্য হইতে ঠিক ততদিন মুনাফা লাভ হইতে পারে, যতদিন (১) উহার কাঁচামাল নিজের দেশ

হইতেই সংগৃহীত হইবে, (২) প্রয়োজনীয় কলকারখানা নিজের দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং (৩) বৈদেশিক পণ্যের আমদানী এমন কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, দেশী পণ্যের মুকাবিলায় কোন বৈদেশিক পণ্য দেশের অভ্যন্তরে টিকিতে পারিবে না।

## আমদানী ও রফতানী

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমদানী অপেক্ষা রফতানী বেশী হইলে দেশীয় মূলধন বৃদ্ধি পায়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তি সম্ভব হয়। কিন্তু ইহার বিপরীত, রফতানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইলে দেশের ধনভাণ্ডার শূন্য হইয়া য়ায় এবং উহার বৈদেশিক মুদ্রা মারাত্মক রূপে হ্রাস পায়।

রফতানী বাণিজ্যে প্রত্যেকটি দেশ সাধারণত তিন প্রকারের পণ্য বিক্রয় করিতে পারেঃ (১) শিল্পপণ্য, (২) কাঁচামাল ও (৩) বিলাস দ্রব্য। কিন্তু কোন দেশ যদি কেবল কাঁচামালই বিক্রয় করে, তবে নিজদেশের কোন দিনই শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয় না। তখন নিজ দেশের কাঁচামাল বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করিতে সে স্বতঃই বাধ্য হইবে। কার্পাস উৎপাদনকারী দেশ যদি উৎপন্ন কার্পাসের শতকরা ৯৫ ভাগ বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করিয়া দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ক্রেতা দেশের নিকট হইতেই খরীদ করিতে থাকে, তাহা হইলে উহার পরিণাম সে দেশের পক্ষে মারাত্মক হইতে বাধ্য। ইহার অন্য অর্থ এই যে, একটি ভিন্ন দেশ কাঁচামাল খরীদ করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করে, এবং সেই বস্ত্রই পুনরায় কার্পাস উৎপাদক দেশের নিকট বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটে। এইজন্য প্রত্যেকটি দেশের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে দেশবাসীর লক্ষ্য থাকা এবং দেশের অপরিহার্য পণ্য নিজ দেশেই উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করা একান্ত অবশ্যক। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নিজ দেশের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পণ্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন কর সম্ভব না হয়, ততদিন বৈদেশিক পন্য আমদানীর ব্যাপারে এমন নিয়ন্ত্রণ চালু করা প্রয়োজন, যেন দেশী শিল্প-প্রসারের অনুকূলে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সে নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ধারায় হইতে হইবেঃ

১.কাঁচামাল রফতানী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যেন দেশী শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় এবং তাহা যেন যথাসম্ভব কমমূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

২. দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্পপণ্য বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করার সুবন্দোবস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. দেশের যাবতীয় শিল্পপন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, যেন তাহা দ্বারা দেশবাসীর প্রয়োজন অনায়াসেই পূর্ণ হইতে পারে।

এইরূপ ব্যবস্থা করা না হইলে— (১) অন্যান্য দেশ এই দেশেরই কাঁচামাল ক্রয় করিয়া অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে তাহাদের উৎপন্ন পণ্য এই দেশেই বিক্রয় করিবে। ফলে এই দেশে শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি প্রতিহত হইবে। (২) বৈদেশিক পণ্য নিজ দেশে

এইভাব বিক্রয় হইতে থাকিলে দেশের কারিগর ও শ্রমিক-মজুর বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইবে এবং দেশী কাঁচামাল রফতানীর বিনিময়ে বৈদেশিক পন্য আমদানীর ব্যবস্থা করা তখন অপরিহার্য হইয়া পড়িবে।

## বিলাস দ্রব্যের রফতানী

বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বিলাসদ্রব্যর এইজন্য গুরুত্ব রহিয়াছে যে, ইহা অত্যাধিক মুনাফা লাভের দরুন একটি দেশের মূলধন বাড়াইয়া দিতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক দেশই নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিলাসদ্রব্য রফতানী করিতেই প্রাণপনে চেষ্টা করে। বিলাসদ্রব্য রফতানী করিলে দেশের শ্রমিক, মজুর ও ব্যবসায়ীদের প্রচুর মুনাফা হইতে পারে—নিছক এই দৃষ্টিতে যদি চিন্তা করা ও নীতি নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে উহা এক অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি কোন একটি ব্যাপারে উহার নৈতিক দর্শনকে উপেক্ষা করিতে পারে না, নৈতিক নিয়ম-বিধানকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে নৈতিক চরিত্র, সর্ববিধ কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করার জন্যই চেষ্টা করা হইবে। এইজন্যই বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন এবং আমদানী ও রফতানীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন মুসলমান নিজে মদ উৎপাদন করিতে পারে না। তাহাকে প্রথমেই এই কথা চিন্তা করিতে হইবে যে, যে যে দ্রব্য উৎপন্ন করা হইতেছে, মূলত তাহা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর না ক্ষতিকর। কল্যাণকর হইলে উহার উৎপাদন ও ব্যাপক প্রচার করা হইবে আর ক্ষতিকর হইলে তাহা সর্বতোভাবে বর্জন করিতে হইবে। তাহা উৎপন্ন করিয়া বিদেশের বাজারে চালান দিয়া যদি অপরিমিত অর্থ লাভও সম্ভব বা সহজ হয়, তবুও ইসলামী রাষ্ট্র তাহা কিছুতেই করিতে পারে না।

## আমাদানী নীতি

এক একটি দেশ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। আমদানী-নীতি নির্ধারণের সময় তীব্রভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে দেশে কোন কোন দ্রব্যের কি কি পরিমানে অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

## নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

আমদানী-নীতি নির্ধারণের সময় ইসলামী অর্থনীতিতে প্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয় অত্যাবশ্যকীয় উপর। এই ব্যাপারেও দেশের প্রকৃত অবস্থার উপর খুব কড়া নজর রাখা আবশ্যক। কাজেই ঠিই যে জিনিস যতখানি প্রয়োজন তাহা ঠিক সেই পরিমাণেই আমদানী করা সঙ্গত। আর যেসব জিনিস কিছু না কিছু নিজ দেশে উৎপন্ন হয়, সেসব জিনিসের নিজস্ব উৎপাদন অনুপাতে কম আমদানী করা আবশ্যক—যেন দেশের উৎপন্ন

পণ্য বিক্রয় হইতে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। কারণ এইরূপ ব্যবস্থা করা না হইলে এবং তাহার দরুন দেশীর পণ্য বৈদেশিক পণ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী না হইলে একদিকে দেশী শিল্পপণ্যের মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে দেশের কারিগর ও মজুর শ্রমিক বেকার-সমস্যার সম্মুখীর হইতে বাধ্য হয়। এই ভুল আমদানী নীতির ফলে দশীয় কারিগর ও শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমগ্র দেশে কঠিন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অতএব (১) অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে শুধু তাহাই আমদানী করা আবশ্যক, যাহা দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত হয় না। দেশীয় কারখানায় যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে হয় না, উহার আমদানী সীমাবদ্ধ ও পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) এই পণ্যের উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা উচিত যাহাতে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা যথারীতি বজায় থাকে। এবং (৩) দেশীর কারখানায় যেসব দব্য প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়, সে সবের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা কর্তব্য।

## যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানীর ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম সেইসব যন্ত্রপাতি আমদানী চেষ্টা করা বিধেয়, যাহা দেশীয় কাঁচামাল হইতে পণ্যোৎপাদনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রকারের কাঁচামাল আমদানীর জন্যও উৎসাহ দান করা বাঞ্ছনীয়--(১) নিজ দেশে চালু কারখানাসমূহের জন্য যাহা অপরিহার্য, (২) মৌলিক শিল্পোৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, (৩) এবং মৌলিক শিল্পে প্রতিনিয়ত যাহার প্রয়োজন, শিল্প ও কৃষিকার্যের উৎকর্ষ সাধন এবং এতদসংক্রান্ত মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যাহা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

## বিলাস-দ্রব্যের আমদানী

বিলাস-দ্রব্য আমদানী করিয়া দেশের বৈদেশিক মদ্রা হ্রাস করার ন্যায় নির্বোধের কাজ কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সরকারই করিতে পারে না। কারণ ইহাতে ব্যয়িত অর্থ দেশের জনস্বার্থের বিপরীত কাজ করে। জনসাধারণ কখনও বিলাস-দ্রব্য অবাধ ব্যবহার উপযোগী অর্থের মালিক হয় না। যাহাদের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সঞ্চিত হয়, সাধারণতঃ কেবল তাহারাই বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। বর্তমান পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের যুগে শতকরা দুই কিংবা তিনজনের অধিকসংখ্যক লোক ইহা করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই যে দেশ এই ধরনের বিলাস-দ্রব্যের অবাধ আমদানী অনুমতি দেয়, সে দেশ গণস্বার্থ উপেক্ষা করিয়া শতকরা মাত্র তিনজনের জন্যই দেশের মূলধন ব্যয় করে। অথচ এই অর্থ দেশের শিল্পোনয়নের জন্য অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, কাচামাল ও নূতন নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজে এবং দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা দেশে মুষ্টিমেয় বিলাসী লোকের বিলাস-ব্যসনের লিপ্সা পুরনের জন্য ব্যয়িত হওয়া দেশের পক্ষে মারাত্মক, সন্দেহ নাই।

## ব্যবসায়ীর দায়িত্ব

বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে নর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব রহিয়াছে ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ী একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মনীতির কার্যকারিতার জন্য যথেষ্টভাবে সহায়ক ও পৃষ্টপোষাক হইতে পারে। ব্যবসায়ী যদি নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অপরিহার্য প্রয়োজন, জনগণের প্রয়োজন ও মানুষের সাধারণ কল্যাণ সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে—জনগণের কল্যাণ সাধন নিজের ঈমানের অংশ মনে করে, তাহার নিজের স্বার্থের সহিত দেশের গণস্বার্থের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলিয়া যদি প্রতিমুহুর্তে অনুভব করে, দেশের ব্যবসায়ী যদি নিজের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিয়া লয় এবং দেশে ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর করারর জন্য যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তাহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যথাযথভাবেই পালন করিয়া চলে, তবেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইতে পারে।

প্রত্যেটি মানুষই নিজের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার উদ্দেশ্যে অর্থোৎপাদনের জন্য চেষ্টাও শ্রম করে। বস্তুত অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার মূল উৎস এইভানেই নিহিত রহিয়াছে। ফলে প্রত্যেকেই কেবল নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়াই কাজ করে, ইহা অনস্বীকার্য সত্য। এমতাবস্থায় সঠিক কর্মনীতি ইহাই হইতে পারে যে, প্রত্যকেই নিজের স্বার্থ-লাভের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করিবে, কিন্তু এই কাজে কেহই যেন অপরের স্বার্থের কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। কারণ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত গণস্বার্থেরও নিবিড় যোগ রহিয়াছে

একজন কৃষক কেবল নিজের খাদ্য প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই ভূমি চাষ করে না, উৎপন্ন যাবতীয় ফসলই সে নিজের খাদ্য হিমাবে খরচও করে না; অন্যান্য লোক—যাহারা খাদ্যেৎপাদনের পরিবর্তে জীবনযাত্রা নির্বাহের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের খাদ্য-প্রয়োজনও সে উদ্বৃত্ত শস্য হইতে পূর্ণ করে। এইজন্য সমাজের এইসব লোকের স্বার্থহানি করিয়া কোন কাজ করার সুযোগ কিছুতেই কৃষককে দেওয়া যাইতে পারে না। একজন ব্যবসায়ীরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে ব্যবসায়ীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে—যথেস্ট মুনাফা লাভেরও তাহাকে সুযোগ দিতে হইবে; কিন্তু পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার পরিমাণ নিধারণ করার সময় জনগণের প্রয়োজন, ক্রয়-ক্ষমতা এবং দেশের সাধারণ অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত কাজে সর্বতোভাবে দেশবাসীর কল্যাণই শোষণ করার কোন অবকাশই ব্যবসায়ীকে দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস, কিংবা সঞ্চয় করার ফলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া জনগণের শ্রমলব্ধ অর্থ জোকের মত শুষিয়া লওয়ার কোন কৌশলই ইসলাম বরদাশত করে না।

দেশের জন্য কোন প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যদি বিদেশ হইতে আমদানী করা অপরিহার্য হয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্র উহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবে। হয় রাষ্ট্র সরকারী পর্যায়ে এই দ্রব্য আমদানী করিবে, অন্যথায় দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ইহার যথাসম্ভব

সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবে। এমন ব্যবস্থা করিবে, যেন দেশের আইনের বিধিবন্ধন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইহার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে না পারে। তখন একজন খাঁটি ইসলামপন্থী ব্যবসায়ীর কর্তব্য হইবে, তাহার আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যক এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং উভয়ের মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যে, দেশের সম্পদ যেন কোনরূপেই দেশান্তরিত হইতে না পারে। এইরূপ করিতে গেলে যদিও তাহার নিজের মুনাফার পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস পাইবে—ব্যক্তিগতভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; কিন্তু তবুও দেশের পক্ষে তাহাই একমাত্র কল্যাণকর নীতি, সন্দেহ নাই।

## বৈদেশিক বাজার হইতে পণ্য-ক্রয়

বর্তমান সময় সকল প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূল ভিত্তিই হইতেছে সুদ। ইহার ধ্বংসকারিতা ও মারাত্মক প্রভাব এত তীব্র ও সর্বগ্রাসী হইয়া দেখা দিয়াছে যে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদগণও উহার বিলুপ্তির জন্য সুপারিশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীগণ ইহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা বলে যে, সুদ বন্ধ করিলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহা অপরিহার্য। বৈদেশিক বাজার হইতে পণ্য ক্রয় করিলে উহার মূল্য আদায় করার দুইটি স্থান হইতে পারে—প্রথমত, যে দেশ হইতে পণ্য ক্রয় করা হইল সেই দেশের বন্দরেই উহার মূল্য আদায় করা হইবে (Advance payment system)। দ্বিতীয়ত, উক্ত পণ্য ক্রেতার নিজ দেশের বন্দরে আসিয়া পৌঁছার পর মাল খালাস করিয়া লওয়ার সময় আদায় করিবে। প্রথম পন্থা গ্রহণ করিলে, পণ্যের কারখানা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময়ই উহার মূল্য আদায় করিলে সুদ দেওয়া তো দূরের কথা আসল মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার মোটেই আবশ্যই হইবে না। ব্যবসায়ী সম্পূর্ণ সাদাসিধা নীতি গ্রহণ করিবে—পণ্যের মূল্য উহার বন্দরেই আদায় করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ-কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সোপর্দ করিয়া দিবে। জাহাজ কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্য ব্যবসায়ীর বন্দরে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রাপ্য ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ আদায় করিয়া লইবে।

## বিদেশ হইতে পণ্য ক্রয়ে সুদী লেনদেন

কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ীগণ বৈদেশিক পণ্যের বাজারে উহার মূল্য আদায় করার পরিবর্তে সাধারণত তাহার নিজ দেশের বাজারে পণ্য পৌঁছার পর উহা খালাস করিয়া লওয়ার সময় মূল্য আদায় করিয়া থাকে। ফলে তাহাকে পণ্যের আসল মূল্য, ভাড়া ও অন্যান্য খরচ ব্যতীতও। পণ্য মূল্য বিলম্বে আদায় করার কারণে—এই মধ্যবর্তী সময়ের সুদ আদায় করিতে হয়। পণ্যের মোট মূল্যের উপরই এই সুদ ধার্য হয়। ব্যবসায়ীগণ ইহাকে অপরিহার্য উপায় বলিয়া মনে করে। পূর্বেই বলিয়াছি. আন্তর্জাতিক পণ্য ক্রয় ও আমদানী করার প্রথমোল্লিখিত নীতি গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র সুদ আদায় করার দরকার হয় না। কিন্তু তাহারা ইহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। ইহার মূলে একটি কারণ রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এই সুদ ব্যবসায়ীকে নিজের তহবিল হইতে আদায় করিতে হয় না। পণ্যের আসল ক্রয়-মূল্যের উপর অন্যান্য খরচের সহিত এই সুদ ও চাপইয়া দেওয়া হয় এবং মোট ব্যয়িত মূলধনকে ক্রয়-মূল্য হিসাবে ধরা হয়। অতঃপর ইহার উপর আরো অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করিয়া তবে মুনাফা হাসিল করা হয়। এইরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্তমান রীতিতে দেশের অপরিমেয় মূলধন সুদ বাবদ বিদেশে চলিয়া যায় এবং ইহা হয় একমাত্র ব্যবসায়ীর নিজ স্বার্থপর নীতির দৌলতে। কারণ এই মধ্যবর্তী সময়ে তাহার মূলধন দেশী বাজারে মুনাফা লুণ্ঠনের কাজে নিযুক্ত থাকে। এই টাকা যদি পণ্য ক্রয়ের জন্য চলিয়া যাইত, তকে সে এই সময়ের অর্জিত মুনাফা কিরূপে লাভ করিতে পারিত?

কেবল এই অবকাশটুকু লাভ করার জন্যই সাধারণত ব্যবসায়ীরা পণ্য মূল্য আদায় করিতে এতদূর বিলম্ব করে এবং উহার বিনিময়ে জনগণের নিকট হইতে আদায় করা অর্থ হইতে বিপুল পরিমাণ সুদ দিয়া থাকে। এই ব্যবসায়ীগণব্যক্তিগতভাবে মুনাফা লুটিবার জন্য জাতি ও জনগণের অর্থ সম্পদের কি বিরাট ক্ষতি সাধন করিতেছে তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। মোট কথা সুদ না দিয়াও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে এবং ইহার ফলে এক একটি দেশের বিপুল অর্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ ইসলামী রাষ্ট্র সুদ ব্যতীতই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে একান্তই বাধ্য হইবে। 'ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

## আন্তর্জাতিক মুদ্রা

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও বানিজ্য—বৈদেশিক বাজার হইতে পণ্য ক্রয়—হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রার (Exchange currency) সাহায্যে, অন্যথায় পণ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ বিনিময়ের (Bartwr system) মারফতে হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা সাধারণত দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম ষ্টার্লিং আর দ্বিতীয় ডলার। দুনিয়ার কতগুলি রাষ্ট্র ষ্টালিং-এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া থাকে, কমনওয়েলথ কিংবা উহার সমর্থক অন্যান্য দেশ ও রাষ্ট্রের অধিকৃত এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় কতগুলি দেশ ডলারের সাহায্যে আন্তজাতিক ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করিয়া থাকে। আমেরিকা, উহার মিত্র দেশসমূহ এবং সেগুলির প্রভাবাধীন অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত।

## আন্তর্জাতির মুদ্রার গুরুত্ব

একটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি সমর্থিত না হয়, তবে এই দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা অন্যান্য দেশের গোলাম হইয়া থাকিতে বাধ্য। একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বুনিয়াদ যতই মজবুত হউক না কেন, সে অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হয় না। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাই উহার সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেন-দেনের একমাত্র ভিত্তি। অন্যান্য দেশ এই মুদ্রার সাহায্যে মূলধনের আবর্তন ব্যাপারে সাম্প্রতিক বাজারে প্রচলিত সকল প্রকার চালাবাজী করিতে পারে। এই চালবাজী কেবল যে ইসলাম বিরোধী তাহাই নয়, এক একটি দেশের পক্ষে ইহা

স্বভাবতই মারাত্মকও হইয়া থাকে। এইজন্য এইসব দেশের অর্থনৈতিক নীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় এই হইতে পারে যে, যতদিন না উহার মুদ্রা আন্তর্জাতিক বাজরে সমর্থিক হইতেছে, ততদিন বিনিময় নীতিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যাবতীয় লেন-দেন সম্পন্ন করিবে।

## পণ্য বিনিময় (Barter System)

বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক শোষণ-লুণ্ঠন হইতে আত্মরক্ষা করার অন্যতম উপায় হইতেছে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ করা। ইহার পরও যদি কোন দেশের নিকট কিছু প্রাপ্য থকিয়া যায়, তবে উহা সেই মূল্য বাবদ স্বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য বিনিময়ের এই কাজ সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কয়েকটি দেশের পরস্পর চুক্তিবদ্ধ (Clearing Agreement) হইয়া একটি ব্লক গঠন করিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রে জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ রফতানীযোগ্য পণ্য অন্য দেশের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রেরণ করিবে এবং সে দেশ হইতে উহার মূল্য বাবদ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করিবে। যেমন বাংলাদেশ যদি ইরানের নিকট তিন কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে উহার বিনিময়ে তিন কোটি টাকার তৈল গ্রহণ করিবে। তুরস্ক যদি বাংলাদেশের নিকট হইতে দুই কোটি টাকার পাট ক্রয় করে, তবে মূল্য বাবদ সে তিন কোটি টাকার কাচা লৌহ কিংবা লৌহজাহ পণ্য প্রেরণ করিবে। পক্ষান্তরে তুরস্ক যদি বাংলাদেশ হইতে দুই কোটি টাকার পাট ক্রয় করে আর বাংলাদেশ যদি উহার নিকট হইতে তিন কোটি টাকার লৌহ বা লৌহজাত পণ্য আমদানী করে, তবে বাংলাদেশ ইরানের নিকট হইতে গৃহীত তৈলের এক কোটি টাকার পরিমাণে তৈল তুরস্ককে দিয়া পাওনা দেনা সমান করিয়া লইবে। ফলে কাহারো নিকট কাহারো কোন কিছু পাওনা অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা স্বতসিদ্ধ হইতেছে— EXPORT MUST FOR IMPORTS অর্থাৎ যা আমদানী করা হইবে উহার মূল্য আদায় করার মত রপ্তানী হওয়া চাই। এই ভাবে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিনিধি [Trade commisson] প্রেরণ করিয়া বা প্রত্যেক দেশের পক্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত রাসীদূদের মারফতে এইরূপ আন্তর্জাজিক ব্যবসায় অনায়াসেই সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। ফলে কোন দেশে পক্ষেই আন্তর্জাতিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে না এবং বিনা সুদেই আন্তর্জাতিক লেন-দেন ও মার চলাচল সুষ্ঠুরূপেই চলিতে পরিবে।

কোন দেশের উৎপন্ন কৃষিপণ্য বা শিল্প-পণ্যের চাহিদা যদি কম হয়—সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় না হয়, তখন উক্ত প্রকার কৃষি-পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের চাষ করিতে হইবে। যেমন খাদ্যপণ্যের চাহিদা কিংবা তাহাতে মুনাফা কম হইলে তখন নিজ দেশে শিল্পসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনুরূপভাবে এক প্রকারের শিল্পপণ্যের চাহিদা না থাকিলে তখন উহার পরিবর্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের কাজে দেশের কারখানাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মন্দাভাব হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে।

এইক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন সব দেশের সহিত নিজ পণ্য বিনিময়ের চুক্তি করা যেখান হইতে আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে একদিকে যেমন উহার নিজের পণ্য বিক্রয় হইবে, অন্যদিকে উহার বিনিময়ে সে এমন পণ্য লাভ করিবে যাহার চাহিদা দুনিয়ার সর্বত্র না হইলেও অধিকাংশ দেশেই বর্তমান। ইহাতে উহার পক্ষে যথেষ্টভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব হইবে। যেমন একটি দেশের নিকট পেট্রোল রহিয়াছে, বহু দেশই উহার খরীদ্দার। এখন অন্য একটি দেশ উহাকে খাদ্য-পণ্য দিয়া যদি পেট্রোল ক্রয় করে, তবে সে এই পেট্রোল হইতে যথেষ্ট মুনাফা লাভ করিতে পারে।

পণ্য বিনিময়ের এই রীতির বহুল প্রচার হইলে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এই অনুসারে ব্যাপকভাবে কাজ হইতে শুরু করিলে উহার ফল নানা দিক দিয়াই কল্যাণকর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথম ফল এই হইবে যে, যেসব শক্তিশালী দেশ নিজেদের আন্তর্জাতিক মুদ্রার একচেটিয়া কর্তৃত্বের দরুন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে শোষন করিতেছে এই শোষন এবং অর্থনৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার দরুন অনেকগুলি দেশ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার এবং আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। মুদ্রা মুলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যাই আবিস্কৃত হইয়াছে, শোষন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা শেষোক্ত কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত উপায় অনুসারে আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় যদি মুদ্রা ছাড়াও সম্ভব হয় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যকে যদি জাতীয় শোষন-পীড়ন ও গোলামীর বন্ধন হইতে মুক্ত করা যায় তবে আর ইহার প্রয়োজনই থাকিবে না। বস্তুতঃ মুদ্রাই তো আসল লক্ষ্য নয়, প্রকৃত হইতেছে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা বিধান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যদি এই মুদ্রা ছাড়াও সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে, তাহা হইলে ইহা লইয়া কাহারো গৌরব করার অবকাশ থাকিবে না।

## আন্তর্জাতিক মুদ্রার ক্ষতি

কোন দেশ যদি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য এমন মুদ্রার সাহায্য গ্রহণ করে, যাহা ভিন্ন কোন দেশের মুলধনের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল, তবে এই দেশ উহার সম্মুখে কোনদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। কারণ সেদেশ সব সময়ই নিজের সকল প্রকার ক্ষতি লোকসানের বোঝা এই দেশের উপরই চাইয়া দেব। পাকিস্তানের ইতিহাস হইতে একটি ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখযোগ্য। বিগত মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত পরিস্থিতি যখন ব্যাংক অব ইংলন্ডের উপর যাবতীয় বোঝা চাপাইয়া দিল তখন উহা মুদ্রা মান হ্রাস করিতে বাধ্য হইল। আর এই মুদ্রামান হ্রাসের পরিণামে পাকিস্তানের পাওনার এক তৃতীয়ংশ সঙ্গে সঙ্গে ও আদায় না করিয়াই– বাতিল করিয়া দিল। এমতাবস্থায় পরিস্কার বলা চলে যে, এই নীতি ও উক্ত মুদ্রার মর্যাদা সমর্থন করিয়াও একটি দেশ যদিও রাজনৈতিক গোলামীর বাঁধন ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক গোলামীর নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা উহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না। আর প্রকৃত পক্ষে উক্ত মুদ্রার সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত সে দেশের আজাদী স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না।

# পারস্পকি সাহায্য সংস্থা

অস্বাভাবিক ও চরমবাদী অর্থনীতির একদিক হইতেছে পরিপূর্ণ ব্যষ্টিবাদ এবং অপর দিক হইতেছে, নিরংকুশ সমষ্টিবাদ (collectivism) এই উভয় চূড়ান্ত সীমারে মধ্যে মধ্যপন্থী যে নীতি একটি সুস্থ ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইতেছে পাম্পরিক সাহায্য সংস্থা। বর্তমান সময়ে দুনিয়া পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই নামের বহু সংস্থার বাস্তব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং উহার ফলাফলও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সাহায্যে বহুবিধ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং জনগণের জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা খুব জহজ হইয়া থকে।

কি পুঁজিবাদী সমাজে, কি সমাজতান্ত্রিক সমাজে—যেখানেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বত্রই নিছক বস্তুবাদী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীই হইতেছে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর। কোন না কোন বৈষয়িক স্বার্থলাভই ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। জীবনে সর্বদিকে প্রভাবশীল কোন নৈতিক আবেদনই উক্ত সমাজের ব্যক্তিগণকে পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে নাই।

কিন্তু ইসলামী সমাজে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিছক পার্থিব স্বার্থকেই ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়না। সেখানে নৈতিক, আধ্যাত্মিক–তথা মানবিক ভাবধারাই হইবে উহার সর্বপ্রধান নিষামক পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার অনুকূল ভাবধারা সৃষ্টির ব্যাপারে কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ই এখানে অবলম্বনকরাহয় না, বরং সমাজের ব্যক্তিদের হৃদয় মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই বাবধারা ফুটিয়া উঠে এবং রাষ্ট্রশক্তির আনুকুল্যে ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী সমাজ যেসব মতবাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত, তাহা স্বতঃই মানুষের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া দেয়। এক আল্লাহর বান্দাহ আমরা, এক আদমের সন্তান আমরা,আমাদের এই জীবন কঠিনত পরীক্ষার জীবন, যতদূর সম্ভব পরবর্তী অনন্তকালের জন্য কল্যাণের পুঁজি সংগ্রহ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনন্তর আমাদিগকে একই আদালতের নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে—এই বিশ্বাসই ইসলামী সমাজের বিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে গভীর ঐক্য, বন্ধুত্ব সহনুভূতিও সহৃদয়তার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত করে।

ইসলামী জীবনধারা মূলতই সামাজিক ও সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এই সমাজের কোন ব্যক্তিই নিজেকে একাকী ও নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে করে না। প্রত্যেকেই নিজেকে

অসংখ্য লোকের একজন এবং প্রত্যেকের জন্য দায়ী বলিয়া অনুভব করে। ইসলামের প্রায় সকল ইবাদাত অনুষ্ঠানই জনগণের মধ্যে এই ভাবধারা প্রতিনিয়ত শক্তিশালী করিয়া তোলে। মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক যে কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা এই ভাবধারা অধিকতর দৃঢ় করিয়া দেয়।

আধুনিক শিল্পনীতি পুঁজিদার ও শ্রমিক-মজুরদিগকে দুইটি স্থায়ী ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সম্পন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত করিয়াছে। ইহার প্রকৃতি ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী সমাজের কোন অর্থশালী ব্যক্তি মুনাফা লূণ্ঠনকেই নিজ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

## পুজি ও শ্রমের সংঘর্ষ প্রতিরোধ

বরং নিজের যাবতীয় অর্থ-সম্পদকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করাকেই সে মূলধনের সার্থক প্রয়োগ বলিয়া মনে করে। দেশের শ্রমিক মজুরদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করিবে। একক কারখানার প্রচুর উৎপাদন কত মানুষকে বেকার সমস্যার সম্মুখীন করিতেছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন দেশের রাষ্ট্র-সরকার কি কি জটিলতা বিব্রত হইয়া পড়িতেছে, এবং সমষ্টিগত শান্তি ও সমৃদ্ধি কতখানি ব্যহত হইতেছে—ইসলামী সামাজের প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই এই দিকে গভীর দৃষ্টি রাখিয়া এবং ইহার প্রতিবিধানমূলক পন্থা অবলম্বন করিয়াই তাহার পুঁজি বিনিয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ করিবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক স্থৈর্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে শ্রমিক-মজুর রাষ্ট্রসরকার ও দেশবাসীর সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

বস্তুত এই পটভূমিকার ভিত্তিতে ইসলামী সামাজের প্রত্যেক শিল্প এলাকায় পারস্পরিক সাহায্যের এমন একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে কারখানা মালিক, শ্রমিক ও রাষ্ট্র সকারের প্রতিনিধি সকলেই শরীক থাকিবে। অর্থনীতিতে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ কয়েকজন লোককেও পরামর্শদাতা হিসাবে এই সংস্থায় নিযুক্ত করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হইবেঃ

(ক) শ্রমিক মজুরের যাবতী অভাব-অনাটন, সমস্যা ও জটিলতা দূর কার, তাহাদের প্রয়োজন ও দাবি দাওয়া পূরণ করা।

(খ) দেশে বেকার-সমস্যও ব্যবসায়ে মন্দভাব সূচিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করা।

(গ) ব্যবসায় সংক্রান্ত বিপর্যয় (Trade cycles) প্রতিরোধের জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(ঘ) স্বয়ং কারখানা-মালিককে পণ্য রপ্তানী বা কাঁচামালের আমদানীর ব্যাপারে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করা।

(ঙ) সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য রাষ্ট্র সরকারের উপর যেসব দায়িত্ব চাপিয়া বসে, তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করা।

শিল্প প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণকারী কোন লোকের কোনরূপ অসুবিধার বা সমস্যার সৃষ্টি হইলে তাহা লইয়া হৈ চৈ করা, ধর্মঘট করা বা অন্য কোনরূপ অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই ই প্রতিষ্ঠান উহার অভিযোগ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। মজুর-শ্রমিকদের বেতন ও কাজের সময় সংক্রান্ত অসুবিধা, কারখানা মালিকের কারবারি অসুবিধা ও ট্যাক্সের বোঝা, বৈদেশিক পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতার সমস্যা, রাষ্ট-সরকার ও শিল্পসংক্রান্ত কোন প্রতিকূলতা প্রভৃতি পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু অন্তঃসারশূন্য নিয়মতান্ত্রিক শক্তিরই ধারক হইবে না, নৈতিক আবেদনের শক্তিও উহার অর্জিত থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠান পরিপূর্ণ সহনুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত সমগ্র ব্যাপারের দতন্ত করিবে, অশান্তির মূল কারণ নির্ধারণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। বিশ্বাসঘাতকতা, সকল প্রকার দুর্নীতি ও শোষণ-পীড়নের তত্ত্বানুসন্ধান করিবে এবং এইভাবে যাবতীয় অশান্তি, বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক সমস্যার পথ রুদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা ও পথ-নির্দেশ করিবে।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতাকে স্থায়ী ও সার্বজনীন কল্যাণকর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারেঃ

১. এই সংস্থা ব্যবসায়ের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং যুক্ত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার করিবে। এই কারবারে শ্রমজীবগণও যাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অবাধ সুযোগ করিয়া দিবে। মিলিত অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে চালু ব্যবসায়ে শ্রমিকদিগকে বাৎসরিক হিসাবে এক একটি শেয়ার অর্ধমূল্যে ক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। আর বাকি অর্ধেক মূল্য কোম্পানী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোনাস হিসাবে শ্রমিকের নামে আদায় করিবে। অথবা প্রত্যেক শ্রমিকের মাসিক বেতন হইতে সামান্য পরিমাণ অর্থ জমা করা হইবে। এইভাবে বৎসরের শেষে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইবে, তত পরিমাণ টাকা স্বয়ং কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান নিজের তরফ হইতে দিয়া উহার সহিত যোগ করিবে। এবং এই মোট টাকা দ্বারা শ্রমিকের জন্য মূল্য ব্যবসায়ের একটি অংশ ক্রয় করা হইবে। এই পন্থানুসারে একজন শ্রমিক একাধারে দশ বৎসরকাল কাজ করিয়া ২৫টি স্থায়ী শেয়ার লাভ করিতে পারে। এই শেয়ারসমূহ তাহাকে এবং তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে বহুদিন পর্যন্ত মুনাফার অংশ দিতে পারিবে। এই কাজে ইসলামী রাষ্ট্র ও উহার যাকাত ফান্ড হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া শ্রমিকদিগকে স্বাবলম্বী হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দিতে পারে।

এই পন্থায় কাজ করিলে ধীরে ধীরে একটি প্রতিষ্ঠানে পুঁজিদার ও শ্রমিকের স্বার্থ সমান ও সংযুক্ত করিয়া তোলা খুবই সহজ হইয়া পড়িবে। ফলে অসহায় মজুরদের শোষণ-নিষ্পেষণ করার, ছাটাই করার কিংবা বেতন হ্রাস করার মত কোন বিপদে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করার কোন সুযোগই কেহ পাইবে না।

২. এমন কারখানা ও এই সংস্থার পক্ষ হইতে স্থাপিত করা যাইতে পারে, যাহার বিভিন্ন কর্মচারীই হইবে উহার আসল অংশীদার। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত হইতে একটি

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যদি প্রত্যেক বৎসরই এই পারস্পরিক সাহায্য সংস্থায় নিযুক্ত করার জন্য দান করে, তাব তাহাতে আরো অধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৩. দেশের সমগ্র শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবীদিগকে সকল প্রকার আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যবস্থাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারিবেঃ

(ক) মজুর ও চাকুরীজীবীদের বেতন হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাসিক চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

(খ) কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী কিংবা সরকার যে মজুরদিগকে খাটাইতেছে, সে-ই উল্লিখিত পরিমাণ বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ কিছু অর্থ মজুরদের উক্ত ফান্ড প্রতি মাসে জমা করিয়া দিবে।

(গ) কারখনা মালিক, ব্যবসায়ী কি রাষ্ট্র-সরকার কোন কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিলে একমাসের বেতন পরিমাণ অর্থ তাহার নামে এই ফান্ডে জমা করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে। ইহার ফলে মজুর ছাঁটাইর বর্তমান হার অনেটা হ্রাস পাইবে।

(ঘ) যাকাত ফান্ডের বাৎসরিক বাজেট হইতে একটি বিরাট অংশ এই ফান্ডে জমা করিতে হইবে।

(ঙ) শিল্পোৎপাদনের জন্য যে কারখানাই স্থাপন করা হইবে, উহার উৎপাদন শক্তির হার অনুযায়ী মালিকের প্রতি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাঁদা ধার্য করা যাইতে পারে। তাহা সরাসরি বেকার সমস্যা দূরীকরণ ফান্ডে জমা হইতে থাকিবে। অবশ্য এই চাঁদা ধার্যকরণ সরকারী বাধ্যবাধকতা ব্যতীত নিছক নৈতিক ও মানবিক আবেদনের মারফতেই করিতে হইবে।

এই ফন্ড হইতে বেকার শ্রমজীবীদিগকে দুরাবস্থা ও বিপদকালে কেবল বৃত্তিই দেওয়া যাইবে না, ইহা হইতে দেশে গাহস্থ্য-শিল্পের একটি ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া বেকার লোকদিগকে উপর্জনশীল করিয়া তোলাও অনেক সহজ হইবে।

এই সংস্থার পক্ষ হইতে বিভিন্ন এলাকায় কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা যাইতে পারিবে। সেখানে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট ও সরকারী অফিসাদী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত থাকিবে।

৪. এই সংস্থার অধীন এমন একটা সাধারণ ফান্ড সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে, যাহাতে দেশের শিল্পপতিগণ নিজ নিজ শিল্পগত মুনাফার একটা নির্দিস্ট অংশ জমা করিবে এবং সরকার ও যাকাত ফান্ড হইতে তাহাতে সাহায্য দান করিবে। এই ফান্ড একান্তভাবে নিযুক্ত হইবে দেশের শ্রমিক-মজুর ও সাধারণ মেহনতী জনতার জীবন-মান (খাদ্য, বসবাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) উন্নত করার জন্য। সকলের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ীই এই কাজ সম্পাদন করা হইবে।

## কারবারী ইন্সিওরেন্সের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা

ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পপতিকে আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করার জন্য পুঁজিবাদী সমাজে ইন্সিওরেন্স বা বীমা কোম্পানী স্থাপন করা হয়: কিন্তু ইহাতে সুদ ও জুয়ার প্রাধান্য থাকায় উহার মূল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ইসলামী সমাজে 'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার' মারফতেই এই উদ্দেশ্য হাসিল করা যাইতে পারে, কিন্তু সুদ ও জুয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ তাহাদের থাকিবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেক শহরেই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য এক একটি সংস্থা গঠন করিবে। ইহার একটি ফান্ড থাকিবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের মোট মূলধন হিসাবে কিংবা আমদানীর হার অনুযায়ী মাসিক কি ত্রৈমাসিক নিয়মে টাকার একটি পরিমাণ আকস্মিক বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য এই ফান্ডে জমা করিবে এবং মূলত ইহা তাহার দান হিসাবেই গণ্য হইবে। অতঃপর এই সংস্থার কোন সদস্যের আমদানীর উপর Source of income যদি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া যায়, তবে পুনরায় ব্যবসায় শুরু করিবার জন্য এই ফান্ড হইতে তাহকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এককালীন দান হিসাবে মূলধন দেওয়া হইবে। এক বৎসর কালের মধ্যে এই ফান্ডকে উক্ত রূপ যত সাহায্য দানই করিতে হইবে কার্যত তাহাতে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা সঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভবনা রহিয়াছে। ফলে এই ফান্ড ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া বিপদগ্রস্ত লোকদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। এই ফান্ডের অর্থ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়েও বিনিয়োগ করা যাইতে পারিবে। তাহাতে উহার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য অন্য এক উপায়ে লাভ তরা যাইতে পারে। তাহা এই যে, এই সংস্থার প্রত্যেক সদস্য উহার ফান্ডে যে টাকাই জমা করিবে, সে নিজেই উহার মালিক হইবে এবং আকস্মিক বিপদকালে নিয়ম অনুযায়ী তাহা হইতে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণ করিবে। এই ঋণ তাহাকে সুযোগ সুবিধা মত এক দিন আদায় করিতে হইবে।

পারস্পরিক সাহায্যের এই স্থানীর সংস্থাসমূহকে মিলাইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা যাইতে পারে। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে এই কাজ সমগ্র দেশব্যাপী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

## স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ী ঋণের ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাংকসমূহকে সুদশূন্য করিয়া দেওয়ার পর স্বল্পমেয়াদী ঋণ সম্পর্কে বিশেষ সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিশেষতঃ

(ক) বিলসমূহের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পাইতে হইলে তখন,

(খ) এবং শিল্পপণ্যের আমদানী কিংবা কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য সাময়িক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য টাকার দরকার হইলে তখণ।

কিন্তু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের 'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা' হইতে এই সব স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজন সুষ্ঠুরূপে পূর্ণ হইতে পারে এইভাবে। যে এই ফান্ডের টাকা

ইসলামী নিয়মানুসারী কোন ব্যবসায়ী ব্যাংকে জমা রাখা হইতে এবং প্রয়োজনের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফতে ও উহার জামিনে—অথবা নিজেই যদি উহা হইতে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ গ্রহণ করিতে চাহে, তবে এই ব্যাংক উহার "বিনাসুদে ঋণ দানের" ফান্ড হইতে ঋণ দান করিবে।

## যৌথ কৃষিকার্যের জন্য পারস্পরিক সাহায্য

এক এলাকার সমস্ত ভূমি-মালিক ও কৃষকদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য উল্লিখিতরূপে স্থানীয় ও দেশীয় ভিত্তিতে "পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা' গঠন করা আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠান দেশের সরকার, ভূমি মালিক এবং বিশেষ করিয়া চাষীদের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইসব সাধারণ প্রয়োজন ব্যতীত যৌথ কৃষিকার্যের জন্য পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

এক এলাকার দুই-চারশত ভূমি-মালিক ও কৃষক মিলিয়া একটি সংস্থা স্থাপন করিতে পারে। তাহারা সকলেই এলাকার সমস্ত জমি-ক্ষেত এই সংস্থার নিকট অর্পণ করিবে এবং নিজ নিজ অংশের জমির হার অনুযায়ী একটি যুক্ত ফান্ড সংগ্রহ করিবে। এই ফান্ডের অর্থ সাহায্যে ব্যাপক ও উন্নত শ্রেণীর কৃষিকার্য শুরু করিতে পারিবে। পারস্পরিক সাহায্যের এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে কৃষিকার্যের বাস্তব সমস্যার সমাধান, কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন এবং শক্তি উর্বরা বর্ধনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তথ্যপূর্ণ পুস্তক ও প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

এই এলাকায় যাহাতে বেকার সমস্যা দেখা না দেয় এবয় জনগণ কোনরূপ অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেদিকে এই সংস্থাকে বিশেষ কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রীতিমত ও সুস্পষ্ট প্ল্যান ও পরিকল্পনা অনুযায়ীই ইহা এক একটি এলাকায় কাজ শুরু করিবে। প্রথমে কৃষিজীবীদের জন্য কাজ সংগ্রহ করিবে, তাহাদিগকে যান্ত্রিক কৃষিকার্যের জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।

এই সংস্থার নিকট যেসব জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা যথারীতি বজায় থাকিবে, কিন্তু যৌথ কৃষিনীতির ফলে সেই মালিকানা ভূমির নির্দিষ্ট খন্ডের উপর স্বীকৃত না হইয়া সেই পরিমাণ জমির ফসলের উপর, কিংবা যৌথ ফার্মের মোট উৎপন্নের নির্দিষ্ট অংশের উপর স্বীকৃত হইবে। প্রয়োজন হইলে সে নিজের অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে এবং তাহার মৃত্যুর পর মীরাসী আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাহার অংশ বন্টন করা হইবে। অন্য কথায়, সমগ্র জমি-মালিকানা কেবল কাগজে কলমে ও হিসাবের খাতায়ই স্বীকৃত ও কার্যকর হইবে।

## কৃষিসংক্রান্ত দুর্ঘটনার প্রতিরোধ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র অপেক্ষা কৃষিক্ষেত্রে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কাজেই উহার মুকাবিলা করিবার জন্য অনুরূপবাবে সমস্ত অব্যবস্থা, জুয়া ও সুদ

প্রভাবিমুক্ত 'ইন্সিওরেন্স'—'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা' স্থাপন করা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়নে, এলাকায় ও গোটা দেশে পারস্পরিক সাহয্য সংস্থার অধীন এক একটি ফান্ড স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই ফান্ডে প্রত্যেক ভূমি-মালিকের আয় কিংবা মালিকানা হিসাবে প্রত্যেক ফসল হইতে চাদা জমা করা হইবে এবং কৃষিসংক্রান্ত প্রত্যেক দুর্ঘটনায়ই এই ফান্ড সাহায্য করিবে।

এই ফান্ড এক স্থায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবেও কাজ করিতে পারে এবং তাহাতে যাহা কিছুই দেওয়া হইবে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে দান' হিসাবেই দেওয়া হইবে। আর তাহা হইতে যাহা কিছুই ব্যয় হইবে, তাহা ঋণ হিসাবে নয়, এককালীন দান হিসাবেই খরচ করা হইবে। রাষ্ট্র-সরকার যাকাতের অর্থও এই ফান্ডের মারফতের ব্যয় ও বন্টন করিতে পারিবে।

## কুটিরশিল্প প্রসারকল্পে সাহায্য সংস্থা

গার্হস্থ্য কিংবা কুটির শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা না করিয়া কোন সমাজই উন্নতি করিতে এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতা লাভ করিতে পারে না। ইসলামী সমাজেও ইহার প্রতি বিশেৃ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে এবং ইহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা স্থাপন করা হইবে এবং বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত শিল্পগুলিকে গার্হস্থ্য পর্যায়ে সুসংগঠিত করা হইবেঃ

(১) কার্পাস, সূতা, বস্ত্র ও চট শিল্প, (২) চর্ম শিল্প, (৩)পশম শিল্প, (৪) দেশী ঔষধ প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি।

গার্হস্থ্য শিল্পের উৎকর্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১. যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিদন্দ্বিতায় উহার সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

২. শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা।

৩ কাচা মাল সংরক্ষণ।

৪. পুঁজি সংগ্রহকরন।

এইসব সংস্থায় শিল্পোৎপাদনকারী, কাঁচামাল উৎপাদনকারী এবং বাজারে খুচরা ও পাইকারী হিসাবে বিক্রয়কারীদের শরীক হওয়া আবশ্যক।

## অভাবী লোকদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা

প্রকৃত অভাবী লোকদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য অনতিবিলম্বে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করা একান্তই অপরির্হায—

১. বহু চেষ্টা ও সন্ধান করিয়াও যাহারা কাজ পায় না বলিয়া বেকার হইয়া আছে।

২. অক্ষম ও পঙ্গু লোক—অন্ধ, বধির, বোবা, অঙ্গহীন এবং অসহায় শিশু ও বিধবা।

ইসলামী রাষ্ট্রের বেকার নাগরিকদিগকে উপার্জনের কাজে নিযুক্ত করা রাষ্ট্র-সকারের দায়িত্ব। ইসলামী সরকার সেজন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবে।

কিন্তু ব্যক্তিগত সাহায্য ও সরকরী-বেসরকারী প্রচেষ্টার পর ও যদি কিছু সংখ্যক লোক বেকার থাকিয়া যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-সরকার তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু তাহাদিগকে বিনা কাজে বসাইয়া না রাখিয়া এবং নিছক দান হিসাবেই জীবিকা না দিয়া তাহাদিগকে কোন না কোন পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে একটি সংস্থার অধীন সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে কোন কৃষি সম্বন্ধীয়, শৈল্পিক কিংবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

আর কোন বৃহত্তর কাজে নিযুক্ত হওয়া একান্তই অসম্ভব হইলে অন্ততঃপক্ষে দেশের অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ বাঁধা পুল তৈয়ার করা, অনুর্বর ও অনাবাদী জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উর্বর ও আবাদ করা, বন-জংগল কাটিয়া পরিষ্কার করা, খাল ও পুকুর খনন করা, প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

## পারস্পরিক সাহায্য সংস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

পারস্পরিক সাহায্যের উপরোল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে গণজীবনের পূর্ণ শৃংখলা ও সংগঠন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালু করা এবং সেগুলিকে পারস্পরিক সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল করিয়া তোলা প্রথমত একটি উন্নতিশীল ও শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র ভিন্ন আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত ইসলামী রাষ্ট্রকেও এই দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করার জন্য ইসলামের মূল নীতি অনুযায়ী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে।

১.পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার সূচনা ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ,

২.জনসাধারণ ও দেশের বিশিষ্ট লোকদিগকে 'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা' সংগঠনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব ও পরামর্শদান এবং আরব্ধ কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ কায়েম করা।. ৩. এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা।

৪. এই কাজ যথোপযুক্তভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আইন-কানুন ও নিয়ম-প্রণালী রচনা করা।

৫. পারস্পরিক সাহায্য সংস্থায় ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা প্রসারের জন্য অনুকূল মানসিক ও নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

বর্তমান যুগে অতি আধুনিক মান অনুযায়ী একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য 'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা'র এই পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া তোলা অপরিহার্য। ইহা আমাদের ছাট-বড়—অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মারাত্মক আক্রমণ হইতেও ইসলামী সমাজকে রক্ষ করিতে পরিবে।

# জনসংখ্যা সমস্যা

পৃথিবীর লোকসংখ্যা তীব্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র উপমহাদেশের লোকসংখ্যা বৎসরে গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের আদমশুমারীতে গোটা উপমহাদেশের লোকসংখ্য ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ ধরা হইয়াছিল, ১৯৪১ সনের আমশুমারীতে ৩৯৮ কোটি ৯০ লক্ষে দাড়াইয়াছি। সম্প্রতি এক হিসাবে প্রকাশ, আগামী ৩০বছরের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাড়াইবে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া আগামী ৩০ বছরে ৬০০ কোটিতে পরিণত হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে এক বছরে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা যে কি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্য ছিল ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ১৭ হাজার। ১৯৫৪ সনের ১লা এপ্রিল উহা ১৬ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজারে পরিণত হইয়াছে। এক বৎসরে ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার লোক অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ১.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।[১] বাংলাদেশ এলাকায় ১৯৫৭-৫৮ সনে প্রতি বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী ২৫ বৎসরে এখানে এক কোটির অধিক লোক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধারণা করা যাইতেছে। বর্তমানে কঠিন সংকটের সাবধান বাণী হিসাবে বলা হইতেছে যে, বর্তমান বৃদ্ধিহার অব্যাহত থাকিলে আগামী ২০০৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২৩ কোটি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমিক হার এবং উহার তীব্রতা সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা করা চলে।

লোকসংখ্যার এইরূপ বৃদ্ধিতে দুনিয়ার এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদদের মনে বিশেষ আতংকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা মনে করিতেছেন যে, লোকসংখ্য বৃদ্ধির এই তীব্রতা বন্ধ করা না হইলে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে এবং বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া দেখা দিবে। তাহাদের মতে, প্রত্যেক দেশেই আহরণযোগ্য সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা যদি এমন এক অবস্থায় পৌছায়, যখন দেশবাসীর মাথাপিছু সাচ্ছল্যসূচক পরিমাণে পণ্যোৎপাদান সম্ভব হয় না, তখন সেখানে লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি (over population) ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যে দেশেই এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, সে দেশের জনগণকে নিশ্চিতরূপেই কঠিন খাদ্যসমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, সে দেশে চরম অর্থনৈতিক

১. দৈনিক আজাদ, ১১ই মে, ১৯৫৪

বিপর্যয় দেখা দিবে এবং অধিবাসীগণ অনাহারে মৃত্যুবরণ কিংবা খাদ্যাভাবে ও অর্ধাহারে নিদারুণ কশ ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। কাজেই এই শ্রেণীর অর্থনীতিবিগণ বিশ্ববাসীকে এই আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ইহারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্ববাসিকে কেবল সাবধান করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করারর, আসন্ন বিপদ পূর্বাহ্নেই প্রতিরোধ করার পন্থাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন,জনসংখ্যা বৃদ্ধির কঠিন ও সর্বাগ্রাসী বিপদ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথকেই বন্ধ করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা ও কার্যকর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই তীব্রগতি ব্যাহত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্বেই যাহারা পৃথিবীতে আসিয়া সজল প্রকার চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা জীবনকে পরিতৃপ্ত ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছে, অতঃপর অধিকসংখ্যক লোক আসিয়া যেন তাহাদের এই একচেটিয়া ভোগ-বিলাসের ভাগীদার হইতে না পারে, কিংবা তাহাদের এই সুখময় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে না পারে—ইহাই হইতেছে তাহাদের মনোভাব। অতএব সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথ নিশ্চিতরূপে বন্ধ করা তাহাদের মতে একান্তই অপরিহার্য।

জনসংখ্যাকে পরিমিত করিতে হইলে কার্যকর প্রতিরোধমূলক পন্থা গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্যথায় প্রকৃতি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ভিতর দিয়া নাকি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। নিম্ন লিখিত পন্থা বা অবস্থা সমূহ লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে বিশেষ কার্যকর হয় বলিয়া অর্থনীতিবিদগণ মত প্রকাশ করিয়াছে—(ক) বিবাহিত লোকের স্বল্পহার, (খ) দুর্বল প্রজনন শক্তি, (গ) সন্তান ধারণকালের দীর্ঘ মেয়াদীতা, (ঘ) সআবমী-স্ত্রীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস, (ঙ) কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ, (চ) সামাজিক বিধিব্যবস্থা, শিশুমৃত্যুর আধিক্য ইত্যাদি।

উল্লিখিত অবস্থা বিরাজিত এবং প্রতিষেধক পন্থাগুলি চালু না থাকিলে সমাজে অস্বাভাবিকরূপে অধিক সংখ্যক লোক বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া অর্থনীতিবিদগণ ধারণা করেন। অতএব, তাহাদের মতে এইরূপ জনসংখ্যা সমাজের পক্ষে অচিরেই মারাত্মক হইয়া দেখা দিতে পারে।

## ম্যালথুস ও অন্যান্য পন্ডিতদের মতবাদ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতিকে ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথুস (Malthus) দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "AN Essay on the principle of population as it affects the futureimprovement of society "নামে একখানি বই লিখিয়া সারা পৃথিবীকে জানাইয়া দিলেন, পৃথিবীতে যে অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অনুপাতে খাদ্য অনেক কম পরিমাণই উৎপাদিত হইতেছে। তাহার

মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (Geometrical progression) আর খাদ্যসামগ্রী বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmetial progression) ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪—এই ধারাকে জ্যামিতিক হার বলা হয়। আর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭—এই ধারাকে বলা হয় গাণিতিক হার। তিনি দেখাইতে চাহিলেন যে, জনসংখ্য খাদ্য-সামগ্রীর তুলনায় অধিক তীব্রগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর এত বেশী জনসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে পৃথিবী অক্ষম বিধায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যই নিয়ন্ত্রত করিতে হইবে। এই কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় মতবাদ ও পন্থার মধ্যে তাহার মত ও পন্থা পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ম্যালথুসের মতে, জনসংখ্যা তখনি একটা সমস্যা হইয়া দেখা দেয়, যখন খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণের তুলনায় লোকসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তিনি বলিয়াছেন, সাধারণত কোন দেশের অন্নসংস্থানের সীমানা হিসাবে সেই দেশের জনসংখ্যা নির্ধারিত হইয়া থাকে, জনসংখ্যা সীমা অতিক্রম করিলেও দেশে তদনুপাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না এবং শেষ পর্যন্ত বিপদগ্রস্থ জনসাধারণ ন্যায়-অন্যঅয় নির্বিচারে যে কোন উপায়েই হউক না কেন—দেশের লোকসংখ্যা ও অন্নসংস্থানের সুযোগের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে।

ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইস্‌ম্যানের মতেও লোকসংখ্যা পরিমিত করিতে না পারিলে কোন দেশে জনকল্যাণমূলক কোন বৃহত পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি ভারত সরকারকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধিবিধান অবলম্বন ও বিভিন্ন স্থানে সরকারী ক্লিনিক স্থাপনে উদ্যোগী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ভারত সরকারও সম্প্রতি এই কাজে খুবই উৎসাহিত হইয়াছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রনের অনুকূলে জনমত গঠন করিবার জন্যও কয়েকজন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য Family planning Research and programme Commitee নামে একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে।

## অর্থনীতির দৃষ্টিতে ম্যালথুসের মতবাদ

কিন্তু আদর্শবাদ ও বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে বিচার করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, ম্যালথুসের মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল এবং তাহার প্রদর্শিত পন্থা মানবতার পক্ষে মারাত্মক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ম্যালথুসের ধারণা যে ভুল, তার বহু পূর্বেই তাহার সহযোগী অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণই প্রমাণ করিয়াছেনন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহার বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধি পায় ক্রমিক সংখ্যার অনুপাতে। এবং মানব বংশের সংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজন পূর্ণ করার দ্রব্যসামগ্রীই অধিকতর তীব্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যপণ্য উৎপাদনের ক্রমশ বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। শুধু তাহাই নয়, ম্যালথুসের এই মত আধুনিক শিল্প বিপ্লব ও অর্থোৎপাদনের নাবাবিস্কৃত পথ ও পন্থা উদ্ভাবিত হওয়ার বহু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি কেবল জমিকেই অর্থ ও খাদ্যোৎপাদনের একমাত্র উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর যুগ তখনো শুরু হয় নাই। ইহাতো উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

ভূমিকাকেও কোন গুরুত্ব দেন নাই। কাজেই বর্তমান শিল্প ব্যবসা'র প্রেক্ষিতে ম্যালথুসের মত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। বস্তুত অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে বর্তমান জনসংখ্যা কোন সমস্যা-ই নয়। এখনকার সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল সম্পদ বন্টনের।

বস্তুত 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা' কথাটি একান্তই আপেক্ষিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্য পরিস্থিতির মধ্যে সহজেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। অধ্যাপক ক্যানান ইহাকেই বলিয়াছে optimum populatiou অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যা।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পৃথিবীতে খাদ্য-সামগ্রী মওজু নাই বলিয়া দাবি করা মূলতই ভুল। প্রকৃতপক্ষে জমির বুকে বিশ্বস্রষ্টা এত বেশী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য এবং সব মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার উপযোগী সামগ্রী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুকাল পূর্বে বৃটেনের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা ডক্টর পি. ডি. সুখাতমি বৃটেনের রয়াল স্ট্যাটিষ্টক্যাল সোসাইটির নিকট জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানর ক্রমবিকাশ এবং উৎপাদনের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। সে কারনে কোন সময়ই পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যোপাদনের হারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। অর্থাৎ প্রতি বৎসর পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি খাদ্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডক্টর সুখাত্মি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ১৯৮০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা যাহা দাড়াইবে তাহার চাহিদা মিটাইতে হইলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং ২০০০ সালে তিন গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।—এই কথায় মাথা চক্কর দেওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা ঐ পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বছরে খাদ্যেৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে শতকরা ৩ ভাগেরও কম। আর উহা অসম্ভব হওয়ার কোন কারণ নাই। কিছুদিন পূর্বে এক ইংরেজী পত্রিকায় R.G. Hainsworth এর লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল How many people can earth feed —লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উৎপাদনী ক্ষমতা, জমির প্রকার-ভেদ, পানিসেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর উপসংহারে সিদ্ধান্তস্বরূপ লিখিয়াছেনঃ

'উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুসারে একথা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় যে, গোটা পৃথিবীর সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের যোগ্যতা রহিয়াছে। যে যাহাই হউক, দুনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমান এবং মাটির খাদ্যোৎপাদক ক্ষমতা ও উৎপাদন প্রণানীল উৎকর্ষ সাধন করিলে পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার তিনগুণ বেশী অধিবাসীর জন্য বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও পরিতৃপ্তিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা খুবই সহজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আর লোক-বৃদ্ধির বর্তমান

ক্রমিক হার যদি স্থায়ী ও অব্যাহত থাকেও তবুও উল্লিখিত সংখ্যা পর্যন্ত পৌছিতে অন্তত একটি শতাব্দী লাগিবে।

এতদ্ব্যতীত, ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, পৃথিবীর এক ভাগ মাটি এবং তিন ভাগ পানি। এই তিন ভাগ হইতে শতকরা মাত্র এক ভাগ খাদ্য পাওয়া যায়, বাকি ৯৯ ভাগ লাভ করিতে হয় মাটির উপর হইতে। অথচ বিশেষজ্ঞগণের মতে নদ-নদী-সমুদ্র হইতে আরও অনেক বেশী খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীর দ্রব্য পাওয়া সম্ভব। সমুদ্রের এক কিউবিক মাইল পানিতে প্রায় চৌদ্দ কোটি টন সাধারণ লবন আছে। তাহা ছাড়া আছে ম্যাগনেসিয়াম এবং ব্রোমাইড। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, যেহেতু সমুদ্রের পানিতে ২০ হইতে ৩০ গুণ অধিক কার্বন ডায়োক্সাইড রহিয়াছে, সেইহেতু সেখানে অধিক পরিমাণ গাছপালা জন্মানোর সুযোগ আছে। সর্বোপরি, পানি জগতে মৎস্য-সম্পদ অফুরন্ত।এই অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার বিশেষজ্ঞগণ মৎস্য ও জলীয় উদ্ভিদ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উহা খাদ্যের জন্য আহরণের ব্যবস্থা উন্নত করিবার বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। তাহারা আশা করেন যে, মৎস্য আহরণের ব্যাপক উন্নত ব্যবস্থা, মৎস্যকুলে সংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজন এবং আহারযোগ্য জলীয় উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে মানুষের খাদ্যসমস্যার চড়ান্ত সমাধান না হউক, বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে।

বস্তুত দুনিয়ার মানুষ এক দিকে চরম স্বার্থপরতা ও সর্বগ্রাসী লোভ ও লালসার দরুন এবং অন্যদিকে প্রকৃতি-জয়ের দুরন্ত সাহস ও উচ্চাশার অভাবহেতু অন্যান্য সকল মানুষের জন্য খাদ্যসংগ্রহের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আসলে খাদ্যাভাব বা খাদ্যসমস্য বলিতে কিছুই নাই। জীবিকার অনুসন্ধান, খাদ্যোৎপাদনের নূতন নূতন পথ ও উপায় অবলম্বন এবং উৎপন্ন খাদ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ব্যবস্থা না করা, আর গভীর সহানুভূতিপূর্ণ উদার মানবীয় দৃষ্টিভংগীর নিদারুণ অভাবই বিশ্ব-মানবকে বর্তমান কঠিন দুর্দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে। দুনিয়ার কোন কোন অংশে আজিও খাদ্যপণ্যের এমন প্রাচুর্য রহিয়াছে, যাহা সংশ্লিষ্ট দেশের সমগ্র অধবিাসীদের প্রয়োজনের মূল পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু সেই সব দেশে কৃত্রিম উপায়ে অভাব ও চাহিদা সৃষ্টির জন্য খাদ্যপণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। কোথায়ও খাদ্যপণ্য গুদামজাত করিয়া, খোলা বাজার হইতে লুপ্ত করিয়া, কালোবাজারে বিক্রয় করিয়া নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করা হয়। এই ধরনের দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মৃত্যুর কবলে ঢলিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। ইহা অপেক্ষা মারাত্মক দুঃসহ দৃশ্য দেখা যায় সেইসব দেশে, যেখানে একদিকে খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া স্তুপ রহিয়াছে, অন্যদিকে পরিতৃপ্ত ও ভরশা-পেটের লোকদের পাশাপাশি কোটি কোটি অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও আশ্রয়হীন মানুষ হামাগুড়ি দিয়া চলা। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত উজ্জ্বল মুখের স্বতঃস্ফূর্ত হাসিও দেখা যায়, আবার ক্ষুধার্ত মানবদেহের মালিন্য ও কান্নাভারাক্রান্ত মুখমন্ডলেও এত বেশী দেখা যায় যেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই।

বর্তমান দুনিয়ার সমগ্র লোকসংখ্যা ও খাদ্যপণ্যের পরিমাণ যাচাই করিয়া দেখিলে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থানুশীলনের ফলে খাদ্যপণ্য বৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিলে

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আজিকার লক্ষ-কোটি নির্দোষ মানুষকে কঠোর ক্ষুধা, অনশন ও দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত করিয়া তাহাদের বুকের তাজা তপ্ত রক্তধারা নিঃশেষে শুষিয়া লওয়ার জন্য মানব রচিত বিপর্যয়কারী অর্থনীতিই একমাত্র দায়ী। আর প্রত্যেক দেশেই চোরাকারবার, খাদ্যপণ্যের গোপন সঞ্চয় ও মুনাফা লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ব্যাপক আকারে খাদ্যভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

আমেরিকার একজন উদ্ভিতত্ত্ববিদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্টের অসংখ্য ও অপরিমিত উদ্ভিদরাজির মধ্যে অতি কম ও নগণ্যসংখ্যক উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষ এখন পর্যন্ত কিছুটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছে মাত্র এবং এই সামান্য সংখ্যক উদ্ভিদকেও মানুষের কল্যাণ ও উপকারমূলক কাজে ব্যবহার করার দিকে কোন প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয় না। উদ্ভিদের খাদ্যাংশ ও অখাদ্যাংশের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উহাকে বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং এই উপায়ে এত বেশী পরিমাণ খাদ্য ও ধন উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহার কোন সীমা নির্ধারণ করা যায় না।

খাদ্যাভাব প্রতিরোধের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতাকে বিদ্রুপ করিয়া Dr.C.E.D.W.nsheow এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেনঃ

"দারিদ্র ও খাদ্যাভাব দেখিয়া কিছুসংখ্যক লোক এতদূর বিব্রত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, কঠোরভাবে শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে জন্মহারকে বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি হইতে আত্মরক্ষা করার আরি কোন উপায়ই তাহারা দেখিতে পায় না। ইদানীং এই যুক্তি বার বার আমাদের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা যুদ্ধপূর্বকাল অপেক্ষা শতকরা দশজন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু আয় যুদ্ধপূর্ণকাল অপেক্ষা শতকরা পাঁচ হইতে দশের দিকে নিম্নগতি লাভ করিয়াছে"

কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তীব্রত দেখিয়া যাহারা আতংকিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা খাদ্যপণ্য বৃদ্ধি করার সুযোগ ও বিরাট সম্ভাবনার দিকে মোটেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই। অথচ —

"খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। নদীর তীরভূমি কাটিয়া নদীশেকান্তী Erusionবন্ধ করা, বালুকাময় মরুভূমিতে পানি সেচের জন্য উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করা, আধুনিক সার ব্যবস্থার সাহায্যে জমিকে অধিক উর্বর ও উৎপাদন শাক্তি সম্পন্ন করিয়া তোলা এবং বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যপণ্যের চাষ করা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

উক্ত প্রবন্ধ লেখকের হিসাব অনুযায়ী খাদ্যোপাদনের আধুনিক পন্থা সমূহের মধ্যেও মাত্র তিনটি উপায় ব্যবহার করিরলেই কমপক্ষে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রতি একর জমিতে শতকরা ৩০ ভাগ অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর যেসব দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না, সেসব দেশে অন্যান্য নানাবিধ কার্যকর উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। খনিজ পদার্থ উৎপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান

ব্যবহার, কাষ্ঠ ও স্থানীয় শিল্পের সাহায্যে উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে কৃষিপ্রধান এলাকা হইতে খাদ্যপণ্য। আমদানী করা যাইতে পারে।

বিখ্যাত কৃষিবিদ স্যর এলবার্ট হাওয়ার্ড ( sir albert Howard) বলিয়াছেন, বিশ্বের মানবজাতি যদি তাহাদের উর্বরতা, গো-সম্পদের উন্নয়ন এবং শস্যবীজের উৎকর্ষের জন্য সামান্যমত চেষ্টাও করিত, তাহা হইলে বিশ্বের জমির ক্ষমতা অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইত। বর্তমানে বিশ্বের সমুদয় জমির শতকরা মাত্র ১১ ভাগ চাষাবাদের অধীন। এই ১১ ভাগের পরিমাণ হইতেছে ৩৫০ কোটি একর। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই আবাদী জমির পরিমাণ আরও প্রায় দ্বিগুণ—৬৬০ কোটি একর বৃদ্ধি করা সম্ভব। (দৈনিক ইত্তেফাক১২-১-৭৫ অনেক দেশে আবার কর্মক্ষম লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করা হয় না বলিয়া বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে খাদ্যভাব ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।এই বাড়তি লোকসংখ্যার জন্য অন্যত্র কর্মসংস্থান হইলে কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি হইতে পারে না।

বস্তুত সামগ্রিকভাবে দুনিয়ায় প্রকৃতিক সম্পদের কোন অভাবই নাই। এই বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও অজস্র সুলভ শ্রমশক্তি প্রয়োগ করিয়া শিল্পের প্রসার করিতে পারিলে কৃষিপ্রধান দেশে বেকার লোকদের জন্য কর্ম ও অন্ন সংস্থান তো হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থ সাচ্ছল্য ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কৃষকও তাহার উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত অর্থসম্পদ উপার্জন করিতে পারিবে। এইরূপ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই বলি য়াই দেশে দেমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ আতংকের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে।

অথচ কৃষি-শিল্পের পুনর্গঠনের ভিতর দিয়া প্রত্যেক দেশের আর্থিক সাচ্ছল্য সৃষ্টি হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোনদিনই একটি সম্যা হইয়া দাঁড়াইবে না। বরং এই লোকসংখ্যা জাতির পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর প্রমাণিত হইতে পারে। এতএব কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোন সমস্যা রূপে গণ্য নয়, কর্মসংস্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যোৎপাদনের অব্যবস্থাই হইতেছে প্রকৃত সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হইলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা মানব সমাজে এক অভিনব মুক্তির মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দুনিয়ার অনেক দেশেই এই কথার বাস্তব প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেসব দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াও তাহা দেশের পক্ষে কোনরূপ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। বৃটেন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতির লোকসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু এইসব দেশে বাড়তি লোকগুলির জন্য কর্মসংস্থানের কিছু না কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

আরো একককটি উদাহরণ পেশ করা যাইতে পারে। ১৯৫৭ সনের হিনাব মতে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের ৪ কোটি ২১ লক্ষ অধিবাসীর জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ২১ কোটি মন চাউলের প্রয়োজন হয়। আর প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয় গড়ে ১৮ কোটি ২৭ লক্ষ হইতে ২১ কোটি ৫৪ লক্ষ মণ। কিন্তু সব বৎসর প্রয়োজন অনুযায়ী চাউল উৎপন্ন

হয় নাবলিয়া, (পশ্চিম) পাকিস্তান হইতে চাউ আমদানী করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৩ মণ ধান্য উৎপন্ন হয়। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ যদি আরো দুই-তিন মণ বৃদ্ধি করা যায়, তবে প্রদেশের খাদ্যাভাব অতি সহজেই পূরণ করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী ১৯৬৭ সনে প্রদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বার্ষিক কৃষি উৎপাদন ১ কোটি ২০ লক্ষ টনে উন্নীত করার তাকীদ করিয়াছিলেন। (দৈনিক-আজাদ-১০-৬-৫৭)

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে বাংলাদেশের সীমারেখায় ভূমির পরিমাণ সাড়ে তিন শত কোটি একর। ইহার মধ্যে বর্তমানে ২ শত ৯০ কোটি একর জমি আবাদযোগ্য রহিয়াছে। প্রতি বছর গৃহ-নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, শিল্প কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিমাণে ১ লক্ষ একরের উপর জমি হইতে হয়। অপর এক হিসাবে জানা গিয়াছে, এদেশে আবাদযোগ্য খাস-জমির মোট পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি লক্ষ ৯১ হাজার ৯ শত ৮০ একর ।[১] এই জমিগুলিতে চাষ করার ব্যবস্থা হইলে দেশ খাদ্যপণ্য ও ধনসম্পদের দিক দিয়া সচ্ছল—বরং প্রাচুর্যপূর্ণ হইতে পারে, এই পরিমাণ চাসের জমিতে ১ কোটি ৪ লক্ষ টনের কিছু বেশী চাইল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রায় ৮০ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে দুই হইতে তিনটি করিয়া ফসল ফলানো সম্ভব। এইসব উপায়ে বর্তমান উৎপন্ন খাদ্য সম্পূর্ণতা ১৫-১৬ ভাগ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন খুবই সহজ। যুক্তরাষ্ট্রের হার্বার্ড বিশ্ববদ্যালয়ের একটি জরিপে বলা হইয়াছে যে, আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ ও পর্যাপ্ত সার ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বর্তমানের ১ কোটি ২৩ লক্ষ টন হইতে ৫ কোটি টনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। (দৈনিক ইত্তেফাক ১০-১০-৭৪) অর্থনীতিবিদগণ এই কথা সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতির এই অফুরন্ত অবদানকে মানবকল্যাণকর কাজে ব্যবহার করিয়া মানুষের জীবিকার সংস্থান করিতে চেষ্টা না করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথই যদি বন্ধ করা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা অমানুষিক আচরণ আর কি হইতে পারে।

এতএব বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে ম্যালথুসের মতবাদ যে ভুল এবং বর্তমান যুগেও যাহারা এই মতবাদকে কার্যকর করিবার জন্য চেষ্টিত তাহারা যে মানবতার প্রকাশ্য দুশিমন, তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ তাকিতে পারে না।

এই পর্যায়ে ১৩৯৩ বাংলা সনের ১৫ ই চৈত্র (৩০-৩-৮৭ ইং) দৈনিক ইত্তেফাক-এর অর্থনীতির পাতায় বিশ্ব অর্থনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন , শীর্ষক প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিতে চাই। তাহাতে বলা হইয়াছিল।

'দরের পরিবর্তন এবং চাহিদা হ্রাসের পূর্বাভাস আগে কেউ দিতে পারেন নি। দশ বছর আগে 'ক্লাব অব রোম' নামের বিশেষজ্ঞদের নোট টি বলে ছিলঃ ১৯৮৫ নাগাদ

১. দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য ৭৭-৭৮ সন নাগাদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদান করা কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাত কোটির উপর। (দৈনিক উত্তেফাক ১০-৪-৭৪)

বিশ্ব জুড়ে কাঁচামালের অভাবে হাহাকার পড়ে যাবে। ১৯৮০ সনে কার্টার সরকার ২০০০ সনে বিশ্বের হাল সম্পর্কে যে রিপোর্ট গ্রহণ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, আগামী ২০ বছর পর্যন্ত সারা বিশ্বে খাদ্যের উৎপাদন কমে যাবে।

'কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের মোট খাদ্যোৎপাদন ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫-এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে এমন পর্যয়ে পৌছে যা সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ স্বল্পোন্নত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপান বেড়েছে অতিদ্রুত। একইভাবে সব ধরণের বন-সম্পদ গত দশ বছরে ২০ হতে ৩৫ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে, আর তার মধ্যেও অগ্রগতিটা বেশী হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশে'। (বাংলাদেশ ইহার বাহিরে নয়।)

এর কারণ কি? প্রশ্নের জওয়াবে প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছেঃ

বিশ্ব জুড়ে খাদ্য-শস্যের চাহিদা বেড়েছে ক্লাব আব রোম ও গ্লোব্যাল ২০০০ রিপোর্টে অনুমিত হারেই। কিন্তু খাদ্যেরর সরবরাহ বেড়ে গেছে ততোধিক দ্রুততার সাথে। এটা কেবল জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পায় নি, সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেই ছাড়িয়ে গেছে।

এই কথা হইতে নিঃসন্দেহে মনে করা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন বিশ্বে যে কোন দেশেই—খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার আতংক সৃষ্টিকারী সব ভবিষ্যদ্বাণীই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীণ এবং সেই কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারার রোধ কার চেষ্টা চরম পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

খাদ্যের প্রয়োজন-পরিমাণ উৎপাদন না হওয়ার কারণেই যে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং কোন দেশে মানুষকে না খাইয়া থাকিতে হয়, তাহাও সত্য নয়। কেননা জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থার F.A.O. মহাপরিচালক মিঃ এড ওয়ার্ড সাওমার ফাও-এর বিশ্বখাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কমিটিরর কাছে পেশকৃত রিপোর্টে বলিয়াছেনঃ বিশ্বে পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুত থাকা সত্ত্বেও কোটি কোটি গরীব জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য হাহাকার করিতে হইতেছে'। (দৈনিক উত্তেফাক-২৭শে চৈত্র ১৩৯৩ দ্রঃ)

জন-সংখ্যা অনুপাতে প্রযেয়াজনীয় পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় না, উক্ত কথার প্রেক্ষিতে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অতএব এই অজুহাতে জনসংখ্যা কম রাখিবার জন্য নৈতিকতা ও সমাজ ধ্বংসকারী 'পরিবার পরিকল্পনাকে মানবতার দুশমন ও চরিত্রহীনতার প্রবর্তনকারীদের মারাত্মক যড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় কি?

## জনসংখ্যা সমস্যা ও ইসলাম

এই আলোচনার শেষ ভাগে বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী নীতি পেশ ককা একান্ত আবশ্যক । পৃথিবীতে শান্তি শৃংখলা স্থাপন এবং মানব সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে দুইটি প্রধান জিনিসের ব্যবস্থা এইজন্য করিয়াছেন যে, জীবিত লোকদিগক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচাইযা রাখা এবং তাহাদের মধ্যে কর্মক্ষমতা সঞ্চার করা ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। এইজন্য বিশ্বস্রষ্টা

মানুষকে কেবল খাদ্য দান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, খাদ্য গ্রহণ করার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজনবোধও তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। অন্যথায় কোন সৃষ্টজীবের পক্ষেই জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত না। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার নিকট 'ব্যক্তি'র জীবন অপেক্ষা 'জাতি'র জীবন (জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'ব্যক্তি'র জন্য জীবনের আয়ু খুবই সীমাবদ্ধ, আর 'জাতি'র জীবন অনন্ত। কাজেই এই সমাজ পরিচালনার জন্য ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তাহার স্থলাভিষিক্ত অন্য ব্যক্তির প্রস্তুত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে 'বংশ' বৃদ্ধির স্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রাণীর মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বস্রষ্টার এই মহান উদ্দেশ্য যাহাতে সঠিকরূপে কার্যকর হইতে পারে, ইসলাম তাহারই অনুকূল নীতি পেশ করিয়াছে।

প্রথম ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ঘোষণা এই ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا- (هود-٩)

'পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর খাদ্য প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র'[১]।

এবং এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমান থাকায় মানব বংশ ধ্বংস করার নীতি ও মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاءً كَبِيْرًا- (بنی اسرائل -١٣)

'তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের ভয়ে হত্যা বা ধ্বংস করিও না। কারণ তাহাদের—এবং তোমাদে—প্রয়োজনীয় 'রিযিক' আমিই দান করিয়া থাকি। কাজেই মানব বংশ ধ্বংস করার নীতি মারাত্মক ভুল ও মহা অপরাধ, সন্দেহ নাই।

---

১. আল্লাহ্‌ যে অনেক অনেক বেশী মানুষ ও জীবকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইতে পারেন এবং তাহা আলাহ্‌র পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়—তাহাতে যে আল্লাহ্‌র খাদ্য ভান্ডারে কোন অভাব পড়িবে না, তাহাতে এক বিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র কথা বর্ণনা করিয়াছেন এই ভাষায় ঃ

يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّ لَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلُوْا فِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْئَلَتَهُ مَانَقَصَ ذَالِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمُخَيْطَ اِذَا اَدْخَلَ الْبَحْرِ- (حديث قدسى، مسلم)

হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রথমকার ও পরবর্তীকালের লোকেরা তোমাদের সমস্ত মানুষ ও জ্বীন যদি একটি কাষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেকের প্রার্থনানুযায়ী দান করি, তাহা হইলেও আমার নিকট রক্ষিত সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না—হইবে শুধু এতটুকু পরিমাণ, যতটুকু পরিমাণ সমুদ্রে সূঁচ ডুবাইয়া উঠাইলে হয়।'

বস্তুত যাহারাই বংশ বৃদ্ধির পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা বিভিন্ন দিক দিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা একদিকে খাদ্যোৎপাদনকারী যুবশক্তি নির্মূল করিয়াছে, অন্যদিকে খাদ্যোৎপাদনে অক্ষম লাকদের সংখ্যা বৃদ্ধি কলিয়া সমাজকে একেবারে অচল করিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ, পংগু, অক্ষম ও অকর্মণ্য লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সমাজকে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি, সন্দেহ নাই।

কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে ঃ

قَدْخَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلاَدَهُمْ سَفَهَابِغَيْرِ عِلعمٍ وَحَرَّمُوْا مَارَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْضَلُّوْا وَمَاكَنُوْا مُهْتَدِيْنَ - (الانعام- ١٤٠)

যাহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে হত্যা করিবে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অবদানকে আল্লাহ-সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া নিজেদের উপর হারাম করিয়া লইবে, তাহারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে না।

বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও বিশ্বমানবের সম্মুখে আজ এই সত্য তত্ত্ব উদঘাটিত হইয়াছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ—জনসংখ্যাবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা—অর্থনীতির দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল। আর জনসংখ্যা হ্রাস করা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের (Economical Depression) মূল কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম। যেহেতু মানুষের জন্মহার হ্রাস পাইলে উৎপাদন ও উপার্জনক্ষম লোকদের (Producing population) সংখ্যা ব্যয়কারী লোকদের (consuming population) অপেক্ষা অনেক কম হইয়া পড়িবে। ইহার অনিবার্য পরিণতিতে জনসমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। ফলে সমষ্টিগতভাবে ব্যয়কারী লোকদের সংখ্যাও অত্যধিক কম হইয়া পড়িবে, উৎপন্ন পণ্যক্রয়কারী লোকদের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে; মজুর-শ্রমিকগণ কাজ কম পাইবে। ইহার অনিবার্য পরিণামে মানব জাতির অগ্রগতি মারাত্মকরূপে ব্যাহত হইবে। জার্মানী ও ইটালীর অর্থনীতিবিদগণ এই জন্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ইসলামী অর্থনীতি প্রথমত একদিকে পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন করিয়াছে, সুদকে চিরতরে হারাম করিয়াছে, সাধারণভাবে একচেটিয়া ব্যবসায় ও নিরংকুশ ইজারাদারী নিষিদ্ধ করিয়াছে, জুয়া, প্রতারণামূলক ব্যবসায় ও ধন সম্পদ বিনা কাজে আটক করিয়া রাখাকে কঠিন পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অন্যদিকে যাকাত ও মীরাসী আইন জারী করিয়া অর্থনৈতিক অসাম্য ও সম্পদ সম্পত্তির একস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া যাওয়ার সকল পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধুয়া তুলিয়া ইসলামী সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা ভ্রুণ হত্যার প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং সত্য কথা এই যে, ইসলামী সমাজে যাহারাই এই কাজ করিতে উদ্যত হইবে, তাহারা ফৌজদারী

আইনে অভিযুক্ত হইবে। লামী সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন দিনই কোন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে না, ইসলামী রাষ্ট্র এই বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে উৎপাদনকারী শক্তি হিসাবে প্রয়োগ করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অফুরন্ত ধনভান্ডার—এই বিশ্বপ্রকৃতিকে 'জয়' করিবে। বস্তুত ধনসম্পদ ও খাদ্য-পণ্য উৎপাদনের যত উপায় ও উপকরণই দুনিয়ায় রহিয়াছে, তাহার সবগুলিকেই মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। ইহার ফলে ধন ও খাদ্যেৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে, উৎপন্ন খাদ্যপণ্য কোনক্রমেই অপচয় বা নষ্ট করা হইবে না বলিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃত হার কোনদিনই খাদ্যাভাব ঘটাইবার কারণ হইবে না। দ্বিতীয়ত ধনসম্পত্তি ও খাদ্যপণ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টন করা হইবে বলিয়া প্রয়োজনীয় জীবিকা হইতে কেহই বঞ্চিত থাকিবে না এবং তৃতীয়তঃ ইসলামী সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সহনুভূতি ও শুভেচ্ছার বাঁধন বর্তমান থাকবিে বলিয়া তথায় কেহ কাহারো উপর জুলুম বা শোষণ করিবে না বরং বিশ্বস্রষ্টার বিধান-অনুযায়ী তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই হইবে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মারফতে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা দেশ ও রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষ—তথা প্রত্যেকটি প্রাণীর অপরিহার্য জৈবিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মানুষের বংশ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দিকে উহার কোন প্রবণতাই থাকিবে না।

বস্তুত যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মানুষের বংশ ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যোগী হয়, ক্রমবর্ধিষ্ণু মানুষের জন্য খাদ্যোৎপাদনর ব্যবস্থা করে না, সে রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবতার দুশমন, বিশ্বস্রষ্টার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং অস্বাভাবিক। এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থাও অস্বাভাবিক অর্থনীতিকে নির্মূল করার জন্যই ইসলামের চিরন্তন লড়াই।

# জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রাচুর্যের পৃথিবী

['ইসলামের অর্থনীতি' বই'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের একটি সরকারী ডিগ্রী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বইখানির জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা পর্যায়ে কিছু আপত্তি জানাইয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উহার জওয়াবে লিখিত তথ্যপূর্ণ চিঠিখানি এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।]

আমি জানিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি যে,আপনি আমার লিখিত বই 'ইসলামের অর্থনীতি' সম্পূর্ণ পড়িয়াছেন এবং ইহা পড়িয়া যারপর নাই উৎসাহিত হইয়াছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানিতে পারিলাম যে, বইখানি 'জনসংখ্যা সমস্যা' সম্পর্কীয় আলোচনা এবং ইহার সমাধানের জন্য আমি যে পন্থা পেশ করিয়াছি তাহা আপনাকে প্রতি করিতে পারে নাই। বরং এই বিষয়ে আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেই থাকিবে এবং তাহাতে খাদ্য সমস্যাও দেখা দিবে। এমতাবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই সমস্যার সুস্পষ্ট ও কার্যকর সমাধান কি হইতে পারে?

আমার বইতেই প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে যে, আপনি আমার আলোচনা যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাই বর্তমান পত্রে আপনার সম্মুকে আমার বক্তব্য আরো বিস্তারিত রূপে পেশ করিতেছি। অবশ্য এই আলোচনাও নিছক অর্থনৈতিক তথ্য পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। বলা বাহুল্য, যেসব তথ্য আমার গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে, এখানে উহার পুনরোল্লেখ করা হইবে না। আশা করি, আমার এই কথাগুলি ও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

'ইসলামের অর্থনীতি' বইতে আমি জনসংখ্য-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মোট চারটি কথা বলিয়াছি। প্রধম কথা এই যে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেইজন্য এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা রোধের যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা কিছুমাত্র যুক্তিসংগত নহে। কেননা ইহা হইতে চরম স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয় এবং মানবতার সহিত চরম দুশমনি করা হয়। ইহা হইতে এই মনোবৃত্তি ও প্রকাশ পায় যে, আমরা যাহারা দুনিয়ার আসিয়াছি, তাহারাই যে এখানে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে থাকিতে ও ভোগ-বিলাস করিতে পারি, অন্য কেহ যেন আমাদের সহিত ভাগ বসাইতে এবং আমাদিগকে অভাগ্রস্ত করিতে না পারে।

দ্বিতীয় এই যে, কিছু সংখ্যক অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা সমস্যা দেখাইতে গিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও ভুল। যেহেতু জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে না বাড়ে ক্রমিক

সংখ্যার অনুপাতে। এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনও ঠিক সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃত পক্ষে কোন সমস্যাই নহে।

তৃতীয়তঃ বর্তমান পৃথিবীতে যাহাকিছু খাদ্যসম্পদ আছে, তাহা শুধু বর্তমান জনসংখ্যার জন্য নয়, ইহার বর্তমান আয়োজন দিয়াই ইহার তিনগুণ বেশী লোকের জন্যও বিশেষ স্বাচ্ছান্দ্য ও পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি বৈজ্ঞানিকদের উক্তির উলেখ করিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগে এত উপাদান রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিক পন্থা যাহার অনুশীলন করিলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা তিন-চারগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

আর চতুর্থ এই যে, ইসলাম জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের জন্য কোন প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণই আদৌ সমর্থণ করে না। বরং ইসলাম তীব্র ভাষায় এই ধরনের মনোবৃত্তি ও প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের পন্থা অবলম্বন করিলে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হইবে না; বরং ঠিক তখনই এই সমস্যার সৃষ্টি হইবে। কেননা স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা কোন সমস্যাই নহে।

আমি জানি না, আমার আলোচনা হইতে আপনি এই কথাগুলি হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছেন কিনা। কেননা, যদি তাহা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে এই প্রশ্ন আমার নিকট নিশ্চয়ই আসিত না

১৯৬৩ সনে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল গঠনের পর অসংখ্য সম্পদ জরিপের ফলে স্পষ্ট রূপেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই পৃথিবী অত্যন্ত সম্পদশালী এক গ্রহ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখিত তহবিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পলজিহফম্যান বলিয়াছেন, এমন বহু দেশ রহিয়াছে, যেখানে জমিতে সার এবং উন্নত বীজ ব্যবহার করা হইলে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় দুই-তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। তিনি জানান, বহুস্থানে অপরিমিত খনিজ সম্পদ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বহু স্বল্প আয়ের দেশে পানি সম্পদ এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয় নাই। তিনি বলেন, পৃথিবীতে এখনো কোটি কোটি একর জমির পানি সরাইয়া অথবা লবণাক্ততা দূর করিয়া চাষোপযোগী জমিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পারলেই তাহা কোন সমস্যায় পরীণত হয় নাই আমার এই কথাটির ভিত্তি বিশ্বৈবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী এবং উহার ক্রমবৃদ্ধির হারে উপর স্থাপিত। গোটা পৃথিবীকে সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, ঠিক তেমনি খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। মনে করুন, আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল, —ধরা যাক—বর্তমান সংখ্যার তিনভাগের দুই ভাগ। খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কেও চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য নানাভাবে পাওয়া যায় তত পরিমাণ খাদ্য নিশ্চয়ই তখন উৎপন্ন হইত না। আমার মতে বর্তমান পরিমাণের তিনভাগের দুইভাগ

পরিমাণই হয়ত উৎপন্ন হইত। খাদ্য সঙ্গ্রহের এমন অনেক পন্থা বা যন্ত্র এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা অতীতে কোনদিন ছিল না শুধু নয়, সেই সূত্রে যে পরিমাণ খাদ্য-সংগ্রহ হইতে পারে তাহা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। বিশেষতঃ কৃষির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করিল এই কথা আর জোরালোভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহার দ্বারা খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন পরিমাণ অপেক্ষাও অনেক বেশী বাড়ানো যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিলেই আমার উপরোক্ত দাবী প্রমানিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাশিয়ার কথাই ধরা যাক। ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ছিল ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন। আর বিগত ৫৪ সনে প্রকাশিত হিসাবে জানা গিয়াছে যে, সেখানে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ হইয়াছে এগার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন। আমেরিকা সম্পর্কে জানা যায় যে, বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে খাদ্যের উৎপাদন একর প্রতি শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং এক-একটি ফার্মের চাষী শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ বেশী উৎপাদন করিতে পারিতেছে। বলা হইয়াছে, ১৯৫২ সনে খাদ্যের মওজুদ পরিমাণ ছিল ২৫৪০ লক্ষ বুশেলস, ১৯৫৩ সনে ৫৫০০ লক্ষ বুশেলস এবং ১৯৫৪ সনে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪০০ লক্ষ বুশেলস হইয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমার দাবি এই যে, প্রয়োজন পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাস্তবিকই খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে যদি নূতন নূতন যন্ত্র ও উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রয়োগ করা হয়, ভাল বীজ এবং আধুনিক সার ব্যবহার করা হয়, তবে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা দ্বিগুন-তিন গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভাল বীজের সাহায্যে খাদ্যোৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহা দেখাইতে গিয়া T. jenkins নামক প্রসিদ্ধ কৃষি-বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে,—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিন বৎসরের মধ্যে ৮ বিলিয়ন (Billion) বুশেলস শস্য ৩১১০ লক্ষ একর জমিতে উৎপন্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিন বৎসরের মধ্যে ৯১ বিলিয়ন বুশেলস শস্য শুধু ২৮১০ লক্ষ একর জমিতে উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছিল।

বৃটেনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উৎপাদন পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছে। উহার দাবি এই যে, দেশে সমগ্র জনতার পেট ভরিয়া খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সেখানে উৎপন্ন হয়। "এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল' কৃষি বিষয়ে গবেষণা শুরু করিয়াছে। কাউন্সিলের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বীজকে তরল Nutrient-এ ভিজাইয়া বপন করিলে খুব ভাল ফসল হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাদা বীজ বপন করিলে ২০ বুশেলস এবং phosphete-এ ভিজাইয়া বপন করিলে একর প্রতি ২৫ বুশেলস খাদ্য উৎপাদন হইতে পারে।

খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে আনবিক শক্তি প্রয়োগ করিত পারিলে—যেজন্য চারিদিকে গবষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে—উৎপাদন পরিমাণ অভাবিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে

পারে। David-E-Lilunthal ১৯৪৯ সনে লিখিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানীগণ গত দুই বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন কৃষি ক্ষেত্রে আনবিক শক্তি ব্যবহার করার জন্য। ১৯৪৮ সনে বিজ্ঞানীদে এক সম্মেলনে কৃষি উৎপাদনে আনবিক শক্তি কিরূপে কার্যকর হইতে পারে—এই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেনঃ আনবিক বিজ্ঞানের একটি অপূর্ব অবদান এই যে, উহা মানব বংশের এক কঠিন সমস্যার সমাধান পেশ করিযাছে এবং তাহা হইতেছে দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। বৃটেনের আনবিক বিজ্ঞানী ডাঃ জন এইচ ফ্রেমলিন (Dr John H. Fremlin ) Atomic scientisf News' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশসমূহে খাদ্রোৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা জনসংখ্যর রিমাণ বেশী। কিন্তু রাশিয়া সহ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে খাদ্যাৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির গতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি অপেক্ষা অনেক তীব্র। তিনি অনুন্নত দেশসমূহ—বিশেষ করিযা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে—কৃষি ক্ষেত্রে আনবিক মক্তিত প্রয়োগের উপর অত্যধিত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন, বৃটেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে এ সম্পর্কে এতদূর তথ্য পাওয়া যায় যে, এই সমস্যার সমাধান খুবই সহজে করা যাইতে পারে। তাহার মতে শিক্ষিত ও শিল্পায়িত পাক-বাংলা-ভারতে বর্তমান জনসংখ্যার দ্বিগুণ লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নহে।

আলবেনিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু সেখানেও একটি পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৫) তৈয়ার করা হইয়াছে, যাহার দরুন জাতীয় সম্পদ শতকরা একশ' ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সনে জনসেচের জমির পরিমাণ ছিল ৩৯০০০ হেকটার্স। পাঁচ বৎসরের শেষ ভাগে তাহা হইয়াছে ৮৩০০০ হেকটার্স। ইহাতে খাদ্যশস্যের পরিমা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এইসব ক্ষুদ্র দেশ ও আনবিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য পরিমান জনসংখ্যা প্রয়োজন অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে এবং তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ খাদ্যশস্য ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যের আরো অসংখ্য প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। সুইডেন সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, সেখানে দুইজন বিজ্ঞানী সাধারণ খরগোশ অপেক্ষা ২॥ গুণ বড় খরগোশ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেখানে সধারণ খরগোশের ওজন হয় ৫॥ পাউন্ড। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপাদিত খরগোশের ওজন হইতেছে ১২ পাউন্ড পর্যন্ত। এই গবেষণার সাহায্যে মাছ, মোরগ, ছাগল, ও গুরু ইত্যাদির ওজন অত্যধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা খাদ্য প্রয়োজন অনেকখানি পূরণ হইতে পারে।

বিশ্বের অন্নকষ্ট নিরসনে রসায়নবিদ্যা কতখানি সহায়ক হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা পুষ্টিহীনতা রোধ করিয়া কিভাবে বিশ্বজোড়া মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইতে পারে এই প্রশ্ন লইয়া ও যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। জার্মানীর বৃহত্তম বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনী শিল্পের ডিরেক্টর বোর্ডের অধ্যপক ডঃ বার্নহার্ড টিম বলিয়াছেন, শিল্প রসায়ন

ইতিমধ্যেই তিনটি ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে সক্ষম হইয়াছে। ভবিস্যতে এই ক্ষেত্রগুলি রসায়নবিদদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইবে। ক্ষেত্রগুলি হইল, বিকল্প সার, কার্যকর কীটপতংগ নাসক দ্রব্য ও জৈবিক প্রোটিন উৎপাদন বিশ্বে বর্তমানে মোট সাড়ে ছয় কোটি টন নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অধ্যাপক বার্নহার্ডের মতে ২০০০ সালে মানুষের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইবে তাহা উৎপাদনের জন্য এই সারই যথেষ্ট। শিল্পোন্নত দেশেগুলিতে এখন স্বনির্ভরতার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এখন নাইট্রোজেন সারের কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বিশ্বের সব্জি জাতীয় খাদ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশই প্রতি বছর নানা রকমের কীটপতংগের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। অথচ কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া এই অবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে। এবং সব্জি উৎপাদনের হার শতকরা ৩০ ভাগ, এমনকি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। জৈবিক প্রোটিন সমৃদ্ধ পশুখাদ্যের সাহায্যে পশুবংশ বৃদ্ধিরও পর্যপ্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব। রসায়নবিদদের বিশ্বাস, রসায়নিক প্রোটিন সমৃদ্ধ পশু খাদ্যের সাহায্যে বিশ্বের গৃহপালিত পশু দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সব তথ্যের উল্লেখ আমি এই জন্য করিলাম যে, ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ এই পৃথিবীর বুক হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য কেবল যে নিজের জন্য উৎপাদন করিতে পারে তাহাই নয়, বরং তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করে সম্ভব। কোন দেশে যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হইয়া থাকে, তাব তাহার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে—আর বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়, অতএব জনসংখার সমস্যা দেখা দিয়াছে; বরং তাহার সুস্পষ্ট অর্থ এই হইতে পারে যে, সেখানে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করা হয় নাই—সে জন্য কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা হয় নাই। বিশেষতঃ আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও সেখানে প্রয়োগ করা হয় নাই। বস্তুতঃ বিশ্বের যাবতীয় উপায় উপাদান মানুষের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে; অতএব প্রকৃতিকে জয় করা এবং তাহাকে নিজেদের প্রয়োজন পূরনের জন্য ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর বাণীঃ

خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا- (البقرة-٢٩)

পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সবই হে মানুষ—তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

এর অর্থ ও তাহাই। এই জন্য মানুষ স্বভাবতই প্রকৃতি জয়ের জন্য আবহমান কাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, আর সময় যত তীব্র গতীতে মানুষের আয়ত্তে আসিতেছে। এমতাবস্থায় একমাত্র নৈরাশ্যবাদী ও আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়া সম্পর্কে অবিশ্বাসী লোকেরাই বলিতে পারে যে, প্রকৃতিকে জয় করা সম্ভব নয়—জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে খাদ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য তো এইখানে যে, প্রকৃতির

সম্মুখে অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে প্রকৃতিকেই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া লওয়ার শক্তি আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দিয়াছেন এবং তাহা করাই মানুষের কর্তব্য। আর বর্তমান যুগে বিজ্ঞানই হইতেছে ইহার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এই প্রেক্ষিতে সহজেই বলা যায় যে, ম্যালথুসের থিওরী সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ না করিয়া জনসংখ্যানুপাতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সেজন্য আধুনিকতম যাবতীয় পন্থা প্রয়োগের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় আপনি বলিয়াছেন, জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে এবং তাহাতে খাদ্য সমস্যাও দেখা দিবে। আমি আপনার কথার প্রথম অংশ (জনসংখ্যা বাড়িবেই)—স্বীকার করি। কিন্তু উহার দ্বিতীয় অংশ (খাদ্য সমস্যা দেখা দিবে)—মোটেই স্বীকার করি না। কেননা জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিক খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিও। তদুপরি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রয়োজন অপেক্ষাও অনেক বেশী পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। আমার দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আদৌ কোন সমস্যা নহে বরং প্রকৃত সমস্যা হইতেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎপাদন না করা এবং সুবিচাপূর্ণ ভাবে উহার সুষ্ঠু বন্টন না করা। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যদি নিত্য নব-পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হয় তবে খাদ্যের পরিমাণ কখনই প্রয়োজনের অপেক্ষা কম হইবে না এবং তাহা যদি সুবিচারপূর্ণভাবে বন্টন করা হয়, তবে পৃথিবীর কোন একটি অংশেও খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারিবে না। আপনি এজন্য Concrete plan চাহিয়াছেন। কিন্তু কাল্পনিক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া কি পরিকল্পনা দেওয়া যাইতে পারে, আমি বুঝিলাম না। যাহা মোটে সমস্যাই নয়, তাহাতেই আপনি বড় কঠিন সমস্যা মনে করিয়া লইয়াছেন, আর যাহা প্রকৃত সমস্যা, তাহাকে আপনি মোটেই গুরুত্ব দিতেছেন না। আপনি দেখিতেছেন না যে, আল্লাহর বান্দহদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, আল্লাহর খাদ্যদানের দুয়ার ও তেমনি নানাভাবে অবারিত হইতেছে। ৫৪ সনের জুলাই মাসের Readers Digest পত্রিকায় Bread from the sea (সামুদ্রিক খাদ্য) শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে. মুঙ্গা বর্ণের এক উদ্ভিদ জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ গভীরভাবে গবেষণা চালাইয়াছেন। সে সম্পর্কে ধারণা এই যে, তাহা মানব জাতির জন্য আনবিক শক্তি অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান ও কল্যাণকর হইবে। ইহার নাম ALGAE ইহাতে প্রোটিন ও চর্বি জাতীয় খাদ্যপ্রাণ প্রয়োজন পরিমাণ বর্তমান রহিয়াছে। সমুদ্র, নদী, বিল, ঝার্ণা, এমনকি ধুসর মরুভূমিতে পর্যন্ত খুব বেশী পরিমাণে এবং খুব সহজে ইহার চাষ করিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ২০৫০ সনের জনসংখ্যা (প্রায় সাত হাজার মিলিয়ন) খাদ্য সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পরিবে। শোনা যায় যে, জাপান, ইসরাঈল, আমেরিকা ও থাইল্যান্ডে ইহার চাষ রীতিমত শুরু হইয়া গিয়াছে। থাইল্যান্ডে 'এ্যালগা' ও এই ধরনের খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ই বার্ষিক পাঁচ হাজার টন খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা অতীব

কৌতূহল উদ্দীপক যে, জাপানের বৈজ্ঞানিক ডঃ. Tramiya এর স্ত্রী Hrosli কালিফোর্ণিয়ায় এক চা রাতিতে এ্যালগা হইতে প্রস্তুত রুটী শুরবা ও এ্যালগার আইসক্রীম পরিবেশন করেন।

এই আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হইতেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর এই পৃথিবীতে কত যে খাদ্যদ্রব্য অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো কত যে আবিষ্কৃক হইবে, তাহার কোনই ইয়াত্তা নাই। এই জন্যই ভি. আর উইলিয়ামস নামক জনৈক আধুনিক মৃৎ-বিজ্ঞানী (soil scientist) বলিয়াছেন— "There is no limit to growrh of crop yields" তাই আমিও অত্যন্ত জোরালো ভাষায়ই বলিতে চাইঃ পৃথিবীর বর্তমান খাদ্যের আয়োজন দিয়াই ২২০ কোটির তিন গুণ—৬৫০ কোটি. মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা চলিতে পারে।

দুনিয়ার মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে খাদ্য শস্য ধ্বংস করা অভিযান রোধ করিতে হইবে। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে হাহাকার করিতেছে তখন অতিরিক্ত উৎপাদিত গম ধ্বংস করার জন্য কানাডার ফেডারেল সরকার দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় চাষীদের ১০ কোটি ডলার ( প্রায় ১২৫ কোটি টাকা) সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। গম ধ্বংস অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আলবার্টা, সাসকাচেওয়ান, ম্যানিটোপ এবং বৃটিশ কলম্বিয়ার ১.৮০.০০০ জন চাষীকে এক বৎসর আর্থিক সাহায্য দেওয়া অব্যাহত থাকিবে। যে সমস্ত চাষী গমের জমিকে পতিত হিসাবে ফেলিয়া রাখিবে তাহাদিগকে একর প্রতি ৬ ডলার হিসাবে সর্বোচ্চ ৬০০০ ডলার সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আবার যে সমস্ত চাষী গমের জমিতে এক বৎসরের অধিক সবুজ ঘাস জন্মাইবে তাহারা একর প্রতি ১০ ডলার হিসাবে সর্বাধিক ১০.০০০ ডলার সাহায্য পাইবে। মানবধ্বংসকারী এই সব ব্যবস্থা রোধ করা না হইলে বিশ্বের খাদ্যসমস্যা কোনদিনই প্রতিকার করা যাইবে না। বস্তুত বিশ্বে খাদ্যসমস্যা বলিতে কিছুই নাই, সমস্যা হইল সুষ্ঠু উৎপাদন ও বন্টনের মানবিক ব্যবস্থার অভাব। বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে এই সব অমানবিক নীতির প্রতিরোধ করিতে হইবে।

লোকসংখ্যা সমস্যা দেখাইতে গিয়া অনেকে আবার স্থান সংকুলানের প্রশ্নও উত্থাপন করেন। তাহারা বলেন যে, যে হারে লোক বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে পৃথিবীতে এত লোকের স্থান সংকুলান হওয়াও সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, এখনো পৃথিবীর বহু অঞ্চল প্রচুর স্থান একেবারে জনশূণ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং নিউজিল্যান্ডে মোটেই স্থানাভাব নাই। বরং সেখানে ঘন বসতি কিংবা লোকের স্থান সংকুলন হয় না, সেখান হইতে এই সব শূণ্য এলাকায় লোকদের পুর্নবাসন করা হইলে স্থান সংকলান সমস্যা বলিতে কিছুই থাকিতে পারে না। এই সব তথ্য সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিলে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে যে, জনসংখ্যা সমস্যা কি দুনিয়ায় চিরদিনই ছিল? না নব্যযুগেরর আন্যান্য অসংখ্য প্রকার

আবিষ্কারের ন্যায় ইহাও একটি অভিনব আবিষ্কার? আমার মতে, যে ভাবে ইহাকে একটি সমস্যা বলিয়া মনে করা হইতেছে, সেই ভাবে ইহা বর্তমানের নূতন কোন সমস্যা নহে, এ সমস্যা পূর্বকালেও—শত শত, হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও ছিল। কিন্তু তখনকার লোকেরা কখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বিপদ বলিয়া মনে করে নাই এবং উহার বৃদ্ধির পথ বন্ধও করে নাই, বরং তাহার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুপাতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে চেষ্টানুবর্তী হইয়াছে, মন ও মস্তিষ্ক লাগাইয়া গবেষণা করিয়াছে এবং খাদ্যোৎপাদনের নূতন নূতন পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। বস্তুত মানব ইতিহাসের ধারাই হইতেছে এইরূপ। খাদ্যাভাব অনুভূত হওয়া, উহা দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং নূতন রূপে ঐ সমস্যা দেখা দেওয়া, আবার নূতন করিয়া খাদ্যোৎপাদনের জন্য লাগিয়া যাওয়া —প্রকৃতপক্ষে ইহারই নাম হইতেছে মানুষের অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনা। ইহা শেষ হইয়া গেলে মানুষেরও অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে।।

কিন্তু বর্তমান কালের একশ্রেণীর অক্ষম রাজনীতিক প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ পাশ্চাত্যের বর্বর জাতিসমূহের অনুকরণে জনসংখ্যা রোধের প্রস্তাব দিতেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ খয়রাত করিতেছে এবং সেজন্য কার্যকর পন্থাও অবলম্বন করিতেছে। আমি মনে করি, মানবতার এইরূপ দুশমনী করার কোন অধিকারই তাহাদের নাই। তাহারা নিজেদের বিলাসিতা, আরাম ও ভোগ-সম্ভোগের ইন্ধন হিসাবে জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ নিঃশেষ করিতেছে, আর বসিয়া বসিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণের নছীহত করিতেছে। বস্তুত ইহারা মানবতার দুশমন ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমার মতে, মাত্র দুইটি উপায়ে জনসংখ্য বৃদ্ধি সমস্যার মুকাবিলা করা যাইতে পারে। প্রথম, আধুনিক পদ্ধতিতে আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় উৎপাদন উপায়কে প্রয়োগ করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা। আর দ্বিতীয়, সুবিচারপূর্ণ পন্থায় ও সুষ্ঠুভাবে উহার বন্টন করা এবং একটি লোককেও তাহার প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য হইতে বঞ্চিত না রাখার নীতি গ্রহণ করা।

সুবিচারপূর্ণ বন্টন প্রসংগে সমাজের জনগণের মধ্যে আর্থিক ভারসাম্য স্থাপন—বেশী আয়ের হার কমানো এবং কম আয়ের হার বাড়ানো, অন্যকথায় শ্রেণী-পার্থক্য খতম করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার দ্বারাই সমস্যার অর্ধেক সমাধান হইতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই আয়ের হারে আসমান জমীনের পার্থক্য রহিয়াছে। উপরন্তু বর্তমানে যাহাদের আয়ের পরিমাণ কম তাহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। আর যাহাদের লোক সংখ্য কম, তাহাদের সম্পদ অনেক বেশী. আযের এই তারতম্য কমিয়া স্বাভাবিক পর্যায়ে আসিবে বর্তমানের শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ হইবে; অভাব-দারিদ্র্যের এই লা

ত ও মর্মান্তিক দৃশ্যও অপসৃত হইবে। প্রাচুর্যের এই পৃথিবীতে সর্বসাধারণ মানুষ মোটামুটিভাবে খাওয়া-পরা-থাকা-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার মাধ্যমে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস ও জীবন যাপন করিতে পারিবে— বাঁচিয়া সুখী হইবে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ–

ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস লইয়াই এই মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়া আছি। আর যতদিন বাঁচিব এই আশা লইয়াই বাচিব (২৫-৭-৮৭)

## গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'খেলাফতে রাশেদা', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)', 'আল্লাহর হক বান্দার হক' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও ইসলামে হালাল হারামের বিধান', 'মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গৃহীত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত এবং বহুল পঠিত।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন)

খায়রুন প্রকাশনী